বিজ্ঞাপন।

আধুনিক বঙ্গীয় যুবকগণের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, এদেশীয়দিগের অপেক্ষা ইয়ুরোপীয়দিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি অনেক উৎকৃষ্ট। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ইয়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে নিতান্ত যত্নশীল হইয়াছেন। অধিক কি তাঁহাদের বিশ্বাস যে, অগ্রে ভারতের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি প্রভৃতির সংশোধন না হইলে, কোনও প্রকারে ভারতের উন্নতি হইবে না। এই জন্য প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্যের চেষ্টা না করিয়া, সকলেই একমনে ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম সকলের পরিবর্ত্তন চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু যে কত অনর্থ ঘটিতেছে তাহা কেহ একবারও বিবেচনা করেন না। যে সকল অধ্যবসায়শালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি নূতন ধর্ম্ম ও নূতন সামাজিক নিয়ম গঠন ও প্রচলন জন্য দৃঢ় পরিশ্রম করিয়া শরীর ও মন নষ্ট ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাঁহারা যদি প্রকৃত দেশহিতকর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে কি দেশের মহান্ ইষ্টসাধিত হইত না? ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, যে ভারত হইতে পৃথিবীর যাবতীয় অধিবাসীগণ আবশ্যক সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের অভাব পূরণ করিত, আজি সেই ভারত সর্ব্ব বিষয়ে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী। সতত ব্যবহৃত লবণ ও দীপশলাকা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য ও জ্ঞান ধর্ম্ম সমস্ত বিষয়েই আজি ভারতবাসীকে ইয়ুরোপের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। যে কোনও উপায় অবলম্বনে অধিক অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে তৎসমস্তই ইয়ুরোপীয়দিগের হস্তে। বঙ্গবাসী কেবল মজুরি করিয়া কোনও প্রকারে উদরান্ন সংস্থান করেন। ভারতের যুবক সন্তান ও ভারতের একমাত্র আশাস্থল বঙ্গবাসী ঐ সকল অভাব মোচনের চেষ্টা না করিয়া কেবল ধর্ম্ম ও সমাজ সংশোধনে ব্যস্ত। যে ধর্ম্ম ও সমাজের উৎকর্ষ সাধন জন্য ভারতবাসীরা চিরজীবন অতিবাহন করিয়াছেন ও যাহার উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গবাসী-দুর্ম্মতি হইয়া তাহারই সংশোধনে ব্যতিব্যস্ত। যে ঐহিক ব্যাপারে তাঁহারা তাদৃশ মনঃসংযোগ করেন নাই বলিয়া অধুনা ভারতের এই

দুর্দশা, তাহার উন্নতির চেষ্টা কেহই করেন না। পৃথিবীতে যদি কোন সত্য ধর্ম্ম থাকে তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, পৃথিবীতে যদি কোন দেশে প্রকৃত জ্ঞানালোচনা হইয়া থাকে, তবে সে ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীতে যদি কোন সভ্য জাতি থাকে, যদি কোন জাতি নিঃস্বার্থ স্বর্গীয়-পবিত্র ধর্ম্ম-ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে তবে সে জগদ্বিখ্যাত দেবোপম আর্য্য জাতি। বঙ্গবাসীর ঐ সকলের উন্নতির চেষ্টা অনাবশ্যক, বহির্জ্জাগতিক উন্নতি চেষ্টাই বঙ্গবাসীর নিতান্ত আবশ্যক। উহাই বুঝাইয়া দিবার জন্য আমাদের "মানবতত্ত্ব" প্রচারের উদ্দেশ্য। কিন্তু গ্রন্থ অধিক বিস্তৃত হইল বলিয়া সমস্ত বিষয়ের অলোচনা করা হইল না। ঈশ্বর কি ও মানব ও সমগ্র বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি, অপরাপর পদার্থের সহিত মানবের কি সম্বন্ধ, মানবের শক্তি কত, কার্য্য কি, কর্ত্তব্য কাহাকে বলে ও তন্নিরূপণের উপায় কি; ধর্ম্ম, সমাজ, শিল্প, জ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন কি ইত্যাদি বিষয় সকল এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এবং ভারতীয় সভ্যতা যে, ইয়ুরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য ভারতীয় কএকটী সামাজিক নিয়মের সহিত ইয়ুরোপীয় সামাজিক নিয়মের তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে। যদি আমাদিগের আলোচ্য বিষয় গুলি সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়, তবে অবশিষ্ট বিষয় সকল গ্রন্থান্তরে অলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল। এই মানবতত্ত্ব কোনও গ্রন্থ বা প্রচলিত কোনও মত অবলম্বনে লিখিত হয় নাই। আপনাদিগের দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, যাহা জানিতে পারা গিয়াছে তাহাই লিখিত হইয়াছে মাত্র। ইহার কিয়দংশ পূর্ব্বে জ্ঞানাঙ্কুর ও আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পরিশেষে পাঠকগণ সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, যাঁহারা এই গ্রন্থ খানি পাঠ বা সমালোচন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করেন। কিয়দংশ পাঠ করিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল লাভ হইবে।

কায়রা;
১৪ই বৈশাখ ১২৯০ সাল।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

মানবতত্ত্ব।

উপক্রমণিকা।

মানব বলিলে আমরা দুই হস্ত দুই পদবিশিষ্ট জীবমাত্রকেই বুঝি ; সুতরাং বৃহৎ অট্টালিকাবাসী উজ্জ্বল হীরকমণ্ডিত বেশধারী মহাপরাক্রান্ত সম্রাটও মানব, জীর্ণকুটীরবাসী শত গ্রন্থিযুক্ত বসনধারী আহারাদি অভাবে শীর্ণকায় দরিদ্রও মানব ; প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন চানক্য, রিসিলু প্রভৃতিও মানব, গণ্ডমূর্খ গদাধর চন্দ্র, বিদ্যাদিগ্গজ প্রভৃতিও মানব ; মহাবীর ভীষ্ম, অর্জ্জুন, সেকন্দর, বোনাপার্টী প্রভৃতিও মানব এবং দাসত্ব ব্যবসায়ী মসিজীবী আধুনিক বঙ্গ-বাসীরাও মানব ; কালিদাস, ভারবি, আর্য্যভট্ট, সেক্সপিয়র, নিউটন প্রভৃতি মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও মানব এবং অনক্ষর ও কুসংস্কারসম্পন্ন ভুলু, কালুও মানব ; সুসভ্য বুদ্ধিমান্ সুরূপ আর্য্য, ফরাসী, ইংলণ্ডীয়-গণও মানব এবং নিতান্ত অসভ্য কদাকার কাফ্রি, নাগা, ভীল প্রভৃতিও মানব ; ধাঙ্গড়, মেথর, মুদ্দফরাশ প্রভৃতি নিতান্ত জঘন্য দুর্গন্ধ ন্যক্কার-জনক কার্য্য ব্যবসায়ীরাও মানব এবং অতি পরিপাটী রূপে পরিচ্ছন্ন সুগন্ধলেপী বাবুরাও মানব। এই প্রকারে দেখা যায় যে, মানব নামধারী জীবের মধ্যে পরস্পরের এত প্রভেদ যে, একের সম্বন্ধে অপরকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না। প্রথমোক্তকে মানব বলিলে শেষোক্তকে পশু এবং শেষোক্তকে মানব বলিলে প্রথমোক্তকে দেবতা বলিতে হয়। অধিক কি, প্রভেদের পরিমাণ এত অধিক যে এক জন মানব অপর মানবের ছায়া স্পর্শ করিবার যোগ্য হয় না। বিষ্ঠা-পূতি-গন্ধবিশিষ্ট ন্যক্কার-জনক চীর-বসনধারী অনক্ষর মেথর কি কখনও হীরকখচিত বেশধারী সুগন্ধ-দ্রব্য-চর্চ্চিত অপরি-মিত বলশালী মহাপ্রাজ্ঞ নরপতির নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে ?

না। তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সাহস করিতে পারে? ঐ নরপতি কি ঐ মেথরকে আপনার সজাতি মনে করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন? না ঐ মেথর ঐ রাজচক্রবর্ত্তীকে আপনার ন্যায় একজন মানব মনে করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিবার আশা করিতে পারে? তাহা দূরে থাকুক বরং তদ্বিপরীতে ঐ রাজা ঐ মেথরকে আপনার নিতান্ত পোষ্য ও প্রয়োজন-সৃষ্ট হস্ত্যশ্বাদির ন্যায় বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব বিবেচনা করেন এবং সে মেথরও রাজাকে আপনাদের প্রতিপালন জন্য সৃষ্ট পরম উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিয়া ভক্তি ও ভয়-চকিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করে। অতএব আমরা কাহাকে মানব বলিব? ঐ রাজা ও মেথর উভয়কেই মানব বলিব অথবা উভয়ের একজনকে মানব বলিয়া অপরকে অন্য আখ্যা দিব? মানবের লক্ষণ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি? যদি দুই হস্ত দুইপদবিশিষ্ট গতিশক্তিসম্পন্ন পদার্থ মাত্রই মানব পদবাচ্য হয়, তবে অবশ্যই রাজা ও মেথর উভয়ই মানব। কিন্তু তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? সুবর্ণ পিত্তলে প্রভেদ কেন? রাজা প্রজায় প্রভেদ কেন? পণ্ডিতে মূর্খে প্রভেদ কেন? দুর্ব্বলে বীরে প্রভেদ কেন? সুরূপে কুৎসিতে প্রভেদ কেন? আকাশ পাতালে ভেদ কেন? আতর ও বিষ্ঠা-লেপীতে প্রভেদ কেন? নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানবের সহিত পশুর এবং উচ্চশ্রেণী মানবের সহিত দেবতার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয় কেন? যদি মানব মাত্রই এক পদার্থ এবং তাহাদের একই উদ্দেশ্য ও পরিণাম হয় তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? যদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মনুষ্যের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে তাহাদিগকে কি প্রকারে এক পদার্থ বলা যায় এবং তাহাদের অধিকারই বা কি প্রকারে একরূপ হইতে পারে? সুরম্য হর্ম্ম্যনিবাসী রাজচক্রবর্ত্তীর সহিত জীর্ণ কুটীর বাসীর, অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ দূরদর্শী পণ্ডিতের সহিত অনক্ষর ও নিতান্ত মূর্খের এবং সভ্যতা-চাকচিক্যশালী সুন্দর মানবের সহিত নিতান্ত কদাকার অসভ্যের যদি একই উদ্দেশ্য ও পরিণাম হয়, তবে তাহাদের

মধ্যে এত প্রভেদ কেন এবং সেই প্রভেদ জনিত মানাপমানেরই বা বিচার কেন? ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষিগণ অশেষ জ্ঞানসাগর মন্থন করিয়া যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিলেন ও পরিণামে যে গতি লাভ করিলেন, নিতান্ত অনক্ষর মদ্যপায়ী, বেশ্যারত মনুষ্যরাও কি সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন ও সেই গতিলাভ করিবেন! বুদ্ধ, ইশা, মুসা, চৈতন্য প্রভৃতি স্বার্থত্যাগী পরহিতৈক ব্রতী মহাপুরুষগণ যে কার্য্য সম্পাদন ও পরিণাম লাভ করেন, আত্মোদরপূরণরত নরপীড়কগণও কি সেই কার্য্য সম্পাদন ও সেই পরিণাম লাভ করিবেন? পরম দয়াবান পুরুষ পরোপকার করিয়া যে বিশ্বকার্য্য সাধন করিবেন, পরস্বাপহারী স্বার্থপর নরগণ পরস্বাপহরণ করিয়াও কি সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিবেন? কৃষক শস্য বপণ ও শিল্পী শিল্পকার্য্য করিয়া বিশ্বের যে উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবেন, বাবুরা কেবল মাত্র সেই সকল উপভোগ করিয়াই কি সেই উদ্দেশ্য সম্পাদন করিবেন? তাহা যদি হইল তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের প্রভেদ কি থাকিল? তাহা না হইয়া যদি ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ভিন্ন হয়, তবে মানব মাত্রই এক পদার্থ কিরূপে বলা যায়? বিশেষ যদি মানব মাত্রেরই উদ্দেশ্য ও পরিণাম এক হয়, তবে তাহাদিগের অধিকার সুতরাং তাহাদের সুখ দুঃখ অবশ্য সমান হইবে, কিন্তু কিজন্য তাহা হয় না?

এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। এ পর্য্যন্ত এই সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু তাহার ফল সর্ব্ববাদী সম্মত কিছুই স্থির হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও স্থিরতা নাই। তবে অনেকে এইরূপ অনুমান করিয়াছেন যে, মানব ঈশ্বরের ইচ্ছাকৃত সৃষ্ট বস্তু: ঈশ্বর-সেবাই মানবের কার্য্য; স্বর্গ, ঈশ্বর-সাযুজ্য-সারূপ্য বা মোক্ষলাভই মানবের উদ্দেশ্য; ইহকাল মানবের কার্য্যকাল এবং পরকালের সুখ দুঃখই তাহাদের লক্ষ্য। মানব মাত্রেই ইহাতে সমাধিকারী। তবে যে অবস্থার এরূপ প্রভেদ হয়, সে কেবল পূর্ব্ব বা ইহ জন্মের কার্য্য-

ফলে। কেহ কেহ বলেন ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে সমান করিয়াছেন ও তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। মানব ইচ্ছা করিয়া সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করাতেই পরস্পর এত ভিন্ন ও দুঃখী হইয়াছে। সুতরাং মানব সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে অগ্রে ঈশ্বর, সৃষ্টি, পরকাল ও পূর্ব্বজন্মাদির বিষয় জানা আবশ্যক। ক্রমে সে সকল বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদের আর একটী বিষয় দেখা আবশ্যক। বিশ্ব কেবল মনুষ্য লইয়া নহে। মানব ভিন্ন এই বিশ্বে এত পদার্থ আছে যে, মানব না থাকিলেও বিশ্বের কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণের ন্যূনতা হইত না। অতএব সে সকল বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা আবশ্যক।

যাহা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, আমরা তাহারই সত্তা অনুভব করি। তাহার কতকগুলিকে পদার্থ ও কতকগুলিকে পদার্থের শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আমরা বলিয়া থাকি, যাহার সত্তা আছে, তাহা কোন না কোন প্রয়োজনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে। বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই। এজন্য যাহার প্রয়োজন আমাদের বুদ্ধিতে অনুভূত হয় না, তাহারও প্রয়োজন কল্পনা করিয়া লই; এই জন্য ব্যাঘ্র, সর্প, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি যে সকল হইতে স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেও কোন না কোন উপকার কল্পনা করিয়া থাকি, কিন্তু কেন এরূপ কল্পনা করি, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় যে দ্রব্যে কোন প্রয়োজন নাই, তাহার কোন মূল্য নাই এবং ঈশ্বর যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যে মূল্যহীন পদার্থ এরূপ সম্ভাবনা করা আমাদিগের নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই এইরূপ বলিয়া থাকি। ঈশ্বর-কৃত পদার্থ যে বিনা উদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাদিগের বলিতে সাহস হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহার প্রয়োজন সাধনের জন্য সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে? এখানে মানব বক্তা; সুতরাং মানব বলিবেন যে, মানবের উপকারের জন্যই সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী,

জল, বায়ু, সর্প, ব্যাঘ্র, রোগ, মৃত্যু সমুদায়ই মানবের উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। যদি বানরের হস্তে কলম থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহারাও বলিত যে, মানবের সহিত সমুদায় বিশ্ব বানরের কল্যাণের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। আচ্ছা মানব! তোমারই কথায় স্বীকার করা গেল যে, তোমারই জন্য সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে বল দেখি, তুমি কাহার উপকারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছ? যখন তুমি বলিতেছ, বিনা প্রয়োজনে কিছুই সৃষ্ট হয় নাই, তখন তোমারও সৃষ্টি বিনা প্রয়োজনে হয় নাই বলিতে হইবে। অপরাপর পদার্থ তোমারই প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতেছ, কিন্তু তোমার সৃষ্টির প্রয়োজন কি? যদি বল, মানবগণ পরস্পর স্বজাতির উপকারের জন্য প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হইল না। মানবজাতি দ্বারা বিশ্বের বা অপর কাহারও কি প্রয়োজন সাধিত হয়, তাহা তুমি বলিলে না। তুমিই কি এই বিশ্বের সর্ব্বস্ব? তুমি কি স্বয়ম্ভু? তুমি কি স্বাধীন? যখন তোমার জন্ম মৃত্যু তোমার ইচ্ছাধীন নহে, অপরাপর পদার্থের ন্যায় তোমারও যখন জন্ম মৃত্যু আছে, তখন তুমি কি বলিয়া বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন সত্ব আকাঙ্ক্ষা কর। যদি অপরাপর পদার্থের সৃষ্টি প্রয়োজন জন্য হইয়া থাকে, তবে তোমারও সৃষ্টি প্রয়োজন জন্য হইয়াছে বলিতে হইবে। যদি তুমি অকারণ সম্ভূত হও, তবে অন্য পদার্থ সকলকেও অকারণ সম্ভূত বলিতে হইবেক। যদি বল ঈশ্বরের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহা হইতে পারে না, কেননা ঈশ্বরের আবার প্রয়োজন কি? যদি থাকে, তবে অপর পদার্থ সকলও তাঁহার প্রয়োজন সাধনোদ্দেশে সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবেক। কেননা তোমার ন্যায় তৎসমুদয়ও তাঁহার সৃষ্ট। তোমার উপকারের জন্য তৎসমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে বলিবার তোমার অধিকার কি? তুমি কেবল এইমাত্র বলিতে পার যে, তোমার শক্তি পৃথিবীস্থ অপরাপর পদার্থ হইতে অধিক; তোমার বুদ্ধি এই আধি-

ক্যের প্রধান হেতু। সেই বুদ্ধি বলে তোমরা পৃথিবীর সকল পদার্থের উপর রাজত্ব করিতেছ; কিন্তু তাহা বলিয়া তোমরা যে বিশ্বের অপরাপর পদার্থ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা বলা যায় না। বিশ্ব সম্বন্ধে সমগ্র মানব জাতি একটী বালুকা কণার সমানও হইতে পারে না। যাহা হউক, মানব কি, তাহার কার্য্য কি, উদ্দেশ্য কি ও পরিণাম কি তাহা জানিতে হইলে মানবের আদি দেখা আবশ্যক। সুতরাং অগ্রে বিশ্বের আদি দেখা আবশ্যক হইতেছে। কেননা মানব বিশ্বের সামান্য একটী অংশ মাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিশ্ব।

বিশ্বের আদি দেখিব, কিন্তু আমাদের তাহা দেখিবার ক্ষমতা আছে কি না? আমরা কখনও কি কোন পদার্থের আদি দেখিয়াছি? যদি না দেখিয়া থাকি, তবে বিশ্বের আদি দেখিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় কেন? মানব মাত্রেরই স্বভাব এই যে, তাহারা পদার্থ মাত্রেরই উৎপত্তি ও কারণ অন্বেষণ করে। ইহার কারণ কি? মানবের সম্মুখে যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্ব্বে তাহার একটী পূর্ব্বাবস্থা দেখিতে পায়, তাহাকেই তাহারা শেষোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়া থাকে। ঘটনা বিশেষের পূর্ব্বে ঘটনা বিশেষ নাই এরূপ অবস্থা মানব প্রায়ই দেখিতে পায় না; সুতরাং মানবের দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে ঘটনা মাত্রেরই পূর্ব্বে ঘটনাবিশেষ বা কারণ আছে। এই সংস্কার বা জ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা পদার্থ মাত্রেরই কারণ অন্বেষণ করে। কিন্তু আদি কাহাকে বলে? প্রথম অবস্থা অর্থাৎ যাহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, তাহাকেই কি আদি বলিতে হইবে না? আমরা কি কোন পদার্থের আদি কারণ বা প্রথম

অবস্থা দেখিয়াছি? আমরা যে সকল কারণ দেখিয়া থাকি সে সকল কি আদি কারণ? তোমার ভূমিষ্ঠ হওন কালীন অবস্থাকে কি তোমার আদি বলিবে? তাহা কখনই বলিতে পার না। কেন না, তৎপূর্ব্বে তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে তোমার পিতা মাতার শোণিতে ছিলে, তাহার পূর্ব্বে গবাদি জীবদেহে ও ধান্যাদিতে বর্ত্তমান ছিলে এবং তাহারও পূর্ব্বে মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতিতে অধিষ্ঠিত ছিলে। এইরূপ যত অন্বেষণ করিবে, ততই তোমার অগ্রিম অবস্থা অসংখ্য হইয়া পড়িবে। কোনমতে তোমার আদিম অবস্থার অনুসন্ধান পাইবে না। অতএব যাহাকে তোমার উৎপত্তি বলিলে, তাহা তোমার উৎপত্তি নহে, অবস্থান্তর মাত্র। পূর্ব্বে তোমার নরদেহ না থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল পদার্থ হইতে তোমার দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান ছিল। তুমি মেঘকে বৃষ্টির কারণ বল, কিন্তু মেঘ বাস্প হইতে জন্মে; বাস্প আবার জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জল ছিল, তাহাই হইল। যে সকল পদার্থ লইয়া তোমার দেহ গঠিত, তোমার মৃত্যু হইলে আবার তাহাই হইবে। শাস্ত্রকারেরা ইহাকেই "পঞ্চে পঞ্চ মিশান" কহেন। তুমি বীজকে বৃক্ষের কারণ বল, কিন্তু বৃক্ষই আবার বীজের কারণ অতএব তুমি বীজ ও বৃক্ষ ইহার মধ্যে কাহাকে আদিম কারণ বলিবে? এই প্রকারে দেখিতে পাইবে যে, কোন পদার্থেরই আদি পাওয়া যায় না। যাহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ তোমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে, সে অবস্থান্তর মাত্র। যেমন মৃত্তিকা ঘট হইতেছে, স্বর্ণ অলঙ্কার হইতেছে, তুলা বসন হইতেছে, সেইরূপ ভৌতিক পদার্থ মানব হইতেছে, বাস্প বৃষ্টি হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতে পাও তৎসমুদায়ই এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। যখন কোন পদার্থ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমরা তাহার উৎপত্তি বলিয়া থাকি। সে পদার্থের সে অবস্থার সেই আদি বটে, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত আদি বলা যায়

না। যখন কিছুই ছিল না, তখন যাহা উৎপন্ন হইল, তাহাকেই আদিম অবস্থা বলা যায়। কিন্তু কিছুই ছিল না অথচ কিছু হইয়াছে এরূপ আমরা কখন দেখি নাই; এরূপ কল্পনা করাও আমাদিগের অসাধ্য। মনুষ্য যাহা কখন দেখে নাই, তাহার কল্পনা করিতেও অক্ষম। দেখিয়া শুনিয়াই মানবের জ্ঞান। আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, কোটি শূন্য একত্রিত করিলেও এক হয় না এবং এককে সহস্র কোটি অংশ করিলেও শূন্য হয় না। কিছু না, কখনও কিছু হয় না এবং কিছু, কখন কিছুনা হয় না। পূর্ব্বে কখনও কিছু ছিল না অথচ বিশ্ব হইয়াছে এবং এক্ষণে বিশ্ব আছে, পরে কিছুই থাকিবে না, একথা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ এবং ইহা মানব বুদ্ধির অতীত। বোধ হয় এই কথার সমন্বয় করিতে আর্য্য পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, পরমাণুর ধ্বংস নাই। পরমাণু পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, পরেও সেই রূপ থাকিবে। তাঁহারা কহেন, সেই পরমাণু-পুঞ্জ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি এবং যখন বিশ্ব ধ্বংস হইবে, তখনও সেই পরমাণু পুঞ্জ রহিয়া যাইবে।

কেহ কেহ বলেন যে, কিছু না হইতে কিছু হয় না বটে এবং কিছু কখনও কিছু না হয় না বটে, কিন্তু যখন কিছু ছিল না তখন ঈশ্বর ছিলেন, এবং যখন কিছু থাকিবে না তখন ঈশ্বর থাকিবেন; সেই ঈশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে রূপে বাষ্প হইতে জলের উৎপত্তি এবং বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি, ঈশ্বর হইতে বিশ্বের উৎপত্তি কি সেই রূপ? যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে বিশ্বের পূর্ব্বাবস্থা বলিতে হইবেক সুতরাং ঈশ্বরেরও কারণ থাকা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ বলেন না। তাঁহারা ঈশ্বরকে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেন। ঘট সম্বন্ধে কুম্ভকার যেমন এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে স্বর্ণকার যেমন, তাঁহারা বিশ্ব সম্বন্ধে তাহা হইতেও ঈশ্বরকে অনেক উচ্চ বলেন। তাঁহারা বলেন পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; একমাত্র অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল,

এবং সেই ইচ্ছা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি। কিন্তু এ কথা কতদূর বিশ্বাস্য? অনাদি ব্যক্তির কার্য্য সাদি হওয়া কতদূর সঙ্গত? তুমি বিশ্বের সৃষ্টিকাল যতই অধিক বল না কেন, অনাদি কালের সহিত তুলনায় তাহা নিতান্ত অল্প। এই অনন্তকাল ঈশ্বর নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, সেদিন অর্থাৎ কোনও একদিন কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহার উত্তরে যদি বলেন, ইচ্ছাই ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কারণ; যতদিন ঈশ্বরের সে ইচ্ছা হয় নাই, ততদিন বিশ্ব সৃষ্টি হয় নাই, যখন ইচ্ছা হইল, তখনই সৃষ্টি হইল। কিন্তু তাহাও সঙ্গত উত্তর হয় না, কারণ জিজ্ঞাস্য এই যে, কি জন্য এতকাল ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় নাই এবং হঠাৎ একদিনেই বা সে ইচ্ছা হইল কেন? তাঁহারা যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া এই কূট তর্কের অবতারণা করেন, একথা সে যুক্তিরও বিরুদ্ধ। তাঁহাদের মূলযুক্তি এই যে, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না। এই জন্য তাঁহারা ভাবিলেন বিশ্বের অবশ্যই কারণ আছে এবং সেই কারণই ঈশ্বরের ইচ্ছা। যখন তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেছেন, কারণ ভিন্ন কিছুই হয় না, তখন ঈশ্বরের ইচ্ছার কি কারণ নির্দ্দেশ করেন? যখন বলিতেছেন, ঈশ্বর চিরকালই আছেন, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, তখন হঠাৎ কোনও এক সময় তাঁহার ইচ্ছা জন্মিল কেন? এই ইচ্ছা জন্মিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের যুক্তির মূলে কুঠারাঘাত হইল। মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে; তাহারা দেখিয়াছে কার্য্যমাত্রেরই পূর্ব্বে কার্য্যবিশেষ বিদ্যমান থাকে, তাহাতে বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না। যখন তাহারা ঐ সূত্র খাটাইয়া কারণ পরম্পরা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল, তখন দেখিল, সেরূপে চলিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটে; তাহাতেই তাহারা শেষে অনাদি কারণ স্বরূপে ঈশ্বরে অর্পণ করিল; অর্থাৎ জ্ঞান অচল হইলে ক্ষান্ত হইল।

কিন্তু যদি তাঁহারা ঈশ্বরের ন্যায় বিশ্বকেও অনাদি অনন্ত বলেন, তাহা হইলে তাঁহাদের যুক্তিও দুর্ব্বলা হয় না, এবং সকল দিক্ রক্ষা

হয় অথচ কল্পনার সাহায্য লইতে হয় না। যখন আমরা কোনও পদার্থেরই আদি পাই না, তখন বিশ্বকে অনাদি বল না কেন? এ স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশ্বের অনাদিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দেখা আবশ্যক, এই বিশ্ব ব্যাপারের আমরা যাহা কিছু অনুভব করি, সে সকল সসীম কি অসীম। যদি সে সকল সসীম হয়, তবে অসীম জ্ঞান আমাদের অসম্ভব; আর যদি সে সমস্ত অসীম হয়, তবে সসীম জ্ঞান আমাদের অস্বাভাবিক। এক্ষণে দেখা যাউক আমরা কিরূপ অনুভব করি।

আমরা মোটামুটী এ বিশ্ব সম্বন্ধে কি অনুভব করি? আধার, আধেয়, কার্য্য ও কাল। বোধ হয় এই চারিটী ভিন্ন বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুই জ্ঞান নাই। যাহাতে কিছু থাকে, তাহাকে আধার; যাহা থাকে, তাহাকে আধেয়; আধেয়ের শক্তি বা গুণ প্রকাশকে কার্য্য এবং কার্য্যের ব্যাপ্তিকে কাল বলে। দুগ্ধের আধার ভাণ্ড, ভাণ্ডের আধার পৃথিবী, পৃথিবীর আধার কি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক যে, যাহাকে আমরা শূন্য বা আকাশ বলি, তাহাই পৃথিবীর আধার, সেই আকাশ সমুদায় জগতের আধার। সুতরাং আধেয় বলিতে পদার্থ মাত্রকেই বুঝাইতেছে। জগৎ সমূহের আধার শূন্যকে আমরা 'কিছুই না' বলিয়া থাকি। কিন্তু উহা যে নিশ্চয়ই কিছু না, তাহার নিশ্চয় কি? এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আধার যে কিছুই না, তাহা কিরূপে বলা যায়? এমনও বলা যাইতে পারে যে, উহা আমাদিগের অতীন্দ্রিয় পদার্থে নির্ম্মিত, কেননা আকাশ ও জগৎ সমুদয় লইয়াই বিশ্ব, অথবা আধার ও আধেয় লইয়াই বিশ্ব। যদি বাস্তবিক আকাশ কিছুই না হয় তাহা হইলে এই বিশ্বকে একটী বলিয়া পরিগণিত করা যায় না, কারণ প্রত্যেক গ্রহ বা উপগ্রহের পরে আকাশ বা শূন্যস্থান রহিয়াছে। যে পদার্থ সকল পরস্পর কোন পদার্থ দ্বারা মিলিত নহে তাহারা কখনও একটী পদার্থ হইতে পারে না। আকাশ যদি কিছু না হয়, তবে গ্রহ উপগ্রহাদি সকল কোন পদার্থ দ্বারা

পরস্পর মিলিত নয় সুতরাং বিশ্বেরও একত্ব হইতে পারে না। এই জন্য আর্য্য পণ্ডিতেরা আকাশকে ভৌতিক পদার্থ বলিয়াছেন এবং পৃথিবীর ঊর্দ্ধতন বায়ুকে আবহ, প্রবহ, সংবহ প্রভৃতি সপ্ত নাম প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইথার নামক বায়ু স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাহাই হউক, বিশ্বের অংশভূত আকাশ যে অসীম, তাহাতে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। মানব! তুমি কখনও আধেয়শূন্য আধার দেখিয়াছ? অবশ্য বলিবে, না! তবে তুমি আকাশকে আধেয় শূন্য বল কেন? যখন জগৎ সকলের আধার আকাশ অসীম তখন উহার আধেয় জগৎ সংখ্যাও অসীম হইবে, সুতরাং তোমাকে বলিতে হইবে যে বিশ্বের সীমা নাই; পরিমাণ সম্বন্ধে বিশ্ব অসীম। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা কিয়ৎ পরিমাণে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোনও নক্ষত্র এত দূরে অবস্থিত যে তাহার আলোক অদ্যাপি পৃথিবীতে আইসে নাই, অথচ আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৯৬০০০ ক্রোশ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পদার্থের শক্তি প্রকাশের নাম কার্য্য। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিতেছে অর্থাৎ চুম্বক লৌহ-আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ করিতেছে। মনুষ্য গমন করিতেছে অর্থাৎ গতিশক্তি প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক যে, কার্য্য, শক্তি প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু কার্য্যের ব্যাপ্তির নাম কাল। উহাকে কার্য্যের আধারও বলা যাইতে পারে। যেমন যতখানি আকাশ অবলম্বন করিয়া কোন পদার্থ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাকে তাহার পরিমাণ কহে, সেইরূপ যতখানি কাল অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য অর্থাৎ কোন পদার্থের শক্তি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে তাহার স্থিতি কহে। কাল যে অনাদি অনন্ত সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। কাল অনন্ত হইলে উহার আধেয় কার্য্য কেননা অনন্ত হইবে? সুতরাং কার্য্যের আধার পদার্থও অনাদি অনন্ত।

এ সকলে আমরা কি দেখিলাম? আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম যে,

আকাশ ও কাল উভয়ই অসীম। প্রথমটী পরিমাণ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টী স্থিতি সম্বন্ধে অসীম। আবার তাহা হইতে উহাদের আধেয় অর্থাৎ পদার্থ ও পদার্থের শক্তি প্রকাশ যে অসীম তাহাও বুঝিতে হইল। যদি কেহ কেহ শেষোক্তদ্বয়কে অসীম বলিতে আপত্তি করেন, কিন্তু উহারা যে সসীম তাহা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না। ফলতঃ, যাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম তৎসমস্তই যে অসীম তাহা বুঝিতে আর বাকী থাকিল না, তবে যে আমরা পদার্থ বিশেষের সসীম আকৃতি ও তাহাদের উৎপত্তি ও লয় দেখিতেছি, বাস্তবিক তাহা প্রকৃত সীমা বা প্রকৃত উৎপত্তি ও লয় নহে। অতএব বিশ্বের অনাদিত্ব জ্ঞানই আমাদের স্বাভাবিক সুতরাং প্রকৃত। সুতরাং বিশ্ব কখনও সৃষ্ট হয় নাই, কখনও নষ্ট হইবে না। উহা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। দেখিয়া শুনিয়া যাহা জানা যায় যদি তাহারই নাম জ্ঞান হয়, মীমাংসা করিতে যদি যুক্তিরই সহায়তা লইতে হয়, আপ্তবাক্য বলিয়া কিছু আছে যদি এরূপ বিশ্বাস না করা যায় তবে বিশ্বকে অনাদি অনন্ত বলিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সৃষ্টি।

বিশ্ব যদি অনাদি অনন্ত হইল, তবে কি তাহার সৃষ্টি নাই? তবে কি বিশ্বের চিরকাল সমান অবস্থা? এক্ষণে বিশ্বের যে অবস্থা, পূর্ব্বে চিরকালই কি এইরূপ অবস্থা ছিল এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল এইরূপ অবস্থা থাকিবে? এক্ষণে যে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহারা কি পূর্ব্বে চিরকালই এইরূপ ছিল এবং ভবিষ্যতে চিরকালই এইরূপ থাকিবে?

তাহা কখনও বলা যাইতে পারেনা। কেন না আমরা দেখিতে পাইতেছি, পৃথিবীর কোনও পদার্থ চিরকাল এক অবস্থায় থাকে না। দেখিতেছি, সমভূমি পর্ব্বত হইতেছে ; পর্ব্বত সমভূমি হইতেছে ; অরণ্য মরুভূমি ও মরুভূমি অরণ্য হইতেছে ; জল স্থল ও স্থল জল হইতেছে ; পূর্ব্বে যে খানে প্রকাণ্ড নগরী ছিল, এক্ষণে তাহা জন-সমাগম-শূন্য মরুভূমি ; পূর্ব্বে যে স্থলে মনুষ্য গমন করিতেও পারে নাই, এক্ষণে তাহা মহা-সমৃদ্ধিশালী নগর ; যে আর্য্যজাতি পূর্ব্বকালে পৃথিবীর সর্ব্বোন্নত সুসভ্য ছিল, এক্ষণে তাহারা নিতান্ত হীন দশাপন্ন ; যে ইংরেজেরা কিছু দিন পূর্ব্বে আম-মাংস-ভোজী ও নিতান্ত অসভ্য ছিল, এক্ষণে তাহারা পৃথিবীর মধ্যে মহা পরাক্রান্ত ও সুসভ্য হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায়, পৃথিবীর সকল বস্তুরই নিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অধিক কি এক-শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল মানব এই পৃথিবীতে ছিল, তাহার একজনও এক্ষণে বর্ত্তমান নাই, এবং এক্ষণে যে শতাধিক কোটী মানব বর্ত্তমান রহিয়াছে, শতবর্ষ পরে তাহার একজনও থাকিবে না। যেমন সমুদায় মনুষ্যেরই মৃত্যু হইতেছে, অথচ মানবের লোপ হইতেছে না, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই ধ্বংস হইতেছে, অথচ বিশ্বের লোপ হইতেছে না। যেমন মানবের জন্ম ও মৃত্যু আছে, সেইরূপ বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই উৎপত্তি ও নাশ আছে। উৎপত্তি ও নাশ অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনাদি অনন্ত বিশ্ব প্রতি মুহূর্ত্তে নবরূপ ধারণ করিতেছে। এই প্রকাণ্ড পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য, পূর্ব্বে ইহার কিছুই ছিলনা এবং পরেও ইহার কিছুই থাকিবে না। যেমন আমি ছিলাম না, কিন্তু আমার পিতা ছিলেন, সেইরূপ এই পৃথিবী ছিলনা, কিন্তু ইহার উপাদান ছিল। বর্ত্তমান সূর্য্যের পূর্ব্বে অন্য সূর্য্য ছিল, বর্ত্তমান গ্রহ নক্ষত্রের পূর্ব্বে অন্য গ্রহ নক্ষত্র ছিল। যেমন শতবর্ষের মধ্যেই বর্ত্তমান সমুদায় মনুষ্যেরই মৃত্যু হইবে, অথচ কেহ তাহা বুঝিতে পারিবে না, নিত্য দুই এক জন করিয়া মরিয়া যাইবে ; গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী

সকলও ঐরূপে ক্রমে এক একটী করিয়া লুপ্ত হইবে ও তাহাদের স্থানে নূতন গ্রহাদি উৎপন্ন হইবে। সুতরাং বিশ্ব অনাদি অনন্ত হইলেও গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী আদির সৃষ্টি হইতেছে। যদিও এই সকল প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না, কিন্তু পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টি করিয়া বৈজ্ঞানিক যুক্তি-বলে ঐ সকল অবধারণ করা যায়।

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন, পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, ঐ সকল বাষ্পময় পরমাণুরাশি ঘন হইয়া জল হইল, জল কঠিন হইয়া মৃত্তিকা হইল, কঠিন পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কেবল অন্তরীভূত প্রস্তর মাত্র হইল, ক্রমে সরের ন্যায় তাহাতে স্তর জমিতে লাগিল। ঐ স্তরাবলীতে ক্রমে ক্রমে বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও সর্ব্বশেষে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বন্য মানব ক্রমে সভ্য হইতেছে। তাঁহারা বলেন, মানব ক্রমেই উন্নত হইবে। যে বাষ্প-রাশি হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা যে পূর্ব্বে অন্য পৃথিবী ছিল, তাহাতে সন্দেহ কি? যেমন বাষ্প হইতে জল ও জল হইতে বাষ্প হইতেছে, যেমন বৃক্ষ হইতে বীজ ও বীজ হইতে বৃক্ষ হইতেছে, সেইরূপ বাষ্পরাশি পৃথিবী ও পৃথিবী বাষ্পরাশি রূপে পরিণত হইতেছে। যেমন মানবের বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও তৎ-পরে মৃত্যু হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর বাল্য অর্থাৎ বন্য, যৌবন অর্থাৎ সভ্য, বার্দ্ধক্য অর্থাৎ স্থির ভাবের অন্তে লোপ হয়। বিশ্বের সমুদায় পদার্থেরই এই নিয়ম। পূর্ব্বে মানব জাতি নিতান্ত অসভ্য ছিল, ক্রমে সভ্য হইতেছে, পরে যখন উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ হইবে, তখন তাহাদের পতন হইবে। তাহার পর মানব হইতে উৎকৃষ্ট জীব পৃথিবীবাসী হইলেও হইতে পারে; পৃথিবী উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে ক্রমে তাহার ধ্বংস হইতে থাকিবে ও পরিশেষে বাষ্পময় হইবে।

এ বিষয়ে আর্য্যজাতির পৌরাণিক মত অতি চমৎকার। ইয়ুরো-পীয়গণের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পৃথিবী ৬ হাজার বৎসরমাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞান ও যুক্তির নিতান্ত বিরুদ্ধ। দেখ, আর্য্যেরা এবিষয়ে কি

বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ৪ বৃন্দ ৩২ ক্রোটী বৎসরে এক কল্প হয়। এই কল্প ব্রহ্মার দিবা ও তত্তুল্য সময় তাঁহার রাত্রি। রাত্রিকালে সমুদায় পৃথিবী লয় হইয়া যায়, পুনরায় দিবা ভাগে সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান কল্পের প্রায় দুই বৃন্দ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বর্ত্তমান পৃথিবীর বয়ঃক্রম প্রায় দুই বৃন্দ বৎসর অতীত হইয়াছে। এইটী দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভারতীয় আর্য্যজাতিরা বিশ্বের নিয়ম সকল উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন। অদ্য আমরা যে যুক্তির অনুসরণ করিতেছি, কতকাল পূর্ব্বে আর্য্যজাতি তাহা স্থির করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, প্রলয় কালে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় হইবে। প্রচণ্ড তাপ ব্যতিরেকে এই কঠিন পৃথিবী বাস্পময় হইতে পারে না, বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা এই রূপ অনুমান করিয়াছেন। বিশ্ব যে অনাদি অনন্ত, আর্য্য শাস্ত্র-কারেরা তাহাও পদে পদে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পরমাণু নিত্য, তাহার ধ্বংস নাই। আরও বলেন, ৮৬৪ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্রি। সেই অহোরাত্রি হিসাবে বর্ত্তমান ব্রহ্মার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রহ্মার পূর্ব্বেও অন্য ব্রহ্মা ছিলেন এবং পরেও অন্য ব্রহ্মা হইবেন। সুতরাং তাঁহারা বিশ্বের অনাদি অনন্তত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতায় সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্লোক পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে, পূর্ব্বে বিশ্বের সমস্ত উপকরণই ছিল ও তৎসমস্ত তমোভূত, অবিজ্ঞেয় ও লক্ষণশূন্য অবস্থায় ছিল, পরে সেইগুলি স্বয়ম্ভু ভগবান্ প্রকাশ করিলেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে বিশ্ব অনাদি অনন্ত ও মধ্যে মধ্যে তাহার লয় হয়।

বাস্তবিক যাহাকে আর্য্যেরা পঞ্চভূত ও আধুনিক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা ৬৩ ভূত বলিতেছেন, তাহাই প্রকৃত বিশ্ব। তাহার হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় নাই, কিন্তু সংযোগ ও বিয়োগে নানাবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। ঐ সকল ভূতের মিলনে জল, বায়ু, প্রস্তর, মৃত্তিকা, গ্রহ, সূর্য্য, নক্ষত্র, পৃথিবী, তাপ, তাড়িৎ, আলোক, মেঘ,

বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের উৎপত্তি হইতেছে। যেমন মিলনের প্রকার ভেদে পারদ ও গন্ধক হইতে কজ্জলী, হিঙ্গুল, ও পর্পটি হইতেছে, সেইরূপ ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে। বাষ্পকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়েরই উপাদান এক। অতএব যদিও বিশ্ব অনাদি অনন্ত, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি, উন্নতি, অবনতি ও লয় আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মানব।

যদি বাষ্পকণা হইতে মানব পর্য্যন্ত সমুদায়ই মূল এক উপাদান হইতে উৎপন্ন, তবে মানব অতি শ্রেষ্ঠ কেন? গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতির সংবাদ আমরা জানিনা, তথায় শ্রেষ্ঠতর জীব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু পৃথিবী মধ্যে মানবই সর্ব্ব প্রধান। মানবের শক্তি অতি অদ্ভুত; যে সকল কার্য্য মানবে সম্পন্ন করিতেছে তাহা চিন্তা করিলেও আশ্চর্য্য হইতে হয়। যদি জন্ম মৃত্যু মানবের হস্তাধীন হইত, তাহা হইলে তাহাকে এই পৃথিবীর হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা বলা যাইতে পারিত। মানবের যে শক্তি আছে, তাহার কোটি অংশের একাংশ শক্তি অপর জীবে বা পদার্থে নাই, তবে কি প্রকারে বলা যায় যে, অপর পদার্থ সমূহের সহিত মানব এক উপাদানে নির্ম্মিত? ইহার গূঢ় কারণ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে আত্মা নামক অবাঙ্মনসোগোচর পদার্থের কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঐ আত্মার শক্তিতে মানবগণ গমন করে, চিন্তা করে, কার্য্য করে; আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের চেষ্টা করিবার শক্তি নাই। কারণ জড় পদার্থ নিচেষ্ট, জড় হইতে মনুষ্য যে সকল গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎসমুদায়ই আত্মার শক্তি। কিন্তু আত্মা কাহাকে বলে?

আত্মার স্বরূপ কি ও তাহা মানবের বুঝিবার সামর্থ্য আছে কিনা? কিম্বদন্তী এই যে পদার্থ দুইপ্রকার :—জড় ও চেতন ; যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও যাহার ভার আছে, তাহা জড় এবং যাহা ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য. ভার-শূন্য ও যাহার শক্তি প্রভাবে মানব সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে এবং যাহা ঈশ্বরেরই অংশবিশেষ তাহাই চেতন। এই সংজ্ঞা অনুসারে বায়ু এমন কি নিতান্ত লঘু ঈথারও জড় পদার্থ ; ঈথারের সূক্ষ্মতা অনুমান করাই মানবের অসাধ্য। ঈথার্ আমাদের অতীন্দ্রিয় জড় পদার্থ, তাহাও আবার অসংখ্য পরমাণু সমষ্টি। তবে পরামাণুর আকৃতি, বিস্তৃতি, অবস্থিতি প্রভৃতি গুণের অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা কোনও প্রকারে তাহার সত্বা অনুভব করি ও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি। আত্মার আবার বিস্তৃতি নাই, ভার নাই, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় এমত কোন গুণই আত্মার নাই, সুতরাং তাহা মানবের জ্ঞান-গোচর কি প্রকারে হইবে? যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে, তাহা জ্ঞানেরও গোচর নহে ; যাহা জ্ঞানের গোচর নহে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। তবে চাক্ষুষ আকার বিহীন বায়ুর সত্বা অনুভব করিয়া থাকি বলিয়াই নিরাকার আত্মার কল্পনা করিতে সক্ষম হই নতুবা মানব কখনও উহার কল্পনা করিতে পারিত না ; যাহা হউক, আত্মার স্বরূপ যে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না, তাহা আপ্ত বাক্য বলিয়া, বিশ্বাস না করিলে জ্ঞানের দ্বারা কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য আত্মাবাদীরা অজ্ঞেয় আত্মার কল্পনা করিতেছেন, সে উদ্দেশ্য সফল হইতেছে কি না। তাঁহারা কহিতেছেন জড় নিশ্চেষ্ট, চেষ্টা সুচেতন আত্মা ভিন্ন জড় দ্বারা হইতে পারে না। সুতরাং চেতন আত্মা না থাকিলে জীবের চেষ্টা কি প্রকারে হইল? আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কেবল মানবই চেতন আত্মাবিশিষ্ট, না—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা. সমস্তই আত্মাবান্। যদি বলেন কেবল মানবেরই আত্মা আছে, আর কোনও জীব বা উদ্ভিদের আত্মা নাই, তাহা হইলে-

আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, যে, যখন জড়ের চেষ্টা নাই ও যখন পশুপক্ষ্যাদি প্রাণী ও উদ্ভিদের আত্মা নাই, তখন তাহারা গমন, মনন, ইচ্ছা, প্রেম প্রভৃতি চেতনোপযোগী কার্য্য কি প্রকারে সম্পাদন করে? অনেক ইতর প্রাণীর বুদ্ধি পরিচালনা ও শিল্পনৈপুণ্য প্রভৃতির এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় যে শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা ঐ বুদ্ধি চালনা ও শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ কি প্রকারে করে? প্রধানতঃ মানবে ও জীবে প্রভেদ এই যে মানব উন্নতি শীল ও ইতর জীব চিরকাল একভাবেই থাকে। এরূপ হইলে চেতন ও জড়ে প্রভেদ কত টুকু থাকিল? আত্মা ও জড়ের প্রভেদের পরিমাণ কি? যদি বল উদ্ভিদ্ ও জীবমাত্রই আত্মাবান্, তবে তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ কেন? কোন ইতর জীব ও উদ্ভিদের উন্নতি নাই কেন, তাহাদের ধর্ম্ম ভয় নাই কেন ও তাহারা সর্ব্বতোভাবে মানবের অধীন কেন? ইতর জীব দেহে আত্মা মানবের ন্যায় কার্য্য করে না কেন? এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে আত্মা স্বীকারের উদ্দেশ্য বিফল হইতেছে? তবে আত্মার কল্পনা কেন?

এস্থলে আর একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা কি জড়-সম্ভূত না স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যখন শুক্রশোণিত যোগে দেহের উৎপত্তি হয়, সেই সময়ে আত্মার জন্ম হয়, না আত্মার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, যখন জড় দেহ জন্ম গ্রহণ করে, সেই সময় বা তৎপরে আত্মা ঐ দেহ আশ্রয় করে? যদি আত্মা জড়-সম্ভূত হয় তবে আর আত্মার স্বাতন্ত্র্য কোথায় রহিল, যদি আত্মা স্বতন্ত্র হয় তবে তাহা কোথায় থাকে, কত সংখ্যক আত্মার বিদ্যমানতা আছে, কোন্ আত্মা কোন্ শরীরে প্রবেশ করিবে, তাহার নিয়ম কি এবং কিরূপে ও কোন্ সময়ে আত্মা জড় দেহে প্রবেশ করে? এ সকল কথা কে বলিয়া দিবে? যদি আপ্ত বাক্য বিশ্বাস না করা যায় তবে কি জ্ঞানের সাহায্যে এ সকল জানা যায়?

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, শুক্রশোণিতের যোগে জীবদেহের উৎপত্তি হয়; আত্মা কোন্ সময়ে সেই জড় দেহে প্রবেশ করে?

আম্র মধ্যে ও বিকৃত দ্রব্য হইতে যে সকল কীট জন্মে, তাহারা যদি আত্মাবান্ হয়, তবে কোন্ সময়ে আত্মা ঐ আম্র ও বিকৃত দ্রব্য মধ্যে প্রবেশ করে? যদি আত্মার সহিত শুক্রশোণিত যোগের ও বিকৃত দ্রব্যাদির অকাট্য সম্বন্ধ থাকে, তবে কেন সর্ব্ব সময় জীবের উৎপত্তি না হয়? স্ত্রী পুরুষের সম্মিলনমাত্রেই কেন সন্তান না জন্মে? বন্ধ্যা স্ত্রীর সম্মিলনে সন্তান হয় না কেন? আর এক কথা,—যদি আত্মাই মানবের মানবত্বের কারণ, যদি আত্মাই জ্ঞান বুদ্ধির হেতু, যদি আত্মাই চিন্তা শক্তির মূল, তবে সকলেরই কেন সমান মানবত্ব, সমান জ্ঞান, সমান বুদ্ধি ও সমান চিন্তা শক্তি জন্মে না? যখন সকলেতেই আত্মা আছে তখন কেহ দুর্ব্বল, কেহ বলবান্, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ সৎ, কেহ অসৎ, কেহ বিনয়ী, কেহ অহঙ্কারী, কেহ চিন্তাশীল ও কেহ চিন্তাশূন্য হয় কেন? জন্মসময়ে যখন আত্মা দেহ আশ্রয় করে তখন কি জন্য জন্মমাত্র বালকেরা সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞানী না হয়? কি জন্য চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না? এবং শোণিতের অপগমে জীবেরই বা নাশ হয় কেন? ইহার উত্তরে আত্মাবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা সকল কার্য্যের কর্ত্তা বটে, কিন্তু দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যেই আত্মা কার্য্য করিয়া থাকেন; সুতরাং যে শরীরে যেমন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে, সে শরীর হইতে সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। অস্ত্র তীক্ষ্ণ হইলে ছেদক যেরূপ অনায়াসে ছেদন করিতে পারে ও অস্ত্রে ধার না থাকিলে সে যেমন ছেদনে অসমর্থ হয়, আত্মাও সেইরূপ যে দেহে যেরূপ যন্ত্র থাকে সেই দেহস্থ যন্ত্র অবলম্বন করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য আত্মা চক্ষু না থাকিলে দেখিতে পায় না, কর্ণ না থাকিলে শুনিতে পায় না এবং বালদেহে জ্ঞানোপযোগী ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় বালক জ্ঞানী হইতে পারে না। তাহা হইলে ত স্পষ্টই বলা হইল যে, আত্মার সকল কার্য্যেরই মূল জড়শক্তি, এবং আত্মার যে কার্য্যে অশক্ততা তাহারও মূল জড়শক্তি। যখন ইহা স্বীকার্য্য যে আত্মা

ভিন্ন জীবের আর সকলই জড় সম্ভূত এবং যখন বলা হইতেছে জড়ের চেষ্টা শক্তি নাই, তখন কি প্রকারে জড় পদার্থ আত্মার দর্শন, শ্রবণ, গমন, মনন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করে এবং কি প্রকারেই বা আত্মার ঐ সকল কার্য্যের বাধা প্রদান করে? যাহার চেষ্টা নাই সে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেও পারে না, এবং অন্যের অনুষ্ঠিত কার্য্যের বাধাও প্রদান করিতে পারে না। জড়বিজ্ঞান এবিষয় বিশেষ রূপ প্রমাণ করিয়াছে। সুতরাং আত্মা-বাদীদিগের এ উত্তর সঙ্গত হইল না। বিশেষ, সকল কার্য্যই যদি জড়-শক্তি সম্পন্ন করিল, তবে আত্মা কোন্ কার্য্য করিল? হে আত্মাবাদিন্! যখন তুমি বলিতেছ,—মানবের বল, বুদ্ধি, রাগ, দ্বেষ, বিবেক, চিন্তা প্রভৃতি সমস্তেরই ন্যূনাধিক্যের কারণ মানবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি আদি এবং যখন তুমি বলিতেছ ঐ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সমস্তই জড় সম্ভূত, তখন ঐ সকলকে কি জড়ের কার্য্য বলা হইল না? তাহা যদি হইল, তবে আত্মা কি কার্য্য সম্পন্ন করেন! জন্ম লাভ করে কে? অবশ্য বলিবে শরীর; আহার করে কে? মুখ ও উদর; চিন্তা করে কে? মন; বিবেচনা করে কে? বিবেক; স্মরণ করে কে? স্মৃতি; শিক্ষা করে কে? ধারণা; ভালবাসে কে? প্রণয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সমস্ত বৃত্তি কি জড় সম্ভূত,—না, উহারা চেতন আত্মার অঙ্গ? যদি উহাদিগকে আত্মার অঙ্গ বল, তবে মানব বিশেষে ঐ সকলের ন্যূনাধিক্যের যে কারণ নির্দ্দেশ করিলে, তাহার বিপরীত হইল; যদি ঐ সকলকে জড় সম্ভূত বল, তবে বিবেক, চিন্তা, ধর্ম্মভয় প্রভৃতি যে সকল প্রধান গুণ হেতু মানবের মানবত্ব এবং কেবল মাত্র যে সকলের কারণ স্বরূপে, চেতন আত্মার কল্পনা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই জড়জাত বলা হইল। তাহা হইলে আর আত্মার কি প্রয়োজন থাকিল? আত্মা কি কেবল সাক্ষীগোপাল মাত্র? এরূপ সাক্ষীগোপাল আত্মা কল্পনা করার প্রয়োজন কি? যখন আত্মা স্বীকার করিয়াও জড়ের অসীম শক্তি স্বীকার করিতে হইল, তখন আত্মা স্বীকারের প্রয়োজন ফুরাইয়া

গেল। তবে যদি কেহ বলেন যে, যদিও জীবের চিন্তন, মনন, গমন প্রভৃতি কার্য্য শারীরবৃত্তি সমুদ্ভূত বটে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যের নিয়োক্তা কে এবং তাহার ফলভোক্তা কে? যদি আত্মাকেই তাঁহারা ঐ সকলের নিয়োক্তা ও তাহার ফলভোক্তা অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোক্তা বিবেচনা করেন, তবে সকল আত্মা সমানরূপ কার্য্যে নিয়োগ করেন না কেন? কেহ সৎকার্য্যে ও কেহ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত কেন? কেহ দানে ও কেহ লুণ্ঠনে নিযুক্ত কেন? কেহ যুদ্ধ ও কেহ শান্তিস্থাপনে সচেষ্ট কেন? যদি শারীর বৃত্তি এই ইতর বিশেষেরও কারণ হয়, তাহা হইলে আর আত্মার কোনও প্রয়োজনই থাকে না। যদি এই সমস্ত কথার উত্তর স্বরূপে কেহ বলেন যে আত্মা সকল সমান নহে, যে শরীরে যেরূপ আত্মা অধিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই শরীরী জীব সেইরূপ কার্য্য করে; তাহা হইলে একথার প্রতি এত আপত্তি উত্থাপিত হইবে যে তাহার মীমাংসায় আত্মা জড়শক্তিরই নামান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; ফলতঃ আত্মাকল্পনার মূল কারণ এই যে, আত্মবাদীরা বলেন যে, যখন জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট এবং জীব সকল সচেষ্ট, তখন জীবে জড়াতিরিক্ত অবশ্য কোন পদার্থ আছে। এই যুক্তিই তাঁহাদের আত্মা স্বীকারের মূল। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে বাস্তবিক জড় পদার্থ নিশ্চেষ্ট কি সচেষ্ট।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জগতে কোন পদার্থ নিশ্চেষ্ট নহে। যে সকল পদার্থ জড় নামে অভিহিত, তাহারা জড় নহে। দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক জড় পরমাণু অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ স্বাভিমুখে আনিবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করে। প্রত্যেক পদার্থেরই আত্মীয় বা অভীপ্সিত পদার্থ আছে; তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত হয়। অনেক পদার্থের শত্রু অর্থাৎ অনভিমত পদার্থ আছে। সকল পদার্থেরই ঔদ্ধত্য বা তাপ আছে। চুম্বক প্রিয়পদার্থ লৌহকে আকর্ষণ করে, পদ্মপর্ণ বা তৈলের সহিত জলের মিলন হয় না; ক্ষার ও অম্ল একত্রিত হইলে

ভয়ানক গতি ও তেজ প্রকাশ করে। বায়ু কখন মৃদু, কখন ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। জলের বেগ অর্থাৎ স্রোতঃ, জোয়ার ভাটা, প্লাবন প্রভৃতি সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইতেছে। দীপ-শিখা ও ধূম ঊর্দ্ধে গমন করিতেছে। এ সকলই জড় পদার্থ, অথচ এ সকলেরই চেষ্টা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। আবার যদি সুকৌশলে পদার্থ সকল সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহার কত সচেষ্টত্ব অনুভূত হয়! সময় নিরূপণযন্ত্র কি চমৎকার কৌশলে সময় নিরূপণ করিতেছে। বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা যে সকল অদ্ভুত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাড়িৎ বার্ত্তাবহ নিমেষ মধ্যে ৬ মাসের পথে সম্বাদ লইয়া যাইতেছে। আলোকচিত্রযন্ত্র দ্বারা নিমেষ মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য চিত্র সকল চিত্রিত হইতেছে। এইরূপ টেলিফোন্, মাইক্রফোন্, ফোনোগ্রাফ্ প্রভৃতি জড় পদার্থ নির্ম্মিত অশেষ বিধ যন্ত্র যে সকল অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য একত্রিত হইলেও তাহা সম্পন্ন করিতে পারে না। আবার যদি বিশ্বাস কর, তবে আরও কয়েকটী চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

খৃষ্টের জন্মের ৪শত বৎসর পূর্ব্বে টরেন্টম্‌নগরে আরকাইটাস্ নামক এক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত একটী কাষ্ঠের পায়রা নির্ম্মাণ করেন, সে উড়িতে পারিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূলার নামক জর্ম্মন্ জ্যোতির্ব্বিদ্ একটী কাষ্ঠের চীল পক্ষী নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, সে প্রতিদিন নগর হইতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিত। তিনি একটী মক্ষিকা নির্ম্মাণ করেন, সে ভোজ-স্থলে তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া সমুদায় গৃহে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিত। আল্‌বর্ট সমাগ্নস্ ও বেকন্ বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লিড্রুজ নামে সুইজরলণ্ডীয় শিল্পী একটী ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহাতে একটী ভেড়া স্বাভাবিক ডাক ডাকিত। একটী কুকুর এক ঝুড়ি ফল চৌকি দিত, কেহ তাহা স্পর্শ করিতে আসিলে দাঁত খিচাইত এবং উচ্চৈঃস্বরে

ডাকিত। সেই সঙ্গে কতকগুলি মনুষ্য মূর্ত্তি আশ্চর্য্যভাবে চলিয়া বেড়াইত। ঐ শিল্পী একটী মনুষ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সে নিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ধীরভাবে ক্রমান্বয়ে ৫।৬ খানি ছবি চিত্রিত করিত। কেম্পলেন্‌ নামক হঙ্গেরি দেশীয় এক শিল্পকর এক আশ্চর্য্য দাবা খেলোয়ার প্রস্তুত করেন, এটী আজিও বিলাতে আছে। একটী মুসলমান মূর্ত্তি সম্মুখে একটী বাক্সের উপর দাবা সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহার সহিত দাবা খেলিতে আসিয়া কেহ তাহাকে হারাইতে পারে না। সে বাম হস্ত দিয়া খেলিয়া থাকে। কঠিন চাল উপস্থিত হইলে গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে। প্রতিপক্ষ কোন অন্যায় চাল্‌ চালিলে, তখনই তাহার প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহে ও বাক্সের উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাত করিয়া রাগ প্রকাশ করে। পারিস্‌ বিজ্ঞান সভার ভোকন্‌সন্‌ একটী বংশীবাদক ও আর একটী বাজাদার নির্ম্মাণ করেন। বংশীবাদক বাঁশীর সাত ছিদ্রে সাতটী অঙ্গুলি দিয়া অতি পারদর্শী বাদকের ন্যায় বাঁশী বাজাইত। বাজাদার ২০ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সুর বাজাইতে পারিত। তিনি একটী হংসী প্রস্তুত করেন, সে স্বাভাবিক পক্ষীর ন্যায় পান ভোজন করিত, উহা পরিপাকও হইত। সুইজার্লণ্ড দেশীয় মেলাডেই নামক এক ব্যক্তি একটী স্ত্রী মূর্ত্তি দ্বারা পায়নাপোর্ট যন্ত্রে ১৮টী সুর আশ্চর্য্যরূপে বাজাইত। সেই রমণী যেরূপ সুন্দর ভাব ভঙ্গী সহকারে শরীর আন্দোলন করিত তাহা দেখিতে অতি আশ্চর্য্য। উক্ত শিল্পকর একটী গায়ক পক্ষী নির্ম্মাণ করেন, সে লাফ দিয়া উঠিয়া পাখা ঝাড়িয়া শিষ ধরিয়া গান আরম্ভ করিত। পক্ষীটী ৪ মিনিট করিয়া বাহিরে বসিয়া ৪ প্রকার পক্ষীর স্বর আলাপ করিত। এই শিল্পকর একটী বালকের মূর্ত্তি গঠন করিয়াছিল। সে চিত্র এবং ফরাসী ও ইংরেজী অক্ষর অতি সুন্দররূপে লিখিতে পারিত। ফরাসীরাজ চতুর্দ্দশ লুইয়ের আমোদ জন্য কয়েকটি কল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তাহার একটী এই—"এক খানি ছোট

গাড়িতে দুইটী ঘোড়া যোড়া। তাহার উপরে একটী বিবি, একটি সইস ও বালক ভৃত্যকে পশ্চাতে লইয়া বসিয়াছেন। একটি বৃহৎ টেবিলের উপর গাড়ী খানি স্থাপিত হইলে গাড়োয়ান চাবুক মারিল এবং ঘোড়া দৌড়িল, ঠিক প্রকৃত ঘোড়া যেমন পা ফেলিয়া চলে তেমনি চলিল। টেবিলের অপর ধারে আসিয়া গাড়ী খানি বাঁকিয়া ঠিক্ ধার দিয়া চলিল এবং যেখানে রাজা বসিয়া আছেন সেই খানে গিয়া থামিল। বালক ভৃত্য অমনি নামিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং বিবি একখানি দরখাস্ত হস্তে নামিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিবি পুনরায় সেলাম করিয়া যেন বিদায় লইলেন এবং গাড়ীতে চড়িলেন। গাড়োয়ান চাবুক মারিল, ঘোড়া আবার চলিল। সইস নামিয়াছিল, দৌড়িয়া গাড়ীর পশ্চাৎভাগে উঠিল, গাড়ী চলিয়া গেল।" ইবান্‌স নামক এক সাহেব তাঁহার জুবিনাইল টুরিষ্ট পত্রে পারিস নগরে যে আশ্চর্য্য দৃশ্য প্রদর্শন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দৃশ্য—"প্রাতঃ কালে একটী বনের শোভা। সকল বস্তু ধূষর নবীন ও শিশির সিক্ত বোধ হইল, ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইল, ঘবের ভিতর সর্প সকল চলিয়া যাইতেছে দেখা গেল, এক ছোট শিকারী বন্দুক স্কন্ধে আসিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া শিকার সন্ধান করিতে লাগিল। একটী সরোবর হইতে একটী ছোট হংস উঠিল এবং শিকারীর সম্মুখে উড়িয়া গেল। শিকারী ভাল করিয়া বন্দুক ছুড়িল, হংসটী ঘুরিয়া পড়িল। শিকারী তাহাকে স্কন্ধে ফেলিয়া বন্দুক কোমরে বাঁধিয়া চলিয়া গেল। চার বুকল উর্দ্ধ ঘোটক সকল গাড়ী টানিতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ কৃষক সকল যাইতেছে; সম্মুখে নেপলস উপসাগর ও তাহার বৃহৎ সেতু, তাহার উপর দিয়া গাড়ী ঘোড়া চলিতেছে, জলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ চলিতেছে, শেষে এক প্রলয় ঝড় উপস্থিত হইল, জাহাজ ভগ্ন—নাবিক গণ জলে ভাসিতে ও ডুবিতে

লাগিল, এক জন নাবিক ভাসিয়া পাহাড়ের ধারে গিয়া লাগিল, তাহার উদ্ধারার্থে নৌকা সকল আসিবার চেষ্টা করিল, ডুবিয়া গেল। ক্ষুদ্র নাবিককে অত্যন্ত আর্ত্তনাদ করিতে দেখা গেল, ঝড় থামিল, "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি বাতিঘর হইতে পাহাড়ের ধারে আসিল, দড়ি নামাইয়া দিল, ক্লান্ত নাবিক তাহা ধরিয়া খানিক দূর উঠিয়া, হাত পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, আবার প্রাণ পণে দড়ি ধরিয়া নিরাপদে পাহাড়ের উপরে উঠিল।"

এইরূপ ও অনুরূপ বহুবিধ আশ্চর্য্য যন্ত্র মানবগণ জড়পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অধিক কি, অত্যন্ত দুরূহ গাণিতিক অঙ্ক ও প্রতিজ্ঞা সকলের প্রকৃত উত্তরও যন্ত্র বলে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যখন এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কেবল জড়পদার্থের সংযোগ মাত্রেই সম্পন্ন হইতেছে, তখন জড়কে নিশ্চেষ্ট কি প্রকারে বলা যায়? তবে ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে যদিও জড়ের চেষ্টা আছে কিন্তু সে চেষ্টা একই নিয়মের অধীন। উপরে যে সকল যন্ত্রের উল্লেখ হইল সে সকল একইরূপ কার্য্য সম্পাদন করে, অর্থাৎ যে যন্ত্র যে কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্যেরই অভিনয় হইয়া থাকে, এবং যাহার পর যাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে তাহার পর তাহাই অনুষ্ঠিত হয়, নূতন কিছুই হয় না এবং পর্য্যায়েরও পরিবর্ত্তন হয় না। তাহাতে কোন ইচ্ছা বা সংকল্প থাকা প্রকাশ পায় না। কিন্তু জীবের সেরূপ নহে, তাহাদের ইচ্ছা আছে এবং তদনুসারে তাহারা যখন যাহা ইচ্ছা হয় তখন তাহাই সম্পাদন করে, যন্ত্র সকলের ন্যায় পর্য্যায়ানুসারে চলে না। আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত ভ্রম পূর্ণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবেক, যে, উদ্ভিদ্ ও জীবগণেরও স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। যদি উহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকিত তবে অবশ্য সেই ইচ্ছা অনুসারে চলিতে পারিত এবং তাহা হইলে তাহারা কখনও চিরকাল একরূপ ইচ্ছা করিত না। তাহা হইলে আম্র বৃক্ষ অন্ততঃ এক দিনও নারিকেল ফল প্রসব করিত

এবং চম্পাক পুষ্প এক দিনও পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত করিত, তাহা হইলে ব্যাঘ্র অবশ্য এক দিন জীবহিংসা পরিত্যাগ করিয়া নিরামিস ভোজন করিত এবং মেষের মনে অবশ্য এক দিন পশুসংহার করিয়া ভোজন করিবার ইচ্ছা হইত। যখন তাহা না করিয়া সকলেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ইচ্ছা ও কার্য্য করে, তখন যাহা ইচ্ছা তাহা করে কি প্রকারে বলা যায়? বরং উহারা যে যন্ত্র সকলের ন্যায় পর্য্যায় অনুসারে চলে, ইহা দ্বারা তাহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। দেখ, সকল বৃক্ষই প্রথমে অঙ্কুরিত, পরে পল্লবিত, তৎপরে শাখান্বিত হয়; বয়োবৃদ্ধি হইলে সকল উদ্ভিদ্ পুষ্পিত ও ফলবান হয়; যাহার যে সময় নিয়মিত তাহার সে সময়ে ফুল ফল হইয়া থাকে। বিশেষ কারণ ভিন্ন এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। জীবগণও ঐরূপ পর্য্যায়ক্রমে আহার বিহার নিদ্রা ও জননক্রিয়াদি নিস্পাদন করে। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জীব ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ্ যে নিয়মে কাল যাপন করিয়াছে এখনও সেই ঠিক্ নিয়মে করিয়া থাকে, কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে, যন্ত্র সকলের ন্যায় জীব ও উদ্ভিদ্গণও উপাদান সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে কার্য্য সম্পাদন জন্য যে জীব বা যে উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই জীব বা সেই উদ্ভিদ্ কেবল সেই কার্য্যই সম্পাদন করিতে বাধ্য! যদি স্বতন্ত্র চেতন আত্মা ইচ্ছার কারণ হইত তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন সময়ে নিয়মের ব্যত্যয় হইত।

আরও সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবগণও যে ঐরূপ একই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। দেখ, সকল মানব একই নিয়মে জন্মগ্রহণ করিতেছে, একই নিয়মে বাল্য ক্রীড়া করিতেছে, একই নিয়মে যৌবন সুখ অনুভব করিতেছে এবং একই নিয়মে বৃদ্ধ কাল কাটাইতেছে। স্থূলতঃ, মানবের সকল কার্য্যই এক নিয়মাধীন। তবে যে পর পর শ্রেণী পূর্ব্বক কার্য্য হয় না, সে কেবল আকর্ষক পদার্থ সকল পর পর উপস্থিত না হওয়াই

তাহার কারণ। যখন যাহা উপস্থিত হইতেছে তাহারই কার্য্য মানব শরীরে প্রকাশ পাইতেছে। যখন এমন পদার্থ মানবের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে যে, তাহার সহিত তাহার আকর্ষণ আছে, তখন তাহাকে ভাল বাসিতেছে; যখন বিপ্রকর্ষণকারী পদার্থ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে তখন তাহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে। আকর্ষণের নামান্তর অনুরাগ। প্রণয়, স্নেহ ও ভক্তি সমুদায়ই আকর্ষণ মূলক। বিপ্রকর্ষণের নামান্তর বৈরাগ্য। ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি বিপ্রকর্ষণ মূলক। সাধারণতঃ, স্ত্রী পুরুষে পরস্পর আকর্ষণ আছে। আবার তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে অধিকতর আকর্ষণ আছে। তাহাদিগের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে। এই জন্য প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। এই জন্যই অতি কুৎসিতা রমণীর সহিত সুন্দর পুরুষের ও পরমা সুন্দরী রমণীর সহিত কদাকার পুরুষের প্রণয় জন্মে। এই কারণেই যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার মন্দ গুলিও ভাল দেখে ও যে যাহাকে ঘৃণা করে তাহার ভাল গুলিও মন্দ দেখে। মানব সকল যে পরস্পর এত ভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন প্রকৃতি হয়, উপাদানের ন্যূনাধিক্য ও সমাবেশ পার্থক্যই তাহার প্রধান কারণ। যে মানব দেহে আকর্ষণকারী পদার্থ অধিক আছে, সে অধিক প্রণয়ী হয়, সকলে তাহাকে ভালবাসে এবং সকলকে সে ভালবাসে; যাহার দেহে বিপ্রকর্ষণ শক্তি অধিক, সংসারে তাহার আনুরক্তি থাকে না, সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করে; যে দেহে তাপ অধিক সে অধিক তেজীয়ান্ হয়; এবং যাহাতে তাপ অল্প সে বিনয়ী হয়। এই রূপে যে শরীরে যে গুণের উপকরণ অধিক, সে শরীরে সেই গুণ অধিক দৃষ্ট হয়। বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, বিবেক, অভিমান, দম্ভ, ধৈর্য্য, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানবীয় গুণমাত্রই পদার্থের শক্তি বিশেষ। যে গুণের উপকরণ যে শরীরে যত অধিক আছে, সেই শরীর সেইগুণে তত অধিক ভূষিত হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। এই জন্যই বলিয়া থাকে, "অঙ্গার শত ধৌতেন মলিনত্বং ন যায়তে" এবং এই জন্যই বলিয়া থাকে, "[illegible]"

"স্বভাব যায় মলে।" যেমন চুম্বকের লৌহাকর্ষণ শক্তি, অগ্নির উষ্ণত্ব কিছুতেই যাইবার নহে, সেইরূপ মানবের স্বভাবও চিরকাল অটল থাকে। যে উপকরণ হইতে দেহ গঠিত, তাহার শক্তি কোথায় যাইবে? এইজন্য বুদ্ধিমান্ নির্ব্বোধ হয় না, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান্ হয় না; সাধু অসাধু হয় না, অসাধু সাধু হয় না; যাহার যে শক্তি, তাহার অন্যথা কিছুতেই হয় না। কিন্তু যদি মানবের জড়াতিরিক্ত ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে কখনও এরূপ হইত না, কেননা, তাহা হইলে ইচ্ছা করিয়া কখনও দুর্ব্বল একদিন বলী হইত, ক্রোধী ক্ষমাপর হইত, তেজীয়ান্ বিনয়ী হইত, কামী নিষ্কাম হইত, নির্ব্বোধ বুদ্ধিমান হইত, নিষ্ঠুর দয়ালু হইত এবং রোগী সুস্থকায় হইত। তবে অনেক সময়েই মানবকে স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ঐরূপ বিপরীত ভাবাপন্ন হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহার কারণ স্বতন্ত্র; জ্ঞান ও শিক্ষা প্রকরণে সে বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে। শাণিত হইলে লৌহাস্ত্র যেমন তীক্ষ্ণ হয়, বিনা ব্যবহারে তাহা যেমন আবার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, শিক্ষা দ্বারাও সেইরূপ বৃত্তি বিশেষ শাণিত ও বৃত্তি বিশেষ নিস্তেজ হইয়া যায়। কিন্তু যাহার যাহা নাই, শিক্ষা দ্বারা তাহা হইতে পারে না। কাষ্ঠ শাণিত হইলে যদিও অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ ধার হয়, কিন্তু কখনও লৌহের তুল্য হইতে পারে না। দিগ্গজ পণ্ডিত সহস্র বৎসর শিক্ষা করিলেও রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় হইতে পারিবে না। কালিদাস যদি বিদ্যাশিক্ষা না করিতেন, তথাপি কবি হইতেন। তবে এত উৎকৃষ্ট হইতে পারিতেন না। রামবসু, হরুঠাকুর, মধুকাণ, দাশরথি রায় শিক্ষা না করিয়াও কবি। শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের কবিতা অধিক মার্জ্জিত হইত মাত্র। যুধিষ্ঠির ও সক্রেটিস্ শিক্ষা না করিলেও সাধু হইতেন; ভীষ্ম, অর্জ্জুন শিক্ষিত না হইলেও বীর হইতেন এবং বিশ্বামিত্র শিক্ষিত না হইলেও যোগী হইতেন। শিক্ষার গুণ এই যে, যাহার যাহা আছে, শিক্ষা দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহার যাহা আদৌ নাই,

শিক্ষা তাহা দিতে পারে না। এবং যাহা শিক্ষা দিতে বা মার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারে তাহাও প্রাকৃতিক শক্তির ন্যায় সুদৃঢ় হয় না। এই জন্য প্রাকৃতিক কার্য্যের এত প্রশংসা। এবং এই জন্যই প্রাকৃতিক কবি যাহা বলেন, তাঁহাই মিষ্ট লাগে, প্রাকৃতিক প্রেমের সমুদায়ই সুন্দর, প্রাকৃতিক স্বরের এত মনোহারিত্ব ও প্রাকৃতিক রূপের এত সৌন্দর্য্য। যাহার হৃদয়ে করুণা আছে, তাহার ভাব অতি মধুর; যাহার ধৈর্য্য আছে, সে মহা বিপদেও অটল এবং যাহার বিবেক আছে, সে কিছুতেই কুকর্ম্মশালী হয় না। শিক্ষা দ্বারা যে গুণের উৎপাদন হয়, তাহার কখনও এত মনোহারিত্ব ও এত দৃঢ়তা থাকে না। এই সকল দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, মানবের কার্য্য সমস্ত জড়াতিরিক্ত স্বতন্ত্র ইচ্ছা বা শক্তিজাত নহে; সমস্তই জড়শক্তিজাত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে কি মানবের ইচ্ছা নাই? তবে মনুষ্য সকল যে সমস্ত কার্য্য করে তাহা কি ইচ্ছা প্রেরিত হইয়া করে না? অবশ্য ইচ্ছা আছে; আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে মানবের আদৌ ইচ্ছা নাই। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে মানবের ঐ ইচ্ছা দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র চৈতন্যের নহে; উহা জড়শক্তি-জাত। কারণ,—ইচ্ছা অর্থে কি বুঝায়? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আকর্ষণের নামান্তর ইচ্ছা অর্থাৎ দেহে যে পদার্থ আছে তাহার সহিত বাহ্য যে পদার্থের আকর্ষণ আছে তাহার মিলন করার চেষ্টাকে ইচ্ছা বলে। এই জন্য যে দেহে যেরূপ পদার্থ আছে সে দেহী সেইরূপ বস্তু লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই জন্য কেহ মদ্যপানে ইচ্ছুক, কেহ মাংস ভোজনে ইচ্ছুক ও কেহ নিরামিশ ভোজনে ইচ্ছুক হইয়া থাকে; এইজন্য কেহ খেলা করিতে ও কেহ কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়। এইজন্য "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ" প্রবাদ এবং এই জন্যই লোকে ঐ সকল পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলে সুখী হয়। যদি ঐ ইচ্ছা স্বতন্ত্র চৈতন্যের হইত তাহা হইলে কখনও এরূপ ভিন্ন প্রকার অথচ স্বভাবানুযায়ী হইত না।

প্রত্যুত যাহা করিলে প্রকৃত সুখ হয় সকল মানবই তাহা করিতে ইচ্ছুক হইত।

মানবের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা হইতে নিকৃষ্ট উদ্ভিদ পর্য্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর পর প্রভেদ নিরীক্ষণ করিলে আলোচ্য বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে উদ্ভিদ্‌ ও মানবের অন্তর অত্যন্ত অধিক হয় বটে, কিন্তু পর পর দেখিয়া আসিলে প্রভেদ অতি অল্প দৃষ্ট হইবে। এ সমুদায়ই উপাদান পদার্থের ন্যূনাধিক্য ও বিন্যাসের ইতর বিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে। ঐ উপাদান ও সন্নিবেশ ভিন্নতা হেতু উদ্ভিদের আত্মা অপেক্ষা কীটাণুর, কীটাণু হইতে কীটের, কীট হইতে পতঙ্গের, পতঙ্গ হইতে মৎস্যের, মৎস্য হইতে পক্ষীর, পক্ষী হইতে কুকুরের এবং কুকুর হইতে বানরের আত্মা শ্রেষ্ঠ। ঐ ভিন্নতা হেতু বানর হইতে বনমানুষের, বনমানুষ হইতে অতি অসভ্য মানবের, তাহা হইতে ভীলকুলি দিগের, তাহাদের হইতে কাফ্রি আদির, তাহাদের হইতে সভ্য মানবের আত্মা পর পর শ্রেষ্ঠ। আবার ঐ ভিন্নতা হেতু সভ্যজাতির মধ্যে দিগ্গজ হইতে আর্য্যভট্ট, বুদ্ধ, বা ব্যাসের মধ্যে আত্মার এত প্রভেদ হইয়াছে। ঐ ভিন্নতাহেতু সকল দ্রব্য সকলের প্রিয় হয় না এবং সকল দ্রব্য সকলের উপকারক বা অপকারক হয় না। যে পদার্থ মানব দেহের নিতান্ত অপকারক, সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণ রক্ষক। মানব দেহ হইতে মল বলিয়া যাহা পরিত্যক্ত হয়, শূকারাদি জীবদেহ তাহাতেই পরিপুষ্ট হয়। যে মৃত্তিকায় রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া মানব পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই মৃত্তিকাই কত জীবের দেহ পোষক। যে বিষ ভোজনে মানবের প্রাণান্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের প্রাণ রক্ষা করে। যে আঙ্গারিকাম্ল জীবের নিতান্ত অনিষ্টকর, সেই আঙ্গারিকাম্ল ভিন্ন উদ্ভিদ্‌ একদণ্ডও বাঁচেনা। এ সকলের কারণ কি? যাহা অপকারী, তাহা সকলেরই অপকারক হয় না কেন এবং যাহা উপকারী তাহা সাধারণের উপকারক হয় না কেন? যন্ত্র নির্ম্মাণের ইতর বিশেষই ইহার

কারণ। জীবগণের কার্য্য ভেদের কারণও ঐ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এইরূপে যখন সকল কার্য্যই মানবের জড়শক্তিজাত প্রমাণিত হইতে চলিল তখন স্বতন্ত্র আত্মার আর কি প্রয়োজন থাকিল। বোধ হয় আত্মাবাদীরা সর্ব্ব শেষে এই আপত্তি করিবেন যে, জড়-শক্তি দ্বারা যদিও সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় বিবেচনা করা যায় কিন্তু বোধ ও জ্ঞান কখনও জড়ের হইতে পারে না। তাঁহারা বলিতে পারেন যে ঘটিকা যন্ত্র সকলকে সময়ের কথা বলিয়া দেয় বটে কিন্তু ঐ যন্ত্র কি জানে যে সে সকলকে সময় জ্ঞাপন করিতেছে? যদি কেহ ঘড়ীটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন তাহা হইলে ঐ ঘড়ী কি আঘাত জনিত বেদনা বোধ করে? কিন্তু মনুষ্য যাহা করে তাহা জ্ঞান পূর্ব্বক করে অর্থাৎ সে যাহা করে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে এবং জন্ম হইতেই সুখ দুঃখ বোধ করিতে পারে। জড়ের যখন বোধ শক্তি নাই তখন মানব ইহা কোথায় পাইল? ইহার উত্তরে আমরা আত্মা-বাদীকে ইহা বলিতে পারি—হে আত্মাবাদিন্ আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে জড়ের বোধ শক্তি নাই? যদি আপনি এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে কোন জড় বস্তুকে প্রহারাদি জন্য কাঁদিতে বা ছট্‌ফট্ করিতে দেখা যায় না—সুতরাং তাহাদের বেদনা বোধ নাই—তবে আমি জিজ্ঞাসা করি পিপীলিকাদি ক্ষুদ্রপ্রাণীগণও ত বেদনা পাইলে চীৎকার করে না—তুমি তাহাদের চীৎকার শুনিতে পাওনা বলিয়া কি তাহারা শব্দ করিতে পারে না সিদ্ধান্ত করিবে? না উহারা বেদনা পায় না বলিবে? মাইক্রোফোন্ যন্ত্র নির্ম্মিত না হইলে তুমি অনায়াসে বলিতে পারিতে যে পিপীলিকাদির স্বর যন্ত্র নাই। পিপীলিকা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার আর্ত্তনাদ তুমি শুনিতে পাও না—তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাও, এজন্য তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালন দেখিয়া তাহার ক্লেশানুভব শক্তি স্বীকার কর। কোন বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিলে বৃক্ষ কাঁদে না, হস্ত পদাদি সঞ্চালনও করে না, তবে কি বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করে না? যদি না করে, তবে ক্ষত

প্রত্যুত যাহা করিলে প্রকৃত সুখ হয় সকল মানবই তাহা করিতে ইচ্ছুক হইত।

মানবের মধ্যে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা হইতে নিকৃষ্ট উদ্ভিদ পর্য্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পর পর প্রভেদ নিরীক্ষণ করিলে আলোচ্য বিষয় আরও স্পষ্ট বুঝা যাইবে। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে উদ্ভিদ্ ও মানবের অন্তর অত্যন্ত অধিক হয় বটে, কিন্তু পর পর দেখিয়া আসিলে প্রভেদ অতি অল্প দৃষ্ট হইবে। এ সমুদায়ই উপাদান পদার্থের ন্যূনাধিক্য ও বিন্যাসের ইতর বিশেষ বশতঃ হইয়া থাকে। ঐ উপাদান ও সন্নিবেশ ভিন্নতা হেতু উদ্ভিদের আত্মা অপেক্ষা কীটাণুর, কীটাণু হইতে কীটের, কীট হইতে পতঙ্গের, পতঙ্গ হইতে মৎস্যের, মৎস্য হইতে পক্ষীর, পক্ষী হইতে কুকুরের এবং কুকুর হইতে বানরের আত্মা শ্রেষ্ঠ। ঐ ভিন্নতা হেতু বানর হইতে বনমানুষের, বনমানুষ হইতে অতি অসভ্য মানবের, তাহা হইতে ভীলকুলি দিগের, তাহাদের হইতে কাফ্রি আদির, তাহাদের হইতে সভ্য মানবের আত্মা পর পর শ্রেষ্ঠ। আবার ঐ ভিন্নতা হেতু সভ্যজাতির মধ্যে দিগ্গজ হইতে আর্য্যভট্ট, বুদ্ধ, বা ব্যাসের মধ্যে আত্মার এত প্রভেদ হইয়াছে। ঐ ভিন্নতাহেতু সকল দ্রব্য সকলের প্রিয় হয় না এবং সকল দ্রব্য সকলের উপকারক বা অপকারক হয় না। যে পদার্থ মানব দেহের নিতান্ত অপকারক, সেই পদার্থ অপর জীবের প্রাণ রক্ষক। মানব দেহ হইতে মল বলিয়া যাহা পরিত্যক্ত হয়, শূকারাদি জীবদেহ তাহাতেই পরিপুষ্ট হয়। যে মৃত্তিকায় রক্তকর দ্রব্য নাই বলিয়া মানব পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই মৃত্তিকাই কত জীবের দেহ পোষক। যে বিষ ভোজনে মানবের প্রাণান্ত হয়, সেই বিষ কত জীবের প্রাণ রক্ষা করে। যে আঙ্গারিকাম্ল জীবের নিতান্ত অনিষ্টকর, সেই আঙ্গারিকাম্ল ভিন্ন উদ্ভিদ্ একদণ্ডও বাঁচেনা। এ সকলের কারণ কি? যাহা অপকারী, তাহা সকলেরই অপকারক হয় না কেন এবং যাহা উপকারী তাহা সাধারণের উপকারক হয় না কেন? যন্ত্র নির্ম্মাণের ইতর বিশেষই ইহার

কারণ। জীবগণের কার্য্য ভেদের কারণও ঐ কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এইরূপে যখন সকল কার্য্যই মানবের জড়শক্তিজাত প্রমাণিত হইতে চলিল তখন স্বতন্ত্র আত্মার আর কি প্রয়োজন থাকিল! বোধ হয় আত্মাবাদীরা সর্ব্ব শেষে এই আপত্তি করিবেন যে, জড়-শক্তি দ্বারা যদিও সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় বিবেচনা করা যায় কিন্তু বোধ ও জ্ঞান কখনও জড়ের হইতে পারে না। তাঁহারা বলিতে পারেন যে ঘটিকা যন্ত্র সকলকে সময়ের কথা বলিয়া দেয় বটে কিন্তু ঐ যন্ত্র কি জানে যে সে সকলকে সময় জ্ঞাপন করিতেছে? যদি কেহ ঘড়ীটী ভাঙ্গিয়া ফেলেন তাহা হইলে ঐ ঘড়ী কি আঘাত জনিত বেদনা বোধ করে? কিন্তু মনুষ্য যাহা করে তাহা জ্ঞান পূর্ব্বক করে অর্থাৎ সে যাহা করে তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারে এবং জন্ম হইতেই সুখ দুঃখ বোধ করিতে পারে। জড়ের যখন বোধ শক্তি নাই তখন মানব ইহা কোথায় পাইল? ইহার উত্তরে আমরা আত্মা-বাদীকে ইহা বলিতে পারি—হে আত্মাবাদিন্ আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে জড়ের বোধ শক্তি নাই? যদি আপনি এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে কোন জড় বস্তুকে প্রহারাদি জন্য কাঁদিতে বা ছট্ফট্ করিতে দেখা যায় না—সুতরাং তাহাদের বেদনা বোধ নাই—তবে আমি জিজ্ঞাসা করি পিপীলিকাদি ক্ষুদ্রপ্রাণীগণও ত বেদনা পাইলে চীৎকার করে না—তুমি তাহাদের চীৎকার শুনিতে পাওনা বলিয়া কি তাহারা শব্দ করিতে পারে না সিদ্ধান্ত করিবে? না উহারা বেদনা পায় না বলিবে? মাইক্রোফোন্ যন্ত্র নির্ম্মিত না হইলে তুমি অনায়াসে বলিতে পারিতে যে পিপীলিকাদির স্বর যন্ত্র নাই। পিপীলিকা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাহার আর্ত্তনাদ তুমি শুনিতে পাও না—তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাও, এজন্য তাহার হস্ত পদাদি সঞ্চালন দেখিয়া তাহার ক্লেশানুভব শক্তি স্বীকার কর। কোন বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিলে বৃক্ষ কাঁদে না, হস্ত পদাদি সঞ্চালনও করে না, তবে কি বৃক্ষ ক্লেশ অনুভব করে না? যদি না করে, তবে ক্ষত

স্থান হইতে রস পতিত হয় কেন এবং সে স্থান শুকাইয়া যায় কেন? এবং পল্লব বা শাখা বিশেষ ভগ্ন হইলে সমুদায় বৃক্ষ শুকাইয়া মৃত হয় কেন? বৃক্ষের যদি অনুভব শক্তি না থাকিবে তবে উহার মূল সকল কঠিন স্থান ত্যাগ করিয়া কোমল স্থানে প্রবিষ্ট হয় কেন? অতএব উদ্ভিদের যে বোধ শক্তি আছে তাহার সন্দেহ নাই। উদ্ভিদেরই অনুভব ক্রিয়া যখন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তখন অপর জড়ের অনুভব শক্তির পরিচয় আমরা কিরূপে প্রাপ্ত হইব? বিশেষ অনুধাবন করিলে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারাও যায়। প্রথমে বিবেচনা কর সুখ দুঃখ বোধ কাহাকে বলে! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আকর্ষণের ন্যামান্তর ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা তৃপ্তির নাম সুখ সুতরাং তাহার অতৃপ্তিই দুঃখ। চুম্বক প্রিয় পদার্থ লৌহকে পাইয়া কি নিরতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করে না? এবং যখন লৌহ খণ্ডকে উহা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় তখন কি উহারা নিতান্ত অনিচ্ছা অর্থাৎ দুঃখ প্রকাশ করে না? তবে জড় পদার্থের অনুভব শক্তি নাই কি প্রকারে বলা যায়? জ্ঞান যে মানবের সহজাত সম্পত্তির নয় তাহা আমরা জ্ঞান প্রকরণে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যদি জ্ঞান সঞ্চয় করিবার শক্তি সকল পদার্থে না থাকে তাহাতেই বা দোষ কি? সকল পদার্থে কি সকল শক্তি আছে? যদি সকল পদার্থে সকল শক্তি থাকিবে তবে পর পর পদার্থ সকল শ্রেষ্ঠ হইবে কেন? এবং মানবই বা সকলের শ্রেষ্ঠ কি প্রকারে হইবে? যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের হেতু; মানবে যত যন্ত্র আছে এত আর কোন পদার্থে নাই, সুতরাং এত শক্তিও অন্য পদার্থে প্রকাশ করে না। মানবে বহুবিধ যন্ত্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বৃত্তি আছে বলিয়াই মানব বহুবিধ জ্ঞান সঞ্চয় করিতে ও বোধশক্তি প্রকাশ করিতে পারে; স্বতন্ত্র চৈতন্য উহার কারণ নহে।

আর একটী বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এবিষয়ে আর অধিক সন্দেহ থাকিবে না। চৈতন্যবাদীরা যে চেতন চেতন করিয়া গণ্ডগোল করিতেছেন সেই চৈতন্য যদি জড়েরই শক্তি হয়

তবে তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি কি? যদি ঈশ্বরই সমস্ত পদার্থের শক্তি দানের কারণ হয়েন তবে কি তিনি জড় পদার্থে চৈতন্য দিতে পারেন না? যদি এরূপ বিবেচনা করা যায় যে, জড়ের চৈতন্য শক্তি আছে তাহাতে দোষ কি? যে জড়ের অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তি সকল দেখিয়া মোহিত হইতে হইতেছে, যে জড়শক্তি অবিকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছে (ফোটোগ্রাফ্), অবিকল শব্দানুকার করিতেছে (ফোনোগ্রাফ্), প্রকৃত সময় নিরূপণ করিতেছে (ক্রোনোমিটর) ও সুমধুর গীত গাইতেছে (পাইনো), তাহার যে চৈতন্য থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তবে যদি জড়ের জড় নাম বলিয়া আপত্তি হয়, তাহার উত্তর এই যে জড়ের চৈতন্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মানবে উহার নাম জড় রাখিয়াছে। বাস্তবিক জড়পদার্থ জড় নহে। চৈতন্য জড়েরই শক্তি এবং উহাই জড়ের প্রধান শক্তি। আকর্ষণাদি জড়শক্তি পূর্ব্বে যেরূপ অজ্ঞাত ছিল, চৈতন্য শক্তিও সেইরূপ অদ্যাপি অজ্ঞাত রহিয়াছে। কালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা জড়ের চেতনা শক্তির পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ করিতে পারিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবিক সুধীগণ চৈতন্যের যে যে লক্ষণ করিয়াছেন, শক্তির লক্ষণ তাহার সহিত অনেক মিলে। শক্তির এই মাহাত্ম্য অবগত হইয়া আর্য্য-পণ্ডিতেরা শক্তিকে পরমেশ্বরী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে আদ্যাশক্তি কালীই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী।

যে হউক এক্ষণে আমরা এই বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিতে চাই যে, যখন স্বতন্ত্র চৈতন্যের সত্বা আমাদের জ্ঞানগোচর নহে, ও যখন উহার স্বতন্ত্র কার্য্য আমাদের কিছুই উপলব্ধি হইতেছে না, অথচ মানবাদি জীবগণ চেতনোপযোগী কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে ও যখন চৈতন্য জড় সম্মিলিত হইলে চৈতন্যের মাহাত্ম্যের কিছু মাত্র খর্ব্ব হওয়ার কারণ দেখা যায় না তখন জড়পদার্থ জড় নহে, জড় ও চৈতন্যে সর্ব্বদা মিলিত। আমাদিগের আত্মা জড়জাত চেতন শক্তি বিশেষ। ঐ আত্মাই আমি পদবাচ্য এবং উহা দেহের মূলযন্ত্র। এ বিষয় আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব ও পরকাল।

আত্মা যদি জড়শক্তি সমুদ্ভূত হইল, তবে কি মৃত্যু পর্য্যন্তই মানবের শেষ? না মৃত্যুর পর মানব বর্ত্তমান থাকে ও ইহকালের কার্য্যের ফল স্বরূপে পরকালে সুখ দুঃখাদি ভোগ করে? এ বিষয়ে অগ্রে প্রচলিত মতের সমালোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে নানাপ্রকার মত প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্ট উপাসকেরা বলেন যে, মৃত্যুর পর আত্মা সকল স্থান বিশেষে স্থিত হয় ও পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট বিচার দিনে ঈশ্বর সেই সকল আত্মার পাপ পুণ্য বিচার করিয়া তাহাদিগের দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান করেন। হিন্দুরা বলেন আত্মা পরকালে ইহকালের সৎ বা অসৎকার্য্য ফলানুসারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে ও ঐ কার্য্য ফলানুসারে যথোচিত বংশে যথোচিত শক্তি লইয়া পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। তাঁহারা বলেন পৃথিবীতে যে এত জীব ভেদ ও মানবের অবস্থাগত প্রভেদ তাহার কারণই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিলে মানব মোক্ষ লাভ করে অর্থাৎ সে আত্মা ঈশ্বরে লীন হয়, তাহার আর জন্ম হয় না; আবার ইহাও বলিয়া থাকেন যে বিশেষ অবস্থায় বা পাপাচরণে আত্মার প্রেতত্ব লাভ হয়। খৃষ্ট উপাসকেরাও ভূত মানিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম মহাশয়দিগের পরকাল সম্বন্ধীয় মত ভালরূপ বুঝা যায়না, তবে তাঁহারাও আত্মার ইহকালের কার্য্যানুরূপ ফলভোগ হওয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে এ সকল কথা সম্ভব কি না। খৃষ্ট উপাসক দিগের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে ইহাও বিশ্বাস করিতে

হইবে যে হয় নিত্য ঈশ্বর লক্ষ লক্ষ আত্মার সৃষ্টি করিতেছেন অথবা অনন্ত আত্মারাশি অনন্তকাল জড়বৎ বিরাজ করিতেছে ও তাহারা যৎকিঞ্চিৎকাল এই পৃথিবীতে মানবদেহ ধারণ করিয়া আবার অনন্তকাল আকাশে জড়বৎ অবস্থিতি করে। এ কথা যে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় করায় আবশ্যক নাই। ব্রাহ্মদিগের মতও প্রায় তদনুরূপ। বিশেষ তাঁহাদের মতের মূল না থাকায় সে সম্বন্ধে অধিক বলা আবশ্যকও করে না। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই পূর্ব্বজন্মের কথা স্বীকার করেন না, অথচ স্বতন্ত্র আত্মার বিদ্যমানতা স্বীকার করেন। সুতরাং পৃথিবীতে জন্মলাভের পূর্ব্বে আত্মা জড় হইতেও নিকৃষ্টভাবে অর্থাৎ নিতান্ত চেষ্টাশূন্য হইয়া থাকে বলিতে হইবে। কেবল চেষ্টাই যে আত্মার কার্য্য, সেই আত্মার এরূপ চিরকালীন নিশ্চেষ্টত্ব নিতান্ত অসঙ্গত তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কেননা তাঁহারা পরকালের ন্যায় পূর্ব্বকাল স্বীকার করিয়া আত্মার চেষ্টাশূন্যতা দোষ পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যদি পূর্ব্ব আত্মাই পর আত্মার কারণ হয় তাহা হইলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে পরিমাণ মানব পৃথিবীতে ছিল এক্ষণে তাহার শতাধিকগুণ বৃদ্ধি কি প্রকারে হইল? এত অধিক লোকের আত্মা কোথা হইতে আইল? যদি বলেন নিকৃষ্ট জীবের আত্মা সকল উন্নত হইয়া মানবত্ব প্রাপ্ত হই-তেছে, কিন্তু নিকৃষ্ট প্রাণীরও ত বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না। তবে যদি তাঁহারা পদার্থ মাত্রেরই আত্মা স্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহা-দের এই মত বজায় রাখিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে আর আত্মাকে স্বতন্ত্র চেতন পদার্থ বলা যায় না—কেননা যখন পদার্থ মাত্রেরই আত্মা আছে তখন আত্মা তাপাদির ন্যায় জড়ের একটী গুণ বিশেষ হইল।

হিন্দুশাস্ত্র যে পদার্থ মাত্রেরই আত্মা স্বীকার করিয়াছে তাহা ঐ শাস্ত্র মন্থন করিলে পাওয়া যায়। মানব অসৎ কার্য্যফলে,

কীট, কৃমি, উদ্ভিদাদি যোনি প্রাপ্ত হয় এমত কথা হিন্দু শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ উল্লেখ আছে এবং শাপবশতঃ মানবগণ প্রস্তর ও জলাদিরূপে পরিণত হইয়াছে তাহারও ভূয়ঃ উল্লেখ আছে। আবার বৃক্ষের পল্লব ভঙ্গ করিলে যে নিষ্ঠুরতা ও হিংসাজন্য পাপ হয় তাহারও ভূরি উল্লেখ উক্ত শাস্ত্রে আছে। 'আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি যঃ পশ্যতি সপণ্ডিতঃ' বাক্যে সকল পদার্থের আত্মা ও সুখ দুঃখ বোধ থাকা আরও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আমাদের বোধ হয় হিন্দুদিগের এই মতটীই সত্য। কেননা পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে আত্মা সচেতন হইলেও জড়জাত, এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে, যে জড় পদার্থের সৃষ্টি ও নাশ নাই, অথচ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। যখন জড়ের উৎপত্তি ও নাশ নাই, তখন আমারও উৎপত্তি ও নাশ নাই। আমি পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব, তবে অবস্থান্তর হইবে মাত্র। মৃত্যু হইলে আমার দেহ হইতে যে মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হইবে, তাহা হইতে পুনরায় যে আর একটী দেহ উৎপন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাকেই আমার পরকাল বলা যাইতে পারে। যে পদার্থ হইতে আমার দেহ গঠিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে অবশ্যই কোন দেহ রূপে বর্ত্তমান ছিল; তাহাই আমার পূর্ব্বজন্ম। কিন্তু পূর্ব্বে কি ছিলাম এবং পরে কি হইব তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমার এই দেহ হইতে উদ্ভিদ্ জন্মিতে পারে, কীট বা পতঙ্গ জন্মিতে পারে, পশু বা পক্ষী জন্মিতে পারে এবং মানবও জন্মিতে পারে। যদি আমি পুনরায় মানব হই, তাহা হইলে যদিও তখন বুঝিতে পারিব না যে, পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, কিন্তু সে যে এই আমি তাহাতে সন্দেহ কি? যদি আমি ভবিষ্যতের জন্য জগতের কোন উপকার করিয়া যাই এবং সে সময়ে তাহার ফল ভোগ করিতে পারি, তাহা হইলে সে যে আমার কার্য্যের ফল ভোগ করা হইল, তাহাতে সন্দেহ কি? এই আমি যাহা হইতে উৎপন্ন, সেই আমিও যখন তাহা হইতে উৎপন্ন, এবং এই আমি যখন সুখকর

বিষয় লাভে সুখী হই ও সে আমিও যখন সেইরূপ সুখী হইব, তখন এই আমাতে ও সে আমাতে প্রভেদ কি? সে আমারই পরকাল মাত্র। পরকালে মানব ভিন্ন অন্য জীব দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে আমার আমিত্ব থাকিবে। তাহাও আমার পরকাল। যদি আমি কখনও পুনরায় মানব হই, তাহা যে কত কাল পরে হইব, তাহার নিশ্চয়তা কি? ইহার মধ্যে কতরূপ দেহ অবলম্বন করিতে হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? কিন্তু বোধ হয় মানব মরিয়া মানব হইবারই এক্ষণে অধিক সম্ভাবনা। কেননা বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে জানা যায় যে, এক্ষণে পৃথিবী ক্রমে উন্নত হইতেছে; বিশেষ ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে যত পৃথিবীর বয়স হইতেছে ততই মানবের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; ইহাতে এই অনুমান করাযায় যে জড় আত্মা উদ্ভিদ্ হইতেছে; উদ্ভিদ্ আত্মা কীট, পতঙ্গ হইতেছে; কীট পতঙ্গ আত্মা পশু, পক্ষী হইতেছে এবং পশুর আত্মা মানব হইতেছে। ঐ রূপে অসভ্য মানবের আত্মা সভ্য মানব হইতেছে। তাহা না হইলে মানবের সংখ্যা কি প্রকারে বৃদ্ধি হইবে? তবে কার্য্য ও অবস্থা ভেদ অনুসারে এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবারও সম্ভাবনা আছে। বোধ হয় আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা এই সকল বিবেচনা করিয়াই বলিয়াছেন অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া দুর্লভ মানবদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে আমি কি? আমি পূর্ব্বে ছিলাম, আমি এক্ষণে আছি এবং আমি পরে থাকিব? কিন্তু আমি কি! হস্ত আমি, না পদ আমি, রক্ত আমি, না অস্থি আমি, হৃদয় আমি, না মস্তিষ্ক আমি, না সর্ব্ব সম্মিলিত দেহ আমি? আমরা বলি যে উল্লিখিত কিছুই আমি বাচ্য নহে। যদি সর্ব্ব সম্মিলনে আমি হইতাম তাহা হইলে স্থূল আমি যদি আমি হই, তবে কৃশ আমি কখনও আমি হইতে পারি না; বালক আমি যদি আমি হই, তবে যুবা আমি, আমি হইতে পারি না। কেননা স্থূল দেহে যে সকল রক্ত মেদাদি ছিল, কৃশ হইয়া তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং বালক কালে যে সকল রক্ত মাংসাদি ছিল তাহার অধিকাংশ বিষ্ঠা, মূত্র, প্রশ্বাসাদি দ্বারা

বহির্গত হইয়া তৎস্থানে তদপেক্ষা অধিকতর রক্ত মাংসাদি ভোজন্যাদি দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়াছে। যদি ঐ সমস্তই আমি পদ বাচ্য হয় তবে এক মুহূর্ত্তও আমির অস্তিত্ব থাকে না, কেন না নিয়তই শারীরিক পদার্থের পরিবর্ত্তন হইতেছে। যে দিন গর্ভ মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি সেদিন আমি যে সূক্ষ্ম অবয়বে উদিত হই সে অবয়বের সহস্রাংশও আমি নহি; কেন না ঐ অবয়ব মধ্যে আমাতে যত শক্তি আছে সে সমুদায়েরই মূল যন্ত্র নির্ম্মিত আছে। অতএব আমি বাচ্য যন্ত্র বা আত্মা নিতান্ত সূক্ষ্ম—ঐ সূক্ষ্ম আত্মা অনায়াসে দেহান্তর লাভ করিতে পারে ও তাহা হইলেই আমার পরকাল হইল; ঐরূপ দেহান্তর হওয়াও যে অসম্ভব এমত বোধ হয় না।

যদি আত্মার জন্মান্তর হইল, তবে মানব পূর্ব্ব জন্ম কৃত কার্য্যের ফল ভোগ করে কি না? এ বিষয় আমাদের জ্ঞানের অগোচর; তবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মে আত্মা যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ লাভ করে তাহা পরজন্মে থাকিবার সম্ভাবনা। কেন না তাহা না হইলে উদ্ভিদের আত্মা কি প্রকারে পর পর উন্নতি লাভ করিয়া মানবীয় আত্মা হয়? পূর্ব্বজন্মের উৎকর্ষতা প্রাপ্ত না হইলে কি প্রকারে ঐরূপ উন্নতি হয়? বিশেষ উৎ-কর্ষতা প্রাপ্ত মানবের সন্তানের আত্মা যখন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহার নিজের আত্মার উৎকর্ষতা নষ্ট হইবে কেন? আর এক কথা এই যে অনেক সময়ে অনেক মহাপুরুষের আবির্ভাব দেখা যায় এবং অনেক সময়েই অদৃষ্টবান্ পুরুষ দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি অশেষবিধ কৌশলে নিরত চেষ্টা করিয়াও সামান্য ফল প্রাপ্ত হইতেছে। কেহ কেহ বিনা যত্নে বা সামান্য যত্নে, বুদ্ধির সাহায্য ভিন্ন, অশেষ ফল লাভ করিতেছে। কৃষ্ণপান্তি ছোলা বেচিয়া বড় লোক হইলেন এবং রামকান্ত এক জন সামান্য ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত আশ্রয় দিয়া

বিখ্যাত ধনী হইলেন। ছোলা কি আর কেহ বেচে নাই, না আর কেহ কাহাকে আশ্রয় দেয় নাই? তবে ইঁহারা কেন এরূপ সামান্য কার্য্যে এরূপ অধিক ফল লাভ করিলেন? ইহা হইতে সহস্র গুণ কার্য্য করিয়া অপরে কেন ইহার সহস্রাংশ লাভ পায় না? এইরূপ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, সামান্য লোক এইরূপ সামান্য কারণে দেশ বিখ্যাত হইয়াছেন এবং অনেক মহৎলোক সামান্য কারণে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন! কয়েক জন মাত্র সেনা সমভিব্যাহারে ক্লাইব মহাপরাক্রান্ত সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজয় করিলেন কিন্তু মহাপরাক্রান্ত চিতোররাজ প্রতাপ সিংহ অশেষ চেষ্টা করিয়াও যবন রাজ্যের কিছুই করিতে পারিলেন না। সামান্য কারণে মলহার রাও রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হইলেন, কিন্তু আলাউদ্দীন সহস্র দুষ্কর্ম্ম করিয়াও অক্ষুণ্ণ ছিলেন। এ সকলের কারণ কি? আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বজন্মে মানব যে বিষয়ে বিশেষ নিপুণতা লাভ করে পরকালে সেই নিপুণতা তাহার স্বাভাবিকের ন্যায় হইয়া যায়, তাহার মর্ম্ম সে নিজে বা অপরে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মোহন্ত ছোলা বেচিল, কৃষ্ণপান্তি কিনিল, মোহন্ত ভাবিল ক্রমে ছোলায় আরও ক্ষতি হইবে, কৃষ্ণপান্তি পূর্ব্বজন্ম কৃত ব্যবসা-নিপুণ বুদ্ধির বলে ভাবিলেন এক্ষণে ছোলার মূল্য বাড়িবে। ইহাতেই মোহন্ত ছোলা বেচিল ও কৃষ্ণপান্তি ছোলা কিনিল। বোধহয় ঐরূপ বুদ্ধিবলে রামকান্ত গবর্ণর জেনারলকে আশ্রয় দিয়াছিল, এবং ক্লাইব সাহেব সামান্য সৈন্য লইয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আর্য্য পণ্ডিতেরা ইহাকেই অদৃষ্ট বলেন। কিন্তু আমরা আর এক প্রকার অদৃষ্ট দেখিয়া থাকি, তাহাকে সময় বা পড়তা বলা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, যে কাহারও ভাল হইতে আরম্ভ হইলে সে সময়ে তাহার সকল দিকেই ভাল হয়, আবার সময় বিশেষে যখন মন্দ হইতে থাকে তখন ক্রমাগতই মন্দ হয়। কিন্তু কি কারণে সেই ভাল ও মন্দের পড়তা হয় তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। যাঁহারা অভিনিবেশ

সহকারে তাস খেলিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, পড়তা কি। যে দিন যে দিকে তাসের পড়তা হয়, সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা ভাঙ্গা যায় না। পড়তার দিকের খেলওয়ার নিতান্ত অজ্ঞ হইলেও জয়ী হইবে, বিশেষ ক্রীড়ানিপুণ হইলেও পড়তা না হইলে হারিতে হইবে। দেখা গিয়াছে এক দিকে তাসের পড়তা সময়ে সময়ে চারি, পাঁচ বা ততোধিক দিন থাকে। কখন কখন এক দিনেই পড়তা ২। ৩ বার ভাঙ্গিয়া যায়। কোন কোন দিন কোনও পক্ষেই পড়তা হয় না। ইহার কারণ কি? এই পড়তা বিনা চেষ্টায় ভাঙ্গে। আবার চেষ্টা করিলে হয় না, চেষ্টা করিলেও ভাঙ্গে না। ৩২ খানি কাগজে ক্রমাগত খেলা করিয়া যখন তাহার পড়তার মর্ম্ম কিছুই বুঝা গেল না, তখন এই প্রকাণ্ড বিশ্ব ব্যাপারের পড়তার কারণ কি রূপে বুঝা যাইবে? ফলতঃ তাসের ন্যায় আমাদের কার্য্যেরও পড়তা আছে। সেই পড়তার নামও অদৃষ্ট? এই পড়তা যে সময় হয়, তাহাকে সুসময় বলে ও যে সময় তাহা হয় না তাহাকে কুসময় বলে; ফলিত জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা তাহার কারণ স্বরূপে সুগ্রহ বা কুগ্রহের কার্য্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মত যে নিতান্ত অলীক তাহাও নিশ্চয় বলা যায় না। যে কার্য্যের কারণ দৃষ্ট হয় না অর্থাৎ বুঝা যায় না সেই কারণকেই অদৃষ্ট বলে, সুতরাং যেখানে মানব কারণ বুঝিতে অক্ষম হয়, সেইখানেই অদৃষ্ট বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

যাহা হউক পূর্ব্ব ও পরকাল সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি, যে, সকল পদার্থেরই পূর্ব্ব ও পরকাল আছে, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত আত্মার উন্নতি ও অবনতির ফল পর জন্মে প্রাপ্ত হইতে পারে। তদ্ভিন্ন অন্য রূপ পরকাল অর্থাৎ স্বর্গ নরকাদি ভোগ আমাদের জ্ঞানের অগোচর। ঈশ্বর ও জ্ঞান প্রকরণ আলোচনা করিলে এ বিষয় আরও বিশদ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর কি? অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ কি ও তাঁহার কার্য্য কি? তাঁহাকে জানিবার আমাদের সাধ্য আছে কি না? যদি থাকে তবে কি উপায়ে তাঁহাকে জানা যায়? মানবগণ যে নিয়ত ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন তবে তাহার মর্ম্ম কি, অনুসন্ধান করা আবশ্যক। কিন্তু তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা ঈশ্বরের নানা প্রকার ভাব দেখিতে পাই। আমরা যতই অনুসন্ধান করি ততই দেখিতে পাই,—ঈশ্বর সম্বন্ধে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন মত। অথচ সকলেই বলেন তিনি মানবের জ্ঞানাতীত, মনুষ্য তাঁহাকে জ্ঞানযোগে পায় না। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের জন্য গ্রন্থ বিশেষ প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন, সেই গ্রন্থে তিনি তাঁহার স্বরূপ ও মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাতেই মানব তাঁহার স্বরূপ ও কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছে, নচেৎ পারিত না। তাঁহাদের মত এই যে, যিনি ঐ গ্রন্থ-লিখিত ব্যবস্থার বিপরীতাচারী হইবেন, তিনি ঈশ্বরের ক্রোধ ভাজন ও অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থ একখানি নহে, অসংখ্য ঈশ্বর প্রণীত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়! যদি ঐ সকল গ্রন্থের মত সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য থাকিত তাহা হইলেও কোনরূপে তদনুসারে প্রকৃত পথের অনুসরণ করা যাইত। কিন্তু উহাদের সামঞ্জস্য থাকা দূরে থাকুক, উহারা পরস্পর এত ভিন্ন যে, উহার এক খানিকে প্রকৃত বলিলে অপর সমস্তকেই কাল্পনিক বলিতে হয়। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় আপ-

নাদের গ্রন্থখানিকে প্রকৃত ঈশ্বর প্রণীত বলেন ও অপরগুলিকে নাস্তিকতা বা ভ্রম প্রমাদপূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। ঐ বিশ্বাসানুসারে কেহ ঈশ্বরকে সাকার, কেহ নিরাকার, কেহ পুরুষ, কেহ প্রকৃতি, কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ, কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ ভক্তবৎসল, কেহ দীনবন্ধু, কেহ ত্রাণকর্ত্তা, কেহ ভূভারহারী ইত্যাদি নানা প্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কেহ কহেন অহিংসাই পরমধর্ম্ম, কেহ বলেন মনুষ্য ও পশুর শোণিত ঈশ্বরের নিতান্ত প্রিয়। কেহ বলেন আতপতণ্ডুল, কদলী, পুষ্প প্রভৃতি তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ; কাহারও মতে অনন্যমনে ধ্যান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট। কেহ বলেন নিকৃষ্ট জাতির অন্নগ্রহণ মহাপাপ, কেহ বলেন জাতি বিচার তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতিকে বিধর্ম্মী বলেন। তাঁহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত তাঁহারা দেশে দেশে ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া থাকেন। যবনেরা আবার সকলকেই বিধর্ম্মী বলেন। যে পর্য্যন্ত বিধর্ম্মীগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করে, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহাদিগের ধন, মান, প্রাণ, বিপুলকীর্ত্তি সকলই নষ্ট করেন। হিন্দুরা যদিও এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতে পৈত্রিক ধর্ম্মে থাকিলে সকলেরই মুক্তি আছে, কিন্তু তাঁহারা অন্য ধর্ম্মাক্রান্তদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া এতদূর ঘৃণা করেন যে, তাহাদিগের স্পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। এইরূপে দেখা যায়, পৃথিবীতে সহস্র সহস্র সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নিরূপণ ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্দ্দেশ করেন। কোন সম্প্রদায়েরই পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। পরস্পর সকলেই সকলকে পাপী বলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই মতে বিধর্ম্মীরা চিরকাল নরক ভোগ করিবে। যখন প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রেরই ব্যবস্থা এই যে, তদনুসারে না চলিলে অনন্তকাল কষ্টভোগ করিতে হইবে, অথচ কোনও শাস্ত্রের সহিত কোনও শাস্ত্রের মিল নাই, তখন উহার কোন্‌খানি প্রকৃত ঈশ্বর প্রণীত তাহা স্থির না করিলে চলিবে কেন?

অতএব আমরা কোন্ মত অবলম্বন করিব? কাহাকে প্রকৃত ঈশ্বর বলিব? যিশু খৃষ্টকে? মহম্মদকে? বিষ্ণুকে? না দুর্গাকে? কোন্ ধর্ম্মের মত তাঁহার প্রকৃত আজ্ঞা? কোন পথে চলিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে না? স্বর্গভোগ সুখের বাঞ্ছা না করিলেও চলে, কিন্তু নরকভোগের আশঙ্কা না করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং আমাদের ঈশ্বর নিরূপণ করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। বিশেষ যাঁহার উপাসনা করাই আমাদিগের মুখ্যকার্য্য, যিনি রুষ্ট হইলেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ, যাঁহার করুণাবলে আমরা আহার বিহার করিতেছি, তাঁহাকে জানা নিতান্ত আবশ্যক। বাস্তবিক এই কারণে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তর্কের অবতারণা ও দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। দর্শনশাস্ত্র প্রণেতাগণ ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ ও কার্য্য নিরূপণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু কিছু-তেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। চার্ব্বাক্, সাংখ্য প্রভৃতি [illegible] প্রণেতাগণ স্পষ্টই ঈশ্বরের সত্ত্বা অস্বীকার করিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক অনেক কূট তর্কের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন বলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সেই সকল প্রমাণকে যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনা করিলেও তাঁহারা ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাস্তিত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কেননা তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। সকল গুণগুলিই অভাব-বাচক হইল। ঈশ্বরের আকার নাই, গুণ নাই, অবস্থান্তর নাই, কার্য্য নাই, তবে তাঁহার আছে কি? ঈশ্বর আছেন, অথচ অস্তিত্বব্যঞ্জক কিছুই তাঁহার নাই; সুতরাং ঈশ্বর নাই অথবা ঈশ্বরকে মানব জ্ঞানের বহির্ভূত ও মানবের সহিত সম্বন্ধ-শূন্য বলা হইল। এই জন্য দর্শনশাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের সত্ত্বা প্রমাণ না হইয়া বরং বিপরীতই প্রমাণ হইয়াছে, অধিকন্তু ঐ দর্শনশাস্ত্র সকল পাঠ করিয়া লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি হতশ্রদ্ধ হইল, এবং ঐ দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় হইতে কিছু কিছু লইয়া নূতন প্রকার

ধর্ম্মশাস্ত্র সকল প্রণয়ন করিতে লাগিল। ঐরূপে প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র গুলি একবারে খিচুড়ি হইয়া উঠিল। ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণ ও বিশ্বাস উভয় সন্নিষ্ট হওয়ায়, উহার কিছুই সাব্যস্ত হয় নাই। আমরা উহার উদাহরণ স্বরূপে নব ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উল্লেখ করিতেছি। ব্রাহ্মগণ দার্শনিক যুক্তি ও ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস উভয়ই গ্রহণ করিয়াছেন; দর্শনমতে তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার নির্ব্বিকার ইত্যাদি বলেন, আবার ধর্ম্ম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস মতে বলেন, মানবগণ ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ ঈশ্বর উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যাদি না করিলে, ঈশ্বর পরকালে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান করেন। তাঁহারা বিশ্বাসানুসারে ঈশ্বরের সত্বা নিরূপণ করেন এবং যুক্তি অনুসারে কর্ত্তব্য কার্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞার বিচার করেন। তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে সহস্র উত্তম যুক্তি প্রদান করিলেও তাঁহারা তাহা গ্রাহ্য করেন না বরং ঐ যুক্তি দাতাদিগকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে তাঁহাদিগের এই অভিনব মত ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম ও তাঁহাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে মানবগণের নিস্তার নাই। তাঁহাদের ঐ সকল কথার অর্থ ও পরস্পর সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা একবার বিবেচনা করেন না। অতএব যে দর্শন ও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রকৃত ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া ধর্ম্ম সকলের একতা সম্পাদন চেষ্টা করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন না হইয়া বরং নাস্তিকতারই সহায়তা হইয়াছে। যে হউক, পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম শাস্ত্র আছে, তৎ সমস্তই যে মানবের মনঃ কল্পিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না, মানবের যাহা জ্ঞানাতীত, মানব কখনও তাহা কল্পনা করিতে পারে না। দেখ, স্বর্গ বর্ননকালে মানবগণ স্বর্ণ অট্টালিকা, হীরক স্তম্ভ, অমৃতময়ী নদী, চির বসন্ত, শোকদুঃখহীন জীব ইত্যাদি যাহা কিছু উৎকৃষ্ট অথচ জ্ঞানায়ত্ত তাহারই কল্পনা করিয়াছেন, জ্ঞানাতীত কোন বিষয়েরই উল্লেখ নাই। ঈশ্বরের কল্পনাও সেইরূপ। তাঁহারা বিশ্ব মধ্যে মানবকেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে সেই মানবীয়

গুণসম্পন্ন করিয়াছেন। তবে সেইগুলি কিছু বেসি করিয়া বলিয়াছেন অথবা ঐ গুণ সকলের অভাব-কল্পনা করিয়াছেন। সাকারবাদীরা মানবের ন্যায় ঈশ্বরে পুত্র কলত্র, ভোগৈশ্বর্য্য, বিপদ সম্পদ, শত্রু মিত্র, আহার বিহার, রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমুদায়ই কল্পনা করিয়াছেন। যে নিরাকারবাদীরা সাকারবাদীদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারাও যে পৌত্তলিক, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। তাঁহারা মানবীয় শারীরধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপ করেন নাই বটে, কিন্তু মানসিক গুণ সকল অবিকল তাঁহাতে প্রদান করিয়াছেন। মানবের ন্যায় তাঁহার ইচ্ছা, প্রিয়াপ্রিয়কার্য্য, কৃতজ্ঞতাভিলাষ, তোষামোদপ্রিয়তা, দণ্ডপুরস্কারদানশীলতা, জ্ঞান প্রভৃতি সমুদায় মানবীয় মানসিক ধর্ম্ম তাঁহাতে কল্পিত করিয়াছেন। এ সকল তাঁহাতে থাকা সম্ভব কিনা, তাহা কেহ বিবেচনা করেন নাই। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, এ সকল গুণ ঈশ্বরে থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আমরা একটী একটী করিয়া ঐ সকলের আলোচনা করিতেছি।

মানবের অন্তরে কোন উদ্দেশ্য আছে, এজন্য তাহা পূরণের ইচ্ছা আছে। উদ্দেশ্য বিনা কখনও ইচ্ছা হইতে পারে না। ঈশ্বরের কি উদ্দেশ্য আছে যে তাঁহার তাহা সফল করিবার ইচ্ছা থাকিবে? যখন সমুদায়ই তাঁহার, যখন তাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তখন তাঁহার উদ্দেশ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। মানব সুখাভিলাষী ও স্বার্থপর। ঈশ্বরকে সুখাভিলাষী না বলিলে এবং সেই সুখ প্রাপ্তি তাঁহার ক্ষমতাধীন নয় না বলিলে তাঁহার ইচ্ছা আছে বলা যায় না। কেন না, কোনও কার্য্যসাধনের পূর্ব্ব ভাবই ইচ্ছা অথবা ইচ্ছা হইলেই কার্য্যের চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহা বলিতে গেলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কোথায় থাকিবে? তিনি কিসের কাঙ্গাল? কোন্ কার্য্যে তাঁহার প্রার্থনা এবং কে তাঁহার প্রার্থনা পূরিত হইতে দিতেছে না? বিশেষ ইচ্ছা প্রভৃতি সমস্তই সাকার ধর্ম্ম, ঐ সকল ধর্ম্ম ঈশ্বরের আছে বলিলে, তাঁহাকে সাকার বলিতে হয়, নচেৎ 'মাথা নাই তার মাথা ব্যথা' বাক্যের ন্যায় অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মানবের যাহা স্বার্থের অনুকূল তাহাই তাহার প্রিয়, এবং যাহা তাহার স্বার্থের বিপরীত তাহাই তাহার অপ্রিয়। ঈশ্বরের যখন স্বার্থ নাই তখন তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় কি? যদি তাঁহার প্রিয়াপ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি কেবল প্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করিতেন, অপ্রিয় কখনই সৃষ্টি করিতেন না। দুধকলা দিয়া কখনও সাপ পুষিতেন না। যদিও করিতেন তাহা হইলে কোন্ পদার্থ বা কার্য্য তাঁহার প্রিয় তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতেন। যখন তাঁহার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানই আমাদিগের কর্ত্তব্য তখন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া তাঁহার নিতান্ত উচিত; কিন্তু তিনি তাহা আমাদিগকে বলিয়া দেন নাই। যদি বলিয়া দিতেন তাহা হইলে তুমি যাহাকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বল, আমি তাহাকে তাঁহার নিতান্ত অপ্রিয় বলিতাম না। কেহ বলেন জীবহিংসা ঈশ্বরের অপ্রিয় কেননা সকল পদার্থই তাঁহার সৃষ্ট, সুতরাং তৎসমুদাবেরই রক্ষা করা তাঁহার ইচ্ছা। কেহ বলেন জীবহিংসা তাঁহার অভিপ্রেত, নতুবা ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু ছাগাদিকে বিনাশ করিত না। এইরূপে দেখা যায় ঈশ্বরের প্রিয়াপ্রিয় সম্বন্ধে জগতে সহস্র সহস্র বিপরীত মত প্রচলিত আছে। অপ্রিয় যখন কষ্টকর তখন তিনি নিয়ত অপ্রিয় পদার্থ দ্বারা কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন?

মনুষ্য মধ্যে যাহারা সমাজের বিঘ্নকারী তাহারা দুষ্ট এবং যাহারা হিতকারী তাহারা শিষ্ট। দুষ্টের দ্বারা আমাদের অনিষ্ট হয়, এই জন্য আমরা তাহাদের দমন করি এবং শিষ্টের দ্বারা আমাদের উপকার হয়, এজন্য তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পুরস্কার দেই, কিন্তু ঈশ্বর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন কেন? আমাদের দ্বারা তাঁহার কোনও হিতাহিত হইতে পারে না। যদি বিশ্বের হিতোদ্দেশে দণ্ডাদি প্রদান করেন, তাহাও অসম্ভব। কেননা শিষ্ট দুষ্ট সকলই তাঁহার সৃষ্ট। দুষ্ট যদি তাঁহার অভিপ্রেত না হইত, তাহা হইলে কখনও তিনি দুষ্টের সৃষ্টি করিতেন না। যখন তিনিই দুষ্টের সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন তাহার দণ্ড দেওয়া তাঁহার

নির্ভ্রান্ত অসম্ভব। অনেকে বলেন ঈশ্বর দুষ্টের সৃষ্টি করেন নাই, মানবগণ আপনারাই তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া দুষ্ট হয়, কিন্তু একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ তাহা হইলে মানবকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষ শত্রু শয়তান বলিতে হয় এবং ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়। তাঁহার ইচ্ছা, মানবগণ ভাল হউক, কিন্তু মানব তাহা হইতে দিল না; ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব কোথায় রহিল? মানব ঈশ্বরকে পরাস্ত করিল। ঈশ্বর মৃত্যু অন্তে তাহাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু জীবিত মনুষ্যের নিকট ঈশ্বরকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, মানব সেই ঈশ্বর-বিজয়িনী শক্তি কোথায় পাইল? মানব যখন ঈশ্বরের সৃষ্ট, তখন সেই ঈশ্বরাজ্ঞা ভঙ্গকারিণী শক্তি কি সেই ঈশ্বর হইতে পায় নাই? মানবের নিজস্ব কি কিছু আছে? বুদ্ধি, বিবেক, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মানসিক শক্তি সকল কি মানব নিজে আনিয়াছে? যদি না হয়, যদি সমুদায় ঈশ্বর দত্ত হয়, তবে ঈশ্বর দত্ত শক্তিঅনুসারে কৃতকার্য্যের জন্য মানব দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইবে কেন? মানব যে প্রবৃত্তি অনুসারে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহা যখন ঈশ্বর দত্ত তখন সে দণ্ডিত হইবে কেন? কেহ কেহ বলেন যে, ঈশ্বর মানবকে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেন নাই, তিনি মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছেন মাত্র, মনুষ্য সেই স্বাধীনতার অপব্যবহারে যে দুষ্কর্ম্ম করে তাহার জন্য মনুষ্যই দোষী, কেন না সে চেষ্টা করিলে ভাল কর্ম্ম করিতে পারিত। আমরা জিজ্ঞাসা করি ঈশ্বর যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহার অর্থ কি? ইচ্ছামত কার্য্য করার শক্তিকে অবশ্য স্বাধীনতা বলে। তাহা হইলে অবশ্য এই বুঝিতে হইবে যে ঈশ্বর আমাদিগকে বলিয়াছেন যে তোমরা ভাল মন্দ যাহা ইচ্ছা করিতে পার, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। যদি এরূপ বলিয়া থাকেন তবে ভাল কার্য্যের পুরস্কার ও মন্দ কার্য্যের দণ্ড তিনি দিবেন কেন? তাহা দিলে আর স্বাধীনতা দেওয়া হইল কৈ? আমি যদি তোমাকে বলি, তুমি আমার কথা শুন বা না শুন তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই; এ বিষয়ে

আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিতেছি ; কিন্তু যদি আমার কথা শুন তাহা হইলে তোমাকে ভাল বাসিব নচেৎ তোমাকে বিশেষ রূপ প্রহার করিব। তুমি আমার কথা শুনিলে না, আমি চমৎকার এক লগুড় প্রহার করিলাম। দেখ আমি তোমাকে কেমন স্বাধীনতা দিলাম! ঈশ্বর কি আমাদিগকে ঐরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন? যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যে তিনি অসৎ কার্য্যের দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন, অথচ আমরা অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি এরূপ দৃঢ় উপায় ব্যবস্থা করেন নাই। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দিলে, দণ্ড দেওয়াই যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রায় তাহাই বোধ হয়। মানবের প্রতি তাঁহার এত কোপের কারণ কি? বিশেষ তিনি যে দণ্ড দেন, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না কেন? মানবগণ যে দণ্ড পুরস্কার প্রদান করে, তাহার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষাই দণ্ড পুরস্কারের উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত দণ্ড প্রাপ্ত হইলে সে বুঝিতে পারে যে, এই কর্ম্ম করিয়াছিলাম তজ্জন্য দণ্ড পাইলাম, পুনরায় এরূপ কর্ম্ম করিব না। সৎকর্ম্মে পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে ঐরূপ তাহার সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। অপর ব্যক্তিগণও তাহার দৃষ্টান্তে সৎকর্ম্ম করিতে ও দুষ্কর্ম্ম না করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে যে দণ্ড বা পুরস্কার দেন তাহা কোন্ দুষ্কর্ম্ম বা সৎকর্ম্মের জন্য তাহা কিছুই জানা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রে দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্মের লক্ষণ ও তাহার দণ্ড পুরস্কারের কথা লিখিত আছে সত্য, কিন্তু তাহা পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। এক ধর্ম্মানুসারে যাহা সৎকর্ম্ম, অপর ধর্ম্মানুসারে তাহা নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম। তাহার কোন্‌টী সত্য জানিবার উপায় নাই। কোন কুকর্ম্মেরই আমরা প্রত্যক্ষ ফল উপলব্ধি করিতে পারি না। আহার না করিলে জীবন ধারণ হয় না, এ কথা যেরূপ কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না, ক্ষুধা আপনিই আহারে প্রবৃত্তি জন্মায়; সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য সেরূপ কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই। কেহ কেহ ঐরূপ বৃত্তির সত্ত্বা স্বীকার করেন।

তাঁহারা বলেন সেই মনোবৃত্তির শক্তি দ্বারা আমাদের মনে কুকর্ম্ম করিলে গ্লানি ও সৎকার্য্য করিলে প্রসন্নতা জন্মে। আমরা বলি, সেটী কেবল আমাদিগের অভ্যাস ও সংস্কারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। সামান্য মক্ষিকা নাশে ধার্ম্মিক ব্যক্তির মনে গ্লানি জন্মে, কিন্তু সহস্র মনুষ্য বিনাশে দস্যু বা রাজার কষ্ট হয় না। কোনও হিন্দু ঔষধের নিমিত্তও কিঞ্চিৎ সুরা পান করিলে আপনাকে ধিক্কার দেন, কিন্তু ইংরেজ প্রভৃতি জাতি অহরহঃ মদ্য পান করিয়া আনন্দানুভব করিতেছেন। এইরূপ, যাহার যে রূপ সংস্কার ও শিক্ষা, তদনুরূপ কার্য্য নিমিত্ত মনের গ্লানি বা প্রসন্নতা জন্মে, তাহা সকলের সমান নহে, সুতরাং ক্ষুধার ন্যায় প্রাকৃতিক বৃত্তি নহে। কেহ কেহ বলেন, কুভোজনের ফল রোগ, শ্রমের ফল লাভ, দানের ফল যশঃ ইত্যাদি প্রত্যেক কার্য্যের ফল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়। আমরা বলি তাহা নহে। কতকগুলি কার্য্যের কিছু কিছু ফল জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাকে ঐশ্বরিক না বলিয়া সামাজিক ও ভৌতিক নিয়মের ফল বলাই সঙ্গত। সে সকল অসভ্য বন্য জাতিরা নিতান্ত অল্প জানে; সভ্যেরা নানা প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া কিছু কিছু জানিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প এবং তাহারও নিয়ত ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেননা দেখা যাইতেছে, কত লোক চিরকাল কুভোজন করিয়া দীর্ঘজীবী হইতেছে, আবার কত লোক অতি সুনিয়মে আহারাদি করিয়াও রুগ্ন হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে। কেহ বিনা পরিশ্রমে অতুলৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে, কেহ বা দিবারাত্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছেনা। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে কোন কার্য্যেরই একরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। আবার অনেকে স্ত্রী-পুত্র বিয়োগ জনিত মহান্ ক্লেশানুভব করে, কিন্তু কোন্ কার্য্যের ফলে অর্থাৎ নিজকৃত কোন দুষ্ক্রিয়ার জন্য তাহারা সেই ক্লেশ পায়, অনুসন্ধান করিলে তাহার কিছুই জানিতে পারা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কোন্

কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ এবং কোন্ কর্ম্ম জন্য কোন্ দণ্ড বা পুরস্কার পাই, তাহা জানিতে পারি এমত কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় ঈশ্বরের আমাদিগকে দণ্ড বা পুরস্কার দেওয়ার কোন সম্ভাবনাই দেখা যায় না।

ঈশ্বর উপাসনাপ্রিয় অর্থাৎ যিনি তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করেন, তাঁহার প্রতি তুষ্ট হয়েন এবং যিনি তাহা না করেন, তাঁহার প্রতি রুষ্ট হয়েন। মনুষ্য ছোট বড় আছে এবং তাহার আত্মাভিমান আছে. এই জন্য যে তাহার প্রশংসা করে সে তাহার প্রতি তুষ্ট হয়। তাহার বড় হইবার ইচ্ছা নিতান্ত প্রবল, এজন্য সে যাহার মুখে শ্রবণ করে যে, তাহার সেই ইচ্ছা সফল হইয়াছে অর্থাৎ অনেক মনুষ্য অপেক্ষা সে অধিক গুণবান্ হইয়াছে, তাহার প্রতি সে তুষ্ট হয়, কিন্তু যে তাহার সে গুণবাদ না করে, তাহার প্রতি রুষ্ট হয় না, যে নিন্দা করে তাহারই প্রতি রুষ্ট হয়, কিন্তু ঈশ্বর প্রশংসা না করিলে রুষ্ট হয়েন। মনুষ্য হইতেও তাঁহার নিজগুণানুবাদ শ্রবণ লালসা অধিক ইহা কি রূপে বিশ্বাস করা যায়! তিনি কাহার উপর প্রভুত্বের অভিলাষ করেন? তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে আছে? কি জন্য তাঁহার এত আত্মাভিমান? তিনি কি এত ক্ষুদ্রচেতা যে, প্রশংসা শুনিয়া গলিয়া যান? যে মনুষ্য আপন কর্ণে আপনার প্রশংসা শুনিতে ভাল বাসে, লোকে তাহাকে নিতান্ত ক্ষুদ্রচিত্ত ও অহঙ্কারী বলিয়া ঘৃণা করে। ঈশ্বর কি তাহা হইতেও ক্ষুদ্রচেতা ও আত্মাভিমানী? তিনি কি আত্মপ্রশংসা শুনিবার নিমিত্ত আমাদিগকে জগতে আনিয়াছেন? যদি তাহা সত্য হয়, তবে এই বিশ্বকেবল মানবে পরিপূর্ণ করিলেই পারিতেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি যাহারা তাঁহার উপাসনা করে না, তাহাদের সৃষ্টি কেন করিয়াছেন? মনুষ্যদিগকে আহারাদি চিন্তার দায় হইতে মুক্ত করিয়া কেবল তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত করিলেই পারিতেন।

আর একটী আশ্চর্য্য কথা এই যে, মনুষ্যকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। অর্থাৎ হে ঈশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, আহারাদির প্রদান করিয়া আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছ, তোমার কৃপায় আমরা অশেষবিধ সুখজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইত্যাদি বলিয়া তাঁহার কৃত উপকার স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে তিনি নিতান্ত রুষ্ট হইবেন; তাহার কারণ কি? মনুষ্য পরের উপকার করিলে তাহার নিকট অপরকে কৃতজ্ঞ হইতে হয়, কারণ মনুষ্য স্বার্থপর। নিজের সুখই তাহার উদ্দেশ্য, পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করা তাহার অনুগ্রহ, না করিলে কেহ তাহাকে দোষী বলিতে পারেন না। সুতরাং যে মনুষ্য পরের উপকার করে সে নিতান্ত অনুগ্রহ করে; তন্নিমিত্ত উপকৃত ব্যক্তির তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়ার আবশ্যক কি? জন্ম দিয়া তিনি আমাদিগের কি উপকার করিয়াছেন? জন্ম না দিতেন, আমরা জন্মিতাম না। যখন আমাদিগের সত্ত্বা মাত্রই হইত না, তখন উপকার কি অপকার কিছুই হইত না। আমাদিগের জীবন রক্ষা বা সুখ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার কারণ নাই। কেননা আমরাও তাঁহার এবং আহার না করিলে যে আমরা মরিয়া যাই সে নিয়মও তাঁহারা। আহার দেন, তাঁহার আমরা বাঁচিব, না দেন তাঁহার আমরা মরিব। তাহাতে তাঁহারই ক্ষতি, আমাদের কি? তাহাতে তাঁহারই কৃতকার্য্যের ধ্বংস হইবে। যদি আমরা তাঁহার সৃষ্ট না হইতাম, নিজে বা অপর কোন শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতাম, আর তিনি আহারাদি প্রদান করিয়া আমাদিগকে বাচাইতেন ও সুখী করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইত। বোধ হয়, এই কথাটী রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা ত্রিমূর্ত্তির কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও শিব সংহার করেন। এমতে

বন্ধুর নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত উচিত; কেন না, তিনি খাইতে না দিলে ব্রহ্মার সৃষ্ট আমরা বাঁচিতাম না। যাহাই হউক, যদি ঈশ্বর আমাদিগকে সুখী করিতেন, তাহা হইলেও একদিন আমাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতার আশা করিতে পারিতেন। কিন্তু জগতে কেহই সুখী নহে। কেহ অন্নের নিমিত্ত দিবারাত্রি লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে, কেহ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির, কেহ পরমসুন্দরী স্ত্রী বা স্নেহাস্পদ পুত্রশোকে কাতর, কেহ শত্রু কর্ত্তৃক অপমানিত, কেহ গৃহাভাবে আশ্রয়বিহীন, ইত্যাদি নানাপ্রকারে মানবগণ দিবানিশি যাতনা পাইতেছে। কুলিরা আটটী পয়সার জন্য সমস্ত দিন সূর্য্যোত্তাপে মাটী কাটিতেছে, তাহাও সকল দিন জুটিতেছে না, তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবে? না, কৃষকেরা সম্বৎসর রৌদ্রবাতাদি সহ্য করিয়া প্রাণান্তকর পরিশ্রম পূর্ব্বক শস্য বপনাদি করিয়া পরিশেষে অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবন্ধন কিছুই পাইতেছে না বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে? পেটের দায়ে ধাঙ্গড়েরা দুর্গন্ধময় ন্যক্কারজনক কুৎসিত স্থান সকল পরিষ্কার করিতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, না মেথরেরা বিষ্ঠা বহন করিয়া, জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে? উড়িষ্যাবাসীরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া প্রাণান্তকর কষ্ট পাইতেছে বলিয়া কৃতজ্ঞ হইবে, না প্রচণ্ড বাত্যাপীড়িত হইয়া গৃহদ্বার শূন্য হইয়াছে বলিয়া ডায়মণ্ড হারবার বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মহামারিতে জনশূন্য হইয়াছে বলিয়া গৌড়বাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে, না আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ভস্মীভূত হইয়াছে বলিয়া নেপলসবাসীরা কৃতজ্ঞ হইবে? মুসলমান ও ইংরাজদিগের পদলেহন করিতেছে বলিয়া আধুনিক আর্য্যেরা কৃতজ্ঞ হইবে, না ঔপনিবেসিক ইয়ুরোপীয়দিগের দ্বারা উৎসাদিত হইয়াছে বলিয়া আদিম আমেরিকাবাসিরা কৃতজ্ঞ হইবে? চক্ষু নাই বলিয়া অন্ধ ও কর্ণ নাই বলিয়া বধির কৃতজ্ঞ হইবে, না বাক্‌শক্তি নাই বলিয়া মূক ও গমনোপযোগী পদ নাই বলিয়া খঞ্জ কৃতজ্ঞ হইবে? যাঁহারা পৃথিবীতে মহাসৌভাগ্যশালী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও

রোগ শোক প্রভৃতির কষ্ট হইতে মুক্ত নহেন। এমন মনুষ্যই জগতে নাই যাহার কিছু না কিছু কষ্ট নাই। যখন ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অনর্থক আমাদিগকে এইরূপ কষ্ট দিতেছেন, তখন কিসের জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব? যখন না খাটিলে আমরা খাইতে পাইনা, তখন তিনি কিরূপে আমাদিগকে আহার দিতেছেন? দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিতেই যখন মানুষের সমুদায় সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, সুখের চেষ্টা করিতে অতি অল্প অবসর থাকে, তখন তিনি কি সুখ দিতেছেন, যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হইবে! হিন্দুরা এই দোষ পরিহারের জন্য কহেন, মানবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কার্য্য ফলে এ সকল কষ্টভোগ করে। কিন্তু মানবের সমুদয় শক্তিই যখন ঈশ্বর দত্ত তখন ইহজন্মই কি আর পূর্ব্বজন্মই কি? যখন সে দুষ্কর্ম্ম করিবে তখনই সে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে করিবে। যত পূর্ব্বে যাও, প্রথম জন্মে সে দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? সেবারকার দুষ্কর্ম্মের জন্য দায়ী কে?

ঈশ্বর মহাজ্ঞানী। জ্ঞান কাহাকে বলে? দেখিয়া শুনিয়াই জ্ঞান। বিশ্ব সম্বন্ধে যে যত অধিক জানিয়াছে, সে তত অধিক জ্ঞানী। শিশুরা বিশ্বের কিছুই জানেনা, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। যত বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, তত অধিক দেখিতে শুনিতে পায়, ততই জ্ঞানী হইতে থাকে। মানবগণ নিতান্ত অল্পায়ু। তাহাদের চাক্ষুস জ্ঞান নিতান্ত অল্প। এজন্য পূর্ব্বে মনুষ্যেরা দেখিয়া শুনিয়া যে সকল জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল লিপিবদ্ধবিষয় শিক্ষা করিয়া অধিক জ্ঞানী হয়। অপরের জানিত বিষয় জানার নামই বিদ্যা শিক্ষা; ফল বিশ্বের পদার্থ সকলের শক্তি ও কার্য্য জ্ঞাত হওয়া ভিন্ন শিক্ষা ও জ্ঞান আর কিছুই নহে। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান কি? সকলই তাঁহার কৃত। নিজ কৃত বিষয়ের জ্ঞানের আবশ্যকতা কি? যখন তাঁহার নিজকৃত ভিন্ন আর কিছুই নাই তখন তৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানও হইতে পারে না।

ঈশ্বর মঙ্গলময়। দেখা যাইতেছে সর্ব্বত্রেই সমূহ অমঙ্গল বিদ্যমান

রহিয়াছে। ব্যাঘ্র মৃগ বধ করিতেছে, সর্প ভেক নাশ করিতেছে, কুম্ভীর মৎস্য আহার করিতেছে। অধিক কি, জীবপ্রধান মানবেরাই আপনারা পরস্পর নষ্ট হইতেছে। সর্ব্বদাই দ্বেষ, হিংসা, জিগীষা, জিঘাংসা প্রভৃতির পরতন্ত্র হইয়া মানবগণ পরস্পর কাহারও ধনাপহরণ করিতেছে, কাহারও দারগ্রহণ করিতেছে, কাহারও প্রাণবধ করিতেছে, কাহারও গৃহদগ্ধ করিতেছে, বলোন্মত্ত হইয়া এক দেশবাসীরা অন্য দেশবাসীদিগকে অধীনে আনিবার নিমিত্ত কত নরহত্যা, কত ধননাশ ও কত মহান্ কীর্ত্তি সকল নিপাতিত করিতেছে। ইতিহাস পাঠে ইহার অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। চাক্ষুস প্রত্যক্ষ দ্বারাও অহোরহ অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। এই কি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য?

ঈশ্বরের কৌশল সকল অতি চমৎকার। সুকৌশল কাহাকে বলে? যে কৌশল অবলম্বন করিলে সকল দিকেই ভাল হয়, কোন প্রকারেই মন্দ হয় না, তাহাকেই সুকৌশল বলিতে হয়। ঈশ্বরের কোন কৌশল বা কোন নিয়ম দোষ শূন্য? তাঁহার কৌশল মাত্রেই দোষের ভাগ অধিক ভিন্ন অল্প নহে। আমাদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ক্ষুধা দিয়াছেন সেই ক্ষুধাই আমাদিগের রোগ মৃত্যুর কারণ। আহারে যেমন সুখ, অনাহারে তাহা হইতেও অধিক কষ্ট। আবার কুদ্রব্য বা অতিরিক্ত ভোজনে পীড়া জন্মে। আমাদিগকে সংসারে আসক্ত করিবার জন্য স্নেহ ও প্রণয় দিয়াছেন, কিন্তু তাহাই আবার বৈরাগ্যের কারণ। প্রণয়ী বা স্নেহাস্পদের মিলনে যে সুখ তাহাদের বিরহে তাহা হইতে অধিক দুঃখ। পুত্র জন্মিলে যত সুখ না হয়, মরিলে তাহা হইতে অনেক পরিমাণে দুঃখ হয়। যে জল, বায়ু, আতপ ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন রক্ষা হয় না, তাহারাই আমাদের পরমশত্রু। এইরূপে দেখা যায়, ঈশ্বরের কৌশল মাত্রই দোষ যুক্ত। এমন কৌশলই দৃষ্ট হয় না, যাহা দোষস্পর্শশূন্য। তবে তাঁহাকে কিরূপে সুকৌশলী বলা যায়!

আশ্চর্য্য এই যে, যে সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। ঈশ্বর করুণাময়, ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্। যখন জীবগণ অহোরহ নানাবিধ কষ্ট পাইতেছে, তখন তাঁহাকে কি রূপে করুণাময় বলা যায়? যখন তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান, অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহা তিনি করিতে পারেন, তখন মনে করিলে জীবগণ যাহাতে দুঃখ না পায় তাহা করিতে পারিতেন। তাহা যখন করেন নাই, তখন হয় তাঁহাকে নিষ্ঠুর, না হয় অক্ষম বলিতে হইবে। কিছুতেই তিনি এই উভয়গুণের অধিকারী হইতে পারেন না। ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ ও শুভাশুভ ফলদাতা। যখন ভবিষ্যৎ বিষয়ে ঈশ্বরের জ্ঞান আছে, তখন যাহা ঘটিবে, তাহা নিশ্চিত। নিশ্চয়তা না থাকিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারেনা। কল্য হরি, রামকে মারিবে কিনা তাহার যদি নিশ্চয়তা না থাকে তবে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলা যায় না। তাঁহাকে ত্রিকালজ্ঞ বলিতে হইলে হরি রামকে হয় মারিবে নাহয় মারিবে না, ইহার একটা নিশ্চয় থাকা চাই। ঘটনাবলীর এরূপ নিশ্চয়তা থাকিলে মনুষ্য তাহার অন্যথা করিতে পারেনা। যাহা ঘটিবে, তাহা ঘটিবেই। ঈশ্বর তাহা জানিতেছেন, তদ্বিপরীতে মনুষ্যের সহস্র চেষ্টা বিফল; সুতরাং মনুষ্য শুভাশুভ ফলের অধিকারী নয়। কাজেই ঈশ্বর যদি ত্রিকালজ্ঞ হন, তবে শুভাশুভ ফলদাতা নহেন, যদি শুভাশুভ ফলদাতা হয়েন অর্থাৎ কার্য্য মাত্রেই যদি মনুষ্যের স্বাধীনতা থাকে, তাহার চেষ্টার শুভ বা অশুভ হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি ত্রিকালজ্ঞ নহেন। কেননা যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে, তাহা মনুষ্যের ক্ষমতাধীন। মনুষ্য কি করিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহার ভাবিষ্যৎ জ্ঞানও নাই। ঈশ্বর সমদর্শী, অথচ ভক্তবৎসল। ভক্তবৎসল বলিলে অভক্তকে ভাল বাসেন না বুঝায়, তবে তাঁহাকে কি রূপে ভক্তবৎসল ও সমদর্শী বলা যায়; তিনি সমদর্শী অর্থাৎ সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান দৃষ্টি। তবে বিশ্বে এত প্রভেদ কেন? কেহ নর, কেহ

কীট কেন? কেহ রাজা কেহ প্রজা কেন? কেহ ধনী কেহ নির্ধন কেন? কেহ বলবান্, কেহ দুর্ব্বল কেন? কেহ বুদ্ধিমান্, কেহ নির্ব্বোধ কেন? কেহ রূপবান্, কেহ কদাকার কেন? যদি বল মনুষ্যের স্বীয় কার্য্য দোষে; তাহা হইলে মনুষ্যকে স্বাধীন বলিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ নহেন এবং ঐ স্বাধীনতা যদি ঈশ্বরদত্ত হয়, যদি সকলকে সমান রূপ বল, বুদ্ধি, শক্তি, স্বাধীনতা সম পরিমাণে দিয়া থাকেন, তবে সকলে সমান হয় না কেন? যদি ভিন্ন পরিমাণে দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সমদর্শিত্ব কোথায়? ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আকারহীন, গুণহীন, ভাবান্তর বিহীন ও কর্ম্মশূন্য পদার্থ বা কিছু সম্ভব হইতেই পারে না, যদিও পারে তাহা হইলে তাহার কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর নির্ব্বিকারাদি গুণ সম্পন্ন হইলে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা বা পূর্ব্বোল্লিখিত রূপ সেবাতোষ, করুণানিধান, স্বর্গ-নরক-বিধাতা প্রভৃতি হইতে পারেন না। আর যদি তিনি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আদি হয়েন তবে নির্ব্বিকারাদি হইতে পারেন না।

এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, প্রচলিত ঈশ্বর মানবের মনঃকল্পিত। কল্পিত না হইলে, মানবে নাই, অন্ততঃ এমত একটী গুণও তাঁহাতে লক্ষিত হইত। ফলতঃ মানব যখন দেখিলেন, যে কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে; তখন ভাবিলেন যে, বিশ্বরূপ কার্য্যেরও অবশ্য কারণ আছে। সেই কারণেরই নাম ঈশ্বর হইল। ঐ ঈশ্বর জ্ঞানদ্বারা পাওয়া গেলনা বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞানাতীত বলা হইল। ঈশ্বর যে কল্পনা-সৃষ্ট তাহা ইহাতে আরও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশ্ব কি প্রকারে হইল ও কি প্রকারে রক্ষিত হইতেছে, কেবল তজ্জন্য যদি ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে ত আবার ঈশ্বর কি প্রকারে হইলেন তাহারও কারণ আবশ্যক হইবে। তবে যদি অনবস্থা দোষ পরিহার জন্য ঈশ্বরকে অনাদি অনন্ত বলা হইয়া থাকে তবে

বিশ্বকে সেইরূপ বলিলেই ত চলে। আমরা ত প্রমাণ করিয়াছি বিশ্ব অনাদি অনন্ত। অনাদি অনন্ত বস্তুর আবার সৃষ্টি কি? বিশেষত, স্বতন্ত্র ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, কেননা তিনি যদি সমস্ত অর্থাৎ ভাল মন্দ সমুদায়েরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সকল ভাল মন্দের দায়ী তিনিই হয়েন; মানব বা কোন জীব তাহার দায়ী হইতে পারে না, সুতরাং তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও ভাল মন্দের বিচার থাকে না। এই জন্য বেদান্ত মতে পরব্রহ্মকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন না, তাঁহার আংশিক শক্তি মায়া সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ বলিয়া উক্ত শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।

এই সকল তর্ক করিয়াই নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু নাস্তিকদিগের এই বাক্য নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। আমি আছি, তুমি আছ, চতুর্দ্দিকে অনন্ত পদার্থ আছে, অথচ ঈশ্বর নাই, একথার অর্থ কি? হে নাস্তিক মহাশয়! আপনি বলিয়া থাকেন যে, এ সমস্ত আপনা আপনি হয়, অথবা প্রকৃতি অনুসারে হয়। আমি তুমি কি আপনা হইতে হইয়াছি ও আপনা হইতে যাইব? কাহারও সহিত কি আমাদের সম্বন্ধ নাই! যদি বল প্রকৃতি হইতে হয়। প্রকৃতির অর্থ কি? কাহার প্রকৃতি হইতে হয়? আপনি কি মনে করেন, এই সকল ভূতের ব্যাপার কেবল ভূতেরই ব্যাপার; তাহা যদি ভাবিয়া থাকেন, তবে নিতান্ত ভ্রান্ত হইয়াছেন। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন যে, আস্তিকদিগের ঈশ্বর মিথ্যা এবং নাস্তিকদিগের ঈশ্বর নাই মিথ্যা; তবে সত্য কি? সত্য নিরূপণ করিতে হইলে ঈশ্বরের লক্ষণ নিরূপণ করা আবশ্যক অর্থাৎ ঈশ্বর কাহাকে বলে জানা আবশ্যক। স্বতন্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা যে হইতে পারেনা তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে ঈশ্বরের লক্ষণ কি? ঈশ্বরানুসন্ধানের মূল কারণ এই যে, অনিত্য হইতে নিত্য অন্বেষণ করা। আমরা যাহা দেখিতেছি তৎসমস্তই অনিত্যাবস্থ অথচ নিত্য সম্বন্ধ; সেই নিত্যাবস্থা ঈশ্বর ও অনিত্যাবস্থাই বিশ্ব। সুতরাং ঈশ্বর ও বিশ্ব স্বতন্ত্র না হইয়াও ভিন্ন, অগ্নি ও দাহিকাশক্তি যেরূপ ভিন্ন, জল ও শৈত্য যেরূপ ভিন্ন, চুম্বক ও আকর্ষণ শক্তি যেরূপ ভিন্ন সেইরূপ ভিন্ন।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্য বেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যেতু কথ্যন্তে ব্যষ্টি সংজ্ঞয়া॥" পঞ্চদশী

মানবের আত্মা যেরূপ আমি বাচক, বিশ্বের আত্মা সেইরূপ ঈশ্বর বাচক। এই জন্য ঈশ্বরের নাম পরমাত্মা। আত্মা যেমন মানব হইতে স্বতন্ত্র নহে, বিশ্বাত্মা ঈশ্বরও সেইরূপ বিশ্ব হইতে স্বতন্ত্র নহেন। এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রের মত এই যে ঈশ্বর সর্ব্ব ভূতে নিয়ত বর্ত্তমান, সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের অংশ এবং আমি ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

"অস্তি ব্রহ্মেতিচেৎবেদ পরোক্ষজ্ঞানমেরতৎ।
অহং ব্রহ্মেতিচেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ সউচ্যতে॥
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থ মাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্য এববিমুচ্যতে॥
কূটস্থো ব্রহ্মজীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্ব্বিধা।
ঘটাকাশ মহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখেযথা॥" পঞ্চদশী

এ বিষয়ে আরও বিশদ করিতে হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন; এ স্থলে আর অধিক বলার আবশ্যক নাই। কেননা ঈশ্বর আছেন সে বিষয়ে সন্দেহ করা আবশ্যক নাই ও ঈশ্বর না থাকা অসম্ভব, তাহা একরূপ বলা হইয়াছে; ঈশ্বর বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে না, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে একটী স্তোত্র দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ আর একটু বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেছি।

স্তোত্র।

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্ব্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত কর্ম্মৈক ফলদঃ॥
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চবিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মেভ্যো বিধিরপিঃ নযেভ্যঃ প্রভবতি॥"

হে বিশ্বাত্মন্ বিশ্বময় পরমপিতঃ পরমেশ্বর। আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে ভগবতি বিশ্বজননি অনাদ্যা শক্তি! আমি তোমাকে

নমস্কার করি। যদিও তোমাতে আমাতে ভেদ নাই, তথাপি আমি তোমার মহিমা বর্ণন করিব। তুমি স্তবে তুষ্ট না হইলেও আমি তোমার স্তব করিব। হে দেবি বিশ্বশক্তি! তুমি একবার সরস্বতী রূপে আমার জিহ্বাগ্রে বাস কর; আমি তোমার স্বরূপ বর্ণনা করিব। তুমি যেমন রমণীর শিরোমণি, সেইরূপ পুরুষের মধ্যেও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তোমার বিরাটমূর্ত্তি চিন্তা করিলেও বিস্মিত হইতে হয়। হে বিশ্ব-রূপি ব্রহ্ম! প্রত্যেক পৃথিবী তোমার পদ, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নয়ন, আলোক তোমার বর্ণ, বায়ু তোমার শ্বাস, আকাশ তোমার ব্যাপ্তি, গ্রহ নক্ষত্র সকল তোমার রোমকূপ এবং শক্তি তোমার প্রাণ। তোমার বিশ্বদেহের তুলনা নাই। তুমি বিশ্বের স্রষ্টা, সুতরাং ব্রহ্মা; তুমি বিশ্বের পাতা, সুতরাং বিষ্ণু এবং তুমি বিশ্বের নাশক, সুতরাং শিব। প্রণব তোমারই বাচক। তুমি সকল দেব হইতে উচ্চ, সুতরাং মহাদেব; তুমি দুর্গ হইতে রক্ষা কর, সুতরাং দুর্গা; এবং ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে বিরাজ কর, সুতরাং করাল বদনা কালী। তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র; তুমি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ; তুমি বুদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, মেধা; তুমি লজ্জা, শান্তি, দয়া, শ্রদ্ধা; তুমি দিক্, দেশ, কাল; তুমি তড়িৎ, তাপ, আলোক; তুমি নদী, জল, প্রস্রবণ; তুমি যক্ষ, রক্ষ, দানব; তুমি সত্ব, রজঃ, তম; তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান; তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী; তুমি স্থাবর, জঙ্গম; তুমি দিবা, রাত্রি; তুমি শরীর, তুমিই শরীরী; তুমি স্রষ্টা, তুমিই সৃষ্ট; তুমি দ্রষ্টা, তুমিই দৃশ্য; তুমি শ্রোতা, তুমিই শ্রাব্য; তুমি পিতা, তুমিই পুত্র; তুমিও তুমি, আমিও তুমি। যাহা কিছু আছে, সকলই তুমি। তোমা ভিন্ন কিছুই নাই। তোমার তত্ত্ব কে বুঝিবে? তোমার মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মানবগণ তোমার সৃষ্টি-কর্ত্তার কল্পনা করিয়াছে। তোমার অপ্রমেয় আশ্চর্য্য মহিমা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া এই ভ্রমাত্মক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা জানে না যে, তোমার আদি বা অন্ত নাই। যখন তুমি এই বিশ্বের সংহার কর, তখনও যে তুমি সমগ্র বর্ত্ত-

মান থাক, তাহা তাহারা জানে না। নরকুলতিলক মনু লিখিয়াছেন "আসীদিদন্তমোভূত মপ্রজ্ঞানমলক্ষণং। অপ্রতর্ক্য মবিজ্ঞেয়ম্ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" প্রলয় কালে এই বিশ্ব অন্ধকারময় অবিজ্ঞেয় লক্ষণশূন্য অবস্থায় থাকে। সৃষ্টিকালে আবার সকল পদার্থ স্ব স্ব পূর্ব্বশক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে থাকে। এ সকলই তোমার কার্য্য। কিন্তু হে বিশ্বময়! তুমি কি জন্য এরূপ সৃষ্টিও নাশ কর, তাহা আমরা কিছুই জানি না। তুমি সৃষ্টি করিতেছ, পালন করিতেছ, আবার সংহার করিতেছ। সেই নষ্ট পদার্থের আবার পুনর্জ্জন্ম দিতেছ, আবার মারিতেছ। তুমি কখনও আমাদিগকে হাসাইতেছ ও কখনও কাঁদাইতেছ। কিন্তু তুমি কেন জন্ম দাও, কেন নষ্ট কর, কেন হাসাও, কেন কাঁদাও, তাহা আমরা জানি না। তুমি জান কি না তাহাও আমরা জানি না। তোমার কোন অভিপ্রায় আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার ক্রীড়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা আছে কি না, তাহা আমরা কি প্রকারে বুঝিব। আমরা দেখিতেছি, তুমি অসংখ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ; কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে দুই প্রকার মাত্র কার্য্য দেখিতে পাই। তুমি কেবল ভাঙ্গিতেছ ও গড়িতেছ। জল ভাঙ্গিয়া বাষ্প করিতেছ এবং বাষ্প গড়িয়া জল করিতেছ। তুমি সমভূমিকে পর্ব্বত করিতেছ, আবার পর্ব্বতকে সমভূমি করিতেছ। মরু ভূমিকে উদ্যান এবং উদ্যানকে মরু ভূমি করিতেছ। পশুকে মনুষ্য এবং মনুষ্যকে পশু করিতেছ। এই সকলই ভাঙ্গা গড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাঙ্গা গড়াই তোমার কাজ। কিন্তু তুমি কেন ভাঙ্গ, কেন গড়, উহার কোন উদ্দেশ্য আছে কি না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। হে শক্তিরূপিণি! তোমার অসংখ্য মূর্ত্তি সতত বিরাজ করিতেছে। তুমি যেরূপ নিরাকার, সেইরূপ তোমার অসংখ্য সাকারমূর্ত্তি অহরহঃ দীপ্যমান রহিয়াছে। বিশ্বের সমস্ত পদার্থই তোমার মূর্ত্তি। কখনও তোমার প্রশান্ত মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমরা আনন্দে পুলকিত হই, এবং কখনও তোমার

ভয়ানক মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে বিহ্বল হই। কখন তোমাকে "অতসী পুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং। নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ ভূষিতাং। সুচারু দশনাং দেবীং পীনোন্নত পয়োধরাং। প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকাম প্রদাংশুভাং।" বলিয়া ধ্যান করি, আবার কখনও "করালবদনং ঘোরাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। সদ্যশ্ছিন্ন শিরঃখড়্গা বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাং। মহামেঘ প্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং। কণ্ঠাবশক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধির চর্চ্চিতাং। কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাং। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসোন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্ত ধারা বিস্ফুরিতাননাং। ঘোর রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং।" বলিয়া ধ্যান করি। এই দেখিতেছি, তুমি শান্তভাবে বিরাজ করিতেছ, মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, কোকিল মধুরস্বরে গান করিতেছে, গবাদি পশুসকল সুখে বিচরণ করিতেছে, যুবক দম্পতি প্রেমালাপ করিতেছে, নদী মৃদু কলরবে সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইতেছে, সুগন্ধ ও সুদর্শন পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অতুল শোভা বিস্তার করিতেছে, ময়ূর ময়ূরী সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, নির্ম্মলাকাশে চন্দ্রিকা মোহিনী ক্রীড়া করিতেছে, যে দিকে তাকাই সর্ব্বত্রেই তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকি। মনে ভাবি, তুমি আমাদের সুখের জন্য নিয়তই ব্যস্ত রহিয়াছ। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আবার তোমায় কিরূপ দেখি! আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, নিবিড় অন্ধকারে আপনার শরীর পর্য্যন্ত দেখা যায় না, ভয়ঙ্কর বাত্যা প্রবল বেগে কড়মড়াইতেছে, বৃক্ষ সকল মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিতেছে, গৃহসকল যেন রসাতলে নীত হইতেছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, করকাঘাতে শরীর ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, বিদ্যুতালোকে চক্ষু ধাঁদিয়া যাইতেছে, অশনিপাতের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিকে মনুষ্য সকল হা হতোঽস্মি বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে, প্রণয়ীর মৃত্যুজনিত ক্রন্দনধ্বনিতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতেছে। যেদিকে দেখি সকলই ভয়ানক। তোমার এই সংহার মূর্ত্তি স্মরণ করিলেও

ভয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তখন বোধ হয় যেন তুমি বিশ্বের-সংহার সাধন করিতে আসিয়াছ। যেন ক্রোধে তোমার বিশ্বদেহ কম্পিত হইতেছে। কিন্তু জানি না, কিসে তোমার ক্রোধ হয় এবং কিসে ক্রোধের শান্তি হয়। এই দেখিতেছি শ্যামল শস্যক্ষেত্রে স্থান বিশেষ শোভিত করিতেছে, আবার দেখি আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতে বিদীর্ণ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী শত শত গ্রাম ও নগর উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে। এই দেখিতেছি স্রোতস্বতী কলকল রবে মধুর গান করিতে করিতে গমন করিতেছে, আবার দেখি ভয়ঙ্কর বেগে জল প্রবাহ উত্থিত হইয়া সমুদায় দেশ প্লাবিত করিতেছে। এই দেখিতেছি ভয়ঙ্কর শীতে শরীর অবসন্ন ও জড়সড় হইয়া অগ্নির নিকট বসিয়া রহিয়াছি, জলকে বিষবৎ স্পর্শ করিতে ভয় হইতেছে, আবার দেখি ভয়ানক রৌদ্রের তাপে শরীর জ্বলিয়া যাইতেছে, প্রিয় অগ্নি বিষতুল্য হইয়াছে এবং বিদ্বিষ্ট জল সুখের সামগ্রী হইয়াছে। এই দেখিতেছি সুখাসীন মানব প্রিয় পরিজন, বয়স্য ও প্রণয়িনীর সহিত মধুর আলাপ করিতেছে, পরোপকার ও পরহিত চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে, শত শত আশাকে হৃদয়ে বর্দ্ধিত করিতেছে, সতত আপনাকে অজর অমর করিবার চেষ্টা করিতেছে, আবার দেখি তাহার সেই যত্নের দেহ চিতায় শায়িত রহিয়াছে, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইতেছে, চতুর্দ্দিকে পরিজনেরা আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। এ সকলই তোমার রূপবৈচিত্র ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সকলের গূঢ় অর্থ কে বুঝিবে? যদি আমরা তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারিতাম, তবে তোমাতে আমাতে কি প্রভেদ থাকিত? তুমি যাহাকে যাহা দিয়াছ, সে তাহা পাইয়াছে, যাহা দেও নাই সে তাহা পায় নাই। তুমি সিংহকে বল, অশ্বকে গতি, ময়ূরকে শ্রী, কোকিলকে স্বর, অগ্নিতে তাপ, তুষারে শৈত্য, তাড়িতে গতি, দীপকে উজ্জ্বলতা এবং মানবকে বুদ্ধি দিয়াছ! তুমি যাহাকে যাহা দেও নাই, সহস্র চেষ্টা করিলেও সে তাহা পাইবে না। কাহার সাধ্য তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। যে তাহার চেষ্টা করিবে, সে তদ্দণ্ডে শুই

আত্মার উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। হে জগদাম্বিকে! মানব তোমারই সন্তান, সুতরাং তোমারই অঙ্গবিশেষ। মরিলে তোমাতেই লীন হইবে। সুতরাং মানবের মৃত্যু মৃত্যু নহে। হে বিশ্বময়! যদিও জানিতেছি যে, তোমার স্তব করা বৃথা, কেন না তুমি তোষামোদে ভুলনা, তথাপি তোমার মহিমা গান করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, মনের স্ফূর্ত্তি হয় ও সংসার জয় করা যায়, সুতরাং তোমার গুণাগুণে ফল আছে। তোমার পূজা করিতে কালাকাল ও স্থানাস্থান বিচার করিতে হয় না, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই ও যখন ইচ্ছা তখনই তোমার পূজা করা যায়। তাহাতে ফুল জল প্রভৃতির আবশ্যক করে না, চক্ষুও মুদ্রিত করিতে হয় না। স্থিরচিত্তে তোমার রূপ ও শক্তির বিষয় ভাবনা করিয়া তোমার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলেই তোমার পূজা করা হয়। মানবগণ আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, কার্য্যে, বিশ্রামে সকল সময়েই তোমার পূজা করিতেছে। যাহারা কেবল তোমার পূজা করে, তাহাদের পৃথিবীর কাহারও সহিত ধর্ম্মদ্বন্দ্ব হয় না। কেন না, তোমার সাক্ষাৎ নিয়ম লঙ্ঘন ভিন্ন অন্য কিছুতেই তোমার ক্রোধ হয় না। সুতরাং পরস্পৃষ্ট অন্ন ভোজন বা পুত্তলিকা পূজা করিলে তোমার নিকট কোন অপরাধ হয় না। হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেই তোমার নিকট সমান। তুমি কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা প্রভৃতির নামে নাম রাখিলে রাগ করনা এবং ব্রাহ্মণের আভিজাত্য চিহ্ন স্বরূপ উপবীত ধারণে ক্ষুণ্ণ হওনা। তোমার সেবকদিগকে সাক্ষাৎ দেবতা, পিতা, মাতা ও প্রণয়পুত্তলি রমণী পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না, অথবা বিধর্ম্মী বলিয়া বন্ধুগণের বিশ্বস্ত ধর্ম্মকার্য্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতে হয় না। হে পরাৎপর! তোমার আশ্চর্য্য গুণ এই যে, তুমি স্তবে তুষ্ট বা নিন্দায় কষ্ট হও না; সহস্র লোক একত্রিত হইয়া উচ্চরবে দিবা নিশি তোমার নাম উচ্চারণ করিলে অথবা মুদ্রিত নয়নে তোমাকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে আনিয়া সহস্র দিন চিন্তা করিলেও তুমি তুষ্ট হও না। নানা প্রকার গীত বাদ্য ও নানা

মূল্যবান্ উপহার সহ পূজা করিলেও তুমি সন্তুষ্ট হও না। কেন না তুমি ন্যায়পর, ভোলানাথ বা আশুতোষ নও। তুমি সত্য স্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ ও ন্যায়পর। তুমি, করুণাময় নও। যাহারা তোমাকে করুণাময় বলে, তাহারা তোমার মহাশক্তির দুর্নাম ঘোষণা করে। যাহারা তোমাকে স্তবে তুষ্ট করিবার প্রয়াস্ পায়, তাহারা তোমাকে বালকের ন্যায় চঞ্চল ও অবিমৃষ্যকারী বিবেচনা করে। তোমার নির্ব্বিকার নামে বিকার জন্মাইয়া দেয়। যদি একেশ্বর বাদীরা পৌত্তলিকদিগকে অধার্ম্মিক বলিতে পারেন, তাহা হইলে, যাঁহারা তোমার ইচ্ছা প্রভৃতির কল্পনা করেন, তাঁহা-দিগকেও অধার্ম্মিক বলা যায়। কিন্তু তোমার নির্ব্বিকারত্বগুণে তুমি কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হও না। হে জ্ঞানময়! তুমি দয়াময় নও বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরও নও। কেন না, আমরা পদে পদে তোমার ক্ষমার পরিচয় পাইতেছি। যদি তোমার ক্ষমা না থাকিত তাহা হইলে একবার রোগ হইলে আর সারিত না। শোক হইলেও আর সুস্থ হইত না। হে সনাতনি শক্তি! যাহারা তোমাকে জড় প্রকৃতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তুমি অচিন্ত্য শক্তি, অপার মহিম, অপ্রেমেয় জ্ঞানাধার, চৈতন্যস্বরূপ, সত্যস্বরূপ, নির্ব্বিকার, ও" তৎসৎ "বাচ্য ও এক মেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা তোমা ভিন্ন অপর পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তাহারা তোমার অদ্বিতীয় নাম অর্থশূন্য করে অথবা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে। তাহাদিগকে দ্বৈতবাদী বলিতে হয়। তোমার উপাসকেরা প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। যাঁহারা তোমার উপাসক অর্থাৎ যাঁহারা অদ্বৈতবাদী বিশ্বদেব উপাসকদিগকে নাস্তিক বলেন, তাঁহারাই নাস্তিক অথবা তাঁহারাই পৌত্তলিক। হে বাঙ্মনসোঽগোচর! তোমার মহিমা আমি কি বর্ণনা করিব? তুমি মানবের এমন শক্তি দাও নাই যে, তদ্দ্বারা তোমাকে অবগত হয়। যে বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে তোমার তত্ত্ব জানি-বার আশা করা যায়, তাহা মানবের কৃত, সুতরাং অপূর্ণ। মানব

স্বরূপে অপূর্ণ। অপূর্ণ শক্তি দ্বারা তোমার পূর্ণশক্তির পরিচয় কিরূপে লইব? তোমার নিকট প্রার্থনা এই যে, আমাতে এমত মহাভূত সকল প্রদান কর, যাহার বলে তোমার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। ইহাই মানবের একমাত্র অভাব। অপূর্ণতা দূর হইলেই মানব চরিতার্থ হয়। কিন্তু তুমি তাহা পূর্ণ করিবে কি না বলিতে পারি না। যিনি প্রতিদিন অবহিতচিত্তে এই স্তব পাঠ করিবেন, তিনি সংসারজয়ী হইতে পারিবেন। মর্ম্মার্থ বুঝিয়া এই স্তব পাঠ করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। কোন কষ্টই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, রোগ শোক কিছুতেই তিনি ব্যথিত হন না। কেননা, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবেন।

> "বিক্ষেপোযস্যনাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্তং নমনতে।
> ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রহুর্ম্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
> দর্শনাদর্শনেহিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
> যস্তিষ্ঠতি স তুব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎস্বয়ং॥" পঞ্চদশী

অতএব সকলেরই উচিত পূর্ব্ব ও পর সন্ধ্যারাগরঞ্জিত মনোহর কালে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পরম পরাৎপর বিশ্বদেব ব্রহ্মের উপাসনা করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জ্ঞান ও বিশ্বাস।

আমরা এপর্য্যন্ত জ্ঞানের উল্লেখ অনেকবার করিয়াছি, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও আলোচনা করা হয় নাই; এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এ বিষয়ে সাধারণ মত এই যে, জ্ঞান

নামক শক্তি বিশেষ মানবের সহজাত ও ঐ জ্ঞান দ্বারা আমরা সত্য নিরূপণ করি, এবং সত্য নিরূপণ করাই জ্ঞানের কার্য্য। কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানদ্বারা সত্য পাই, কি সত্যদ্বারা জ্ঞান পাই, তাহার বিচার আবশ্যক। সত্য কাহাকে বলে? সত্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন, তবে এইমাত্র বলা যায় যে, যাহা যাহা তাহাই সত্য অর্থাৎ পদার্থের প্রকৃত অবস্থাকে সত্য বলে। ঐ সত্য প্রতিভাত হওয়ার নাম জ্ঞান। সত্য জ্ঞানের বিষয় এবং সত্য নিরূপণই জ্ঞানের নামান্তর। বিষয় না হইলে কখনও জ্ঞান হইতে পারেনা। সত্য চিরকাল বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধীয় মানবের জ্ঞান চিরকাল নাই। সত্য জ্ঞান ভিন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান সত্য ভিন্ন থাকিতে পারে না। তাড়িতের গতি অতি দ্রুত এ সত্য চিরকালই আছে, কিন্তু তাহা পূর্ব্বে মানবের জ্ঞানগত হয় নাই। কিন্তু এমত জ্ঞান হইতে পারে না, যাহা মানব হৃদয়ে আছে অথচ তাহার আধারভূত কোন সত্য অর্থাৎ বিষয় নাই। কারণ সত্য অবধারণের নামই জ্ঞান। বিষয় না থাকিলে কি অবধারণ করিবে? যখন বিষয় না পাইলে জ্ঞান হইতে পারেনা, তখন জ্ঞান মানবের সহজ কি প্রকারে হইবে? সত্য হইতেই মানবগণ দিন দিন জ্ঞান লাভ করিতে থাকে অর্থাৎ যখন যে বিষয় মানবের গোচর হয় তখন সে সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যে, যেমন স্থানে ও যেমন অবস্থায় অবস্থিত হয় তাহার তদনুরূপ জ্ঞান হয়। যাহারা সমুদ্রকূলবাসী তাহাদের যে রূপ সমুদ্র বিষয়ে জ্ঞান হইবে, আমাদের তদনুরূপ হইবেনা। ঐরূপ পার্ব্বত্য প্রদেশ বাসীদিগের পর্ব্বত জ্ঞান, শীত প্রধান দেশ বাসীদিগের তুষার জ্ঞান, অরণ্যবাসীদিগের ব্যাঘ্রাদি বন্য জন্তু সম্বন্ধে জ্ঞান যেরূপ জন্মে, আমাদের সেরূপ হইতে পারেনা। কেননা তাহারা সর্ব্বদাই ঐ সকল দেখিয়া থাকে, আমরা কদাচিৎ দেখি। আমরা যাহা কখনও দেখিনাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান আমাদের হইতে পারেনা, তবে অন্যের দৃষ্ট বিষয় শুনিয়া যে জ্ঞান লাভ করি সে ভিন্ন কথা। অতএব যখন বিষয় অর্থাৎ সত্য না পাইলে

জ্ঞান হইতে পারেনা, তখন জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপণ কিরূপে হইবে? বাস্তবিক যদি জ্ঞানই সত্য নির্ণয়ের কারণ হইত, তাহা হইলে স্থান ও কালভেদে জ্ঞানের পার্থক্য হইত না। তাহা হইলে যে কোন স্থানেও যে কোন অবস্থায় থাকুক না কেন, সকলেই সকল বিষয়ে সমান জ্ঞান লাভ করিত; কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় না, সত্য অর্থাৎ বিষয়ই জ্ঞানের কারণ, এই জন্য যে স্থানে ও যে কালে যেমন বিষয় বর্ত্তমান থাকে, সেস্থানে ও সেই কালে মানবের সেইরূপ জ্ঞান জন্মে।

ইহাতে এই অপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি বিষয়ই জ্ঞানের কারণ হয়, তবে সকলে সমান জ্ঞানী হয় না কেন? বিষয় ত চিরকালই আছে, তবে মানব যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, পশু পক্ষ্যাদি তাহা পারেনা কেন? সুতরাং বলিতে হইবে যে, বিষয়ের শক্তিপ্রতিভাত হইতে পারে এমন কোনও শক্তি অবশ্য মানবে আছে। যে শক্তিদ্বারা মানবে জ্ঞান প্রতিভাত হয়, তাহার নাম জ্ঞান, এবং ঐ জ্ঞান দ্বারাই সত্য প্রকাশ হয়। ঐ শক্তি অন্য জীবে নাই এই জন্য তাহাদের মানবের ন্যায় জ্ঞান জন্মেনা। যখন ঐ সত্য প্রকাশক শক্তি মানবের সহজাত তখন জ্ঞানকে কেননা সহজাত বলিব? তদুত্তরে আমরা বলি যে, এমত কোনএকটী শক্তি মানবে নাই যে কেবল তাহা দ্বারা মানব জ্ঞান লাভ করে। কেননা, যদি কোন এক শক্তি দ্বারা জ্ঞান লাভ হইত তাহা হইলে পদার্থের সকল প্রকার শক্তিই এক প্রকারে অবগত হওয়া যাইত। তাহা হইলে ময়ূরের শ্রী, গীতের মধুরতা, শর্করার স্বাদুতা, পুষ্পের সৌরভ ও অগ্নির দাহিকা শক্তি একই প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা না হইয়া বিশেষ বিশেষ পদার্থের জ্ঞান বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ হইতেছে। ময়ূরের শ্রী চক্ষুভিন্ন নাসিকা, কর্ণ, জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, গীতের মধুরতা কর্ণভিন্ন, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ঐরূপ শর্করার স্বাদুতা জিহ্বা, পুষ্পের সৌরভ নাসিকা এবং অগ্নির দাহিকাশক্তি ত্বক্ ভিন্ন অন্য কোন

ইন্দ্রিয় দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। যদি জ্ঞান নামক শক্তি বিশেষ সমস্ত জ্ঞানের কারণ হইত তাহা হইলে কখনও এরূপ হইতে পারিত না। তাহা হইলে পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর কোনও প্রকার জ্ঞানই জন্মিতে পারিত না, এবং উন্মাদদিগের জ্ঞান নাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় শক্তিরও লোপ হইত। এবং তাহা হইলে মানব শিশু জন্মিবামাত্র জ্ঞান সম্পন্ন হইত অর্থাৎ যখন যে পদার্থ মানবের জ্ঞানের বিষয় হইত তখনই তাহার তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ হইত। কিন্তু যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পশ্বাদি ইতরপ্রাণীরা স্ব স্ব আবশ্যক মত সমস্ত জ্ঞানই উপার্জ্জন করিতেছে ও উন্মাদগণ ক্ষণমাত্রও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান শূন্য হইতেছে না, এবং যখন দেখা যাইতেছে মানবশিশু শিক্ষা না পাইলে কিছুমাত্র জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিতে পারে না এবং মহা পণ্ডিতগণও জ্ঞান লাভ করিতে যাইয়া নিরত ভ্রান্ত হইতেছেন, তখন জ্ঞানকে কিপ্রকারে সহজ বলিব, এবং ঐশক্তি পশ্বাদিতে নাই, মানবে আছে তাহাইবা কিপ্রকারে বলা যায়? বাস্তবিক যদি সহজাত জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হইত তাহা হইলে, ঈশ্বর কি? সৃষ্টি কেন হইল? ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি? তিনি জন্ম দিয়া আবার মরণ কষ্ট দেন কেন? বিশ্ব নিয়ম সকল দোষযুক্ত করিয়াছেন কেন? ইহা অপেক্ষা ভাল নিয়ম করিলেন না কেন? ইত্যাদি অলৌকিক বিষয় সকলের মর্ম্ম আমরা জানিতে পারিতাম। কিন্তু ঐ সকল জানা দূরে থাকুক, যদি কেহ ঐ সকল বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহা হইলে লোকে তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উড়াইয়া দেয়। কেন লোকে এরূপ করে? যদি জ্ঞানদ্বারা সত্য নিরূপণ হয় তবে কেন ঐরূপ চেষ্টাকারীদিগকে লোকে উন্মাদ বলে? তবে জ্ঞান কেন ঐ সকল সত্য নিরূপণের চেষ্টা করিবে না? কেন আমরা সর্ব্বজ্ঞ হইব না? কারণ এই যে, বাস্তবিক জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপণ হয় না, সত্য নিরূপণই জ্ঞান, সত্য না পাইলে জ্ঞান হইতে পারেনা, উপরোক্ত সত্য সকল আমাদের অতীন্দ্রিয়, এই জন্য তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কিছুতেই আমাদের নাই, তাহাতেই ঐরূপ চেষ্টাকে উন্মত্ততা বলে।

কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয় এমত নহে। আমাদের হৃদয়ে ধারণা, স্মৃতি, তুলনা, কল্পনা, প্রভৃতি অনেক গুলি শক্তি আছে; তাহাদিগকে সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি বলা যায়। জ্ঞানলাভ করিতে ঐ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা একান্ত আবশ্যক। বুদ্ধি না থাকিলে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় না। ঐ বুদ্ধি যাহার যেমন আছে সে তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করে। পশ্বাদির বুদ্ধি নিতান্ত অল্প এজন্য তাহারা মানবের ন্যায় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে তাহা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না। এই জন্য অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান লাভের চেষ্টা অসম্ভব। জ্ঞান আমাদের সহজাত নয় দেখিয়াই অনেকে বলিয়া থাকেন যে, মানবের সকল শক্তি সহজাত নহে, অনেক শক্তি মানবের উপার্জ্জিত। বাস্তবিক তাঁহাদের একথা ভ্রান্তিমূলক। কেননা জ্ঞান কোন শক্তি বিশেষ নহে, উহা সম্পত্তি বিশেষ, উহা অর্জ্জিত বলিয়া মূল শক্তি অর্জ্জিত হইতে পারেনা। এ বিষয়ের সুস্পষ্ট আলোচনা পরে করা যাইবে।

যদি সত্য নিরূপণেরই নামান্তর জ্ঞান হইল, তবেত আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তৎসমস্ত সত্য হইবে, কিন্তু তাহা হয় না কেন? অভাবের অল্পতা, ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্যতা ও বিষয়ের জটিলতাই প্রকৃত জ্ঞান লাভের প্রধান বাধা। শিশুর অভাব কেবল ক্ষুধা, স্তন্যপান করিয়া তাহার সেই ক্ষুধা রূপ দুঃখের অবসান হইল; শিশুর জ্ঞান হইল স্তন্যপানে দুঃখ দূর হয়। ঐ জ্ঞানানুসারে শিশু অন্য প্রকার কষ্ট হইলেও স্তন্যপান দ্বারা নিবারিত হইবে বিবেচনা করে, এবং স্তন্য মাত্রেই দুগ্ধ অর্থাৎ দুঃখ নিবারক পদার্থ আছে মনে করে। মানব আকাশে নক্ষত্র মণ্ডল দেখিল, কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিল, এজন্য তাহার জ্ঞান হইল নক্ষত্র সকল হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল ও ক্ষুদ্র এবং আকাশের যে স্থানে যে নক্ষত্র আছে দেখা গেল, সেই স্থানেই সেই নক্ষত্র আছে বলিয়া জ্ঞান হইল। দর্শনেন্দ্রিয়ের ইহা অপেক্ষা আর ক্ষমতা নাই, সুতরাং কেবল দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা ঐ

ভ্রম জ্ঞান জন্মিল। বাস্তবিক নক্ষত্র ক্ষুদ্র নহে, দূরে আছে বলিয়া ক্ষুদ্র দেখায়; এবং বাস্তবিক নক্ষত্র যে স্থানে আছে বলিয়া দেখা যাইতেছে সে স্থানে উহা নাই; নক্ষত্রের আলোককিরণ সরল রেখায় আসিতে পারিতেছে না বলিয়া উহাকে স্থানান্তরে দৃষ্ট হইয়াছে; দর্শনেন্দ্রিয়ের এসকল জ্ঞান শক্তি নাই, এজন্য মানবের নক্ষত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান হইল তাহা ভ্রান্ত। পারদ ও গন্ধকে মিলিত করিয়া দেখা গেল, উভয় সংযোগে কৃষ্ণ বর্ণ হইল, সুতরাং জ্ঞান হইল যে পারদ ও গন্ধক মিশ্রণে কৃষ্ণ বর্ণ হয়, অন্য কিছু হয় না। কিন্তু ঐ পারদ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া যে ঘোর রক্ত বর্ণ হিঙ্গুল উৎপন্ন হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারাগেল না। এই রূপ নানা করণে মানব সত্যের অনুসন্ধান পায় না। বিশেষতঃ জ্ঞান সকল পরস্পর পূর্ব্ব জ্ঞানের সাপেক্ষ; কোনও একটী বিশেষ সত্য নিরূপিত না হইলে পরবর্ত্তী অপর একটী সত্য নিরূপিত হইতে পারে না। জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সকল যে রূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সাপেক্ষ, জ্ঞান সকলও ঐ রূপ পূর্ব্ব জ্ঞান সাপেক্ষ। নক্ষত্র মণ্ডলের পরিমাণ জানিতে হইলে অগ্রে "দূরস্থ বস্তু ক্ষুদ্র দেখায়," "কত দূরে কত ক্ষুদ্র দেখায়" ইত্যাদি জ্ঞান সকল লাভ করা আবশ্যক; নতুবা এককালে নক্ষত্রের পরিমাণ স্থির করিতে গেলে ভ্রান্তি ভিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান সকল পরস্পর জ্ঞান সাপেক্ষ হওয়াতেই অর্থাৎ কোনও সত্য নিরূপণ করিতে গেলে পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান বিশেষের আবশ্যক হওয়াতেই, লোকে বিবেচনা করিয়াছে যে জ্ঞান দ্বারা সত্য নিরূপিত হয়। কিন্তু যেমন জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা সকল প্রমাণ করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইলেও বাস্তবিক কোন প্রতিজ্ঞা কেবল মাত্র প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, স্বতঃসিদ্ধই প্রতিজ্ঞা প্রমাণের প্রকৃত কারণ, সেই রূপ জ্ঞান সকল উৎপাদন করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জ্ঞানের সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইলেও জ্ঞান দ্বারা সত্য নির্ণয় হয় বলা যাইতে পারে না; বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলনজাত মুল জ্ঞান প্রত্যক্ষই জ্ঞানের প্রকৃত কারণ।

সুতরাং জ্ঞানের বিষয় ইন্দ্রিয়াতীত হইলে তদ্বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারেনা। যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে আমরা চেষ্টা করি যদি সেই বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয় ও ঐ বিষয়ের শক্তি সকল অবিকৃত ইন্দ্রিয় পথে যাইয়া বুদ্ধির বিষয় হয় এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধে যে সকল পূর্ব্ব জ্ঞানের আবশ্যক তাহা যদি পর পর ক্রমানুসারে বুদ্ধির বিষয় হইয়া আসিয়া থাকে তাহা হইলেই প্রকৃত জ্ঞান অর্থাৎ ঐ বিষয়ের সত্য নিরূপণ হয়। ইহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলেই বিপরীত অর্থাৎ ভ্রান্তি হয়। এই জন্য ইহার ব্যতিক্রম সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। বিশেষ প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পদার্থ সকলের সংযোগ ও বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক; তাহা না হইলে, হিঙ্গুল যে পারা ও গন্ধক যোগে উৎপন্ন তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিবে, বিষমিশ্র দুগ্ধে যে বিষ মিশ্রিত আছে তাহা কি প্রকারে জানিবে, বায়ুদ্বয়ের যোগে জল হয় এবং সিঙ্কোনা বৃক্ষে কুইনাইন আছে কি প্রকারে জানিবে? সর্ব্বথা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যথাযোগ্য ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি অর্থাৎ বৃত্তি সকলের যথাযোগ্য বিষয়ে সম্মিলন, পর পর জ্ঞান লাভ ও তৎসাহায্যে পরবর্ত্তী জ্ঞানলাভের চেষ্টা এবং বিষয়ীভূত পদার্থের সংযোগ ও বিয়োগ করণ একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে বিষয়ের সত্য নিরূপণ না হইয়া অসত্যকে সত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

উপরোক্ত কারণ ভিন্ন অন্য প্রকারেও আমাদের ভ্রান্তি হইয়া থাকে। প্রকৃত সত্য বুঝিতে না পারিয়া অযথা অনুমান ও কল্পনা করাতেই ঐরূপ ভ্রান্তির উৎপত্তি হয়। একজন যেদিন একটী গাভী ক্রয় করিয়া আনিল, সেইদিন তাহার বাটীতে একজন পীড়িত হইল, দুই তিন দিনের মধ্যে পরিবারস্থ সকলেই পীড়িত হইল। কেন সকলে পীড়িত হইল, বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল গাভীটীর কোন দোষ থাকিতে পারে; পরে সন্ধানে জানিল যাহাদের নিকট ঐটী ক্রয় করিয়াছে তাহারা নির্ব্বংশ; তাহাতেই গরুটী অলক্ষণযুক্ত জ্ঞান জন্মিল ও গরুটী বিক্রয় করিল, যে ক্রয় করিল সে দেনার দায়ে কারাবদ্ধ হইল। সুতরাং গরু যে নিতান্ত অলক্ষণযুক্ত সে জ্ঞানের আর সন্দেহ থাকিল

না। এক ব্যক্তির শরীর গরম হইয়া জ্বরের ন্যায় হওয়ায় জ্বর হইয়াছে ভাবিল, কিন্তু বাস্তবিক তাহার জ্বর হয় নাই, অথচ জ্বর ভাবিয়া কুইনাইন খাইল ও তাহাতে শরীর জ্বলিতে লাগিল; সহ্য করিতে না পারিয়া জলে ডুব দিল ও ডাবের জল পান করিল। তাহাতেই তাহার শরীর সুস্থ হইলে ভাবিল, তাহার শরীরে কুইনাইন সহ্য হয় না, শৈত্য করিলে তাহার জ্বর আরাম হয়। ঐরূপ দুই তিন বার হইলেই ঐ জ্ঞান তাহার দৃঢ় হইয়া যায়। আকাশে মেঘ হইল, ধনুরাকার পদার্থ দৃষ্ট হইল, বজ্রপাত হইল, ভয়ানক শব্দ হইল। মানব কিছুই বুঝিল না, স্থির করিল দেবরাজ ইন্দ্র ধনুর্ধারণে যুদ্ধ করিতেছেন। প্রত্যক্ষ সে ধনুঃ দেখিয়াছে, বাণ পতিত হইতে দেখিয়াছে, ধনুষ্টঙ্কার শুনিয়াছে; সুতরাং তাহার ঐ জ্ঞান নিশ্চয় হইল। এই প্রকারে অযথা অনুমান ও কল্পনা দ্বারা অনেক ভ্রান্ত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু মনুষ্য যে জ্ঞান লাভ করে তাহা প্রকৃত হউক বা ভ্রান্ত হউক, তাহা সত্য বলিয়াই তাহাদের জ্ঞান বা প্রতীতি জন্মে। তাহার কারণ এই যে ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের প্রত্যক্ষকে যখন জ্ঞান বলা যায় তখন তাহা সত্য ভিন্ন কি হইতে পারে? কেননা প্রত্যক্ষ স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানানুসন্ধায়ী বা জ্ঞানীগণ বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা সত্য বলিয়া যে জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎসমস্ত বাস্তবিক সত্য নহে। তাঁহারা দেখিতে পান পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা যে সমস্ত জ্ঞানকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে তৎসমস্ত সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছে, এবং তাঁহারা নিজে পূর্ব্বে যাহাকে সত্য স্থির করিয়া ছিলেন, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উপপন্ন হইতেছে। তাঁহারা জ্ঞানের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া স্থির করিয়াছেন, যে মানবের জ্ঞান চূড়ান্ত নহে; উহা বিশেষ পরীক্ষা সাপেক্ষ; এই জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়াও যে সকল সত্য অবিষ্কার করিতেছেন, তাহাদিগকেও সম্পূর্ণ সত্য বলিতে সাহস করিতেছেন না। তাঁহারা স্পষ্ট বলিতে-

ছেন যে পরে অধিকতর প্রমাণ দ্বারা ঐ সত্য সকল মিথ্যা রূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। জ্ঞানের এই অবস্থা অর্থাৎ পরীক্ষা সাপেক্ষ অবস্থা এক্ষণে জ্ঞান-পদ-বাচ্য হইয়াছে। এই জন্য বাস্তবিক কোন জ্ঞান সত্য হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তিরা উহাতে সন্দেহ নাই বলিতে পারেন না। কারণ জ্ঞানীরা বুঝিয়াছেন যে মানব অপূর্ণ, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় প্রকৃত জ্ঞানলাভে অসমর্থ, এবং বিশ্বান্তর্গত পদার্থ সকল অত্যন্ত জটিল; এ অবস্থায় প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্য জ্ঞান লাভ করা মানবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অনেক লোক এমত আছেন যে, তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্ত ভ্রান্ত হইলেও সম্পূর্ণ সত্য মনে করেন। তাঁহারা জ্ঞান লাভে মানবের কত শক্তি আছে তাহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রূপ মানবের অপূর্ণতাদির বিষয় আদৌ বিবেচনা করেন না; তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার এই যে তাঁহারা যাহা জানিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রান্তি নাই। এই জন্য তাঁহাদের জ্ঞানের বিরুদ্ধে সহস্র যুক্তি প্রদর্শন করিলেও তাহা শুনিতেই চাহেন না। তাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের ঐ জ্ঞান সহজাত বা ঈশ্বর দত্ত শক্তিবিশেষ হইতে উৎপন্ন, অথবা যাঁহার নিকট তাঁহারা ঐ জ্ঞান লাভ করেন, তিনি অভ্রান্ত পুরুষ। এই জন্য তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানকে চূড়ান্ত মনে করেন, অর্থাৎ উহার সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষান্তরের প্রয়োজন স্বীকার করেন না।

জ্ঞানের ঐ পরীক্ষা নিরপেক্ষ অবস্থা অর্থাৎ কেবল মাত্র উপরোক্ত রূপ সংস্কারানুসারে যে জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে ও যাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই বিশ্বাস পদবাচ্য। ফলতঃ জ্ঞান ও বিশ্বাস একভাবে উৎপন্ন ও একই ভাবে কার্য্যকারী হয়। সুতরাং জ্ঞানের ন্যায় বিশ্বাস সত্য হইতেও পারে, মিথ্যা হইতেও পারে। কেননা যে জ্ঞানটী বিশ্বাসরূপে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সত্যতাসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বোধ হইয়াছে, তাহা যদি সত্য হয় তবে ঐ বিশ্বাসও সত্য হয়, আর তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে ঐ বিশ্বাসও মিথ্যা হয়। বাস্তবিক বিশ্বাস কোন মনোবৃত্তি

বা সহজাত শক্তি বিশেষ নহে; উহা জ্ঞানেরই নামান্তর। প্রভেদ এই যে, জ্ঞান পরীক্ষা সাপেক্ষ ও বিশ্বাস পরীক্ষা নিরপেক্ষ; জ্ঞানের বিরুদ্ধে যুক্তি শ্রবণ যোগ্য, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি অগ্রাহ্য; জ্ঞান পরিবর্ত্তসহ এজন্য চঞ্চল, বিশ্বাস চূড়ান্ত এজন্য দৃঢ়; জ্ঞান চঞ্চল বিধায় হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ নহে, বিশ্বাস দৃঢ় বিধায় হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া স্বভাব বা সংস্কারের ন্যায় হইয়া যায়; জ্ঞান চক্ষুষ্মান্, বিশ্বাস অন্ধ; জ্ঞান উন্নতিশীল, বিশ্বাস স্থিতিশীল; জ্ঞান সত্যনিষ্ঠ, বিশ্বাস ভক্তিনিষ্ঠ। একালে যে জ্ঞান সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল এক্ষণে তাহার ভ্রান্তি আবিস্কৃত হইয়া তাহা মিথ্যা রূপে উপপন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা এক্ষণে বিশ্বাস সত্য রূপে প্রচলিত আছে। আবার এক্ষণে যাহাকে সত্য জ্ঞান বলিয়া পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিয়াছেন, পরে তৎসমস্ত বা তাহার অধিকাংশের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু তখনও, যাঁহারা ঐ সকল জ্ঞান বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অলীক বলিবেন না; কারণ যুক্তি, বিচার ও পরীক্ষা দ্বারাই কোনও জ্ঞানের অলীকত্ব সপ্রমাণ হয়, কিন্তু বিশ্বাস যখন যুক্তি আদি গ্রহণ করে না তখন কি প্রকারে তাহার অলীকত্ব প্রমানিত হইবে? এইজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা বিশ্বাসকে ভ্রান্ত ও জ্ঞানকে সত্য বলেন। বাস্তবিক জ্ঞান ও বিশ্বাস ইহার কোনওটী সম্পূর্ণ সত্য বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। সত্য মিথ্যা উভয়েতেই আছে। তবে বিশ্বাস অপেক্ষা জ্ঞান সত্যের নিকটবর্ত্তী বটে।

বিশ্বাস যদি সহজাত অভ্রান্ত শক্তিবিশেষ হইত, তাহা হইলে মানব মাত্রেই সমান রূপ বিশ্বাস প্রাপ্ত হইত এবং তাহা হইলে শিশুগণের মনে বিশ্বাস সকল প্রকাশিত থাকিত; কিন্তু শিশুদের কি কোন সহজ বিশ্বাস আছে? কখনই না, তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে সকলের বিশ্বাস একরূপ হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া যখন হিন্দু বালকের একরূপ, মুসলমান বালকের অন্যরূপ এবং খৃষ্টান বালকের আর একরূপ বিশ্বাস হয় তখন বিশ্বাসকে কিরূপে সহজ বলা যায়? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তাহারা পিতা মাতা বা গুরুর

নিকট হইতে যেরূপ শিক্ষা পায় তদনুরূপ বিশ্বাস করে সুতরাং বিশ্বাসকে সহজাত না বলিয়া শিক্ষাজাত বলাই উচিত। বিশেষতঃ জ্ঞানের ন্যায় বিশ্বাসও বিষয় সাপেক্ষ। বিষয় না হইলে কিসের উপর বিশ্বাস করিবে? বিষয় যখন সহজাত নয় তখন বিশ্বাস কিরূপে সহজাত হইবে? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমরা যাহা কিছু বিশ্বাস করি তৎসমস্তই বিষয়ের সত্যতা লইয়া অর্থাৎ আমরা যে বিষয় সম্বন্ধে যাহা বিশ্বাস করি তাহাকেই সেই বিষয় সম্বন্ধে সত্য বলিয়া জানি। বিশ্ব কি প্রকারে হইল? অবশ্য ঈশ্বর আছেন। জড়দেহ কি প্রকারে চিন্তা আদি করে? অবশ্য আত্মা আছে। পৃথিবী নিরবলম্বনে কি প্রকারে আছে? অবশ্য অনন্তদেব বা অন্য কোন শক্তি উহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। চন্দ্রের মলিন চিহ্ন গুলি কি? উহার কলঙ্ক। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, প্রভৃতির এত শক্তি ও ঐ সকল আমাদের এত প্রয়োজনীয় কেন? উহারা অবশ্য দেবতা। ভূমিকম্প হয় কেন? বাসুকির মস্তক পরিবর্ত্তন। চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয় কেন? রাহু উহাদিগকে গ্রাস করে। অমুক নির্ব্বংশ হইল কেন? আদ্যাশক্তি কালীকে যথোচিত পূজা করে নাই বলিয়া। এ সমস্তই কারণ অর্থাৎ সত্য জিজ্ঞাসু হইয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, ঐ সকল যে মানুষের জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ কি? বাস্তবিক ঐ সকল চূড়ান্ত বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই বিশ্বাস পদবাচ্য হইয়াছে। ঐরূপ পরধন ও পরদার গ্রহণ করিলে, মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ ও প্রবঞ্চনা করিলে, অন্যের প্রাণনাশ করিলে যখন পরস্পরের সমূহ ক্ষতি হয় দেখা যাইতেছে, তখন যাহারা ঐ সকল অনিষ্টকর কার্য্য করে, ঈশ্বর অবশ্যই তাহাদের দণ্ড দিয়া থাকেন, এই জ্ঞান হইতে পরকালে নরকাদি ভোগ জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ঐরূপে পূর্ব্ব কথিত রোগ হওয়ার কারণ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া অলক্ষণযুক্ত গাভীই কারণ স্বরূপ স্থির হইয়াছে ও তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে। ঐরূপ কারণে অনেকে স্থির করিয়াছেন..কাহার পূজা করিতে নাই, কাহার ইষ্টক প্রস্তুত করা সহে না, কাহার আচার প্রস্তুত করিতে

নাই ও কাহার বৃক্ষ বিশেষ রোপণ করিতে নাই, করিলে তাহাদের অমঙ্গল হয়, ইহা তাহারা পূর্ব্বে জানিয়াছে তাহাতেই সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। এই সকল দ্বারা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বিশ্বাস জ্ঞান বিশেষ ও বিষয় সাক্ষেপ এবং সত্য নির্ণয়ই বিশ্বাসের কার্য্য।

যাহা আলোচনা করা গেল, তাহাতে স্পষ্ট জানা গেল যে জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়েরই মূল এক ও উদ্দেশ্য এক, তবে বিশ্বাস পরীক্ষা সাপেক্ষ না হওয়ায় জ্ঞানের বিরোধী হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্যই সমকালিক জ্ঞান সম বা পূর্ব্বকালীন বিশ্বাস অপেক্ষা সত্যের অধিক নিকটবর্ত্তী সুতরাং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহা বলিয়া জ্ঞানই অবলম্বনীয়, বিশ্বাস অবলম্বনীয় নহে, একথা বলা যায় না। কারণ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা অস্থির সুতরাং উহা হৃদয়ে সম্পূর্ণ মিলিত হয় না তজ্জন্য জ্ঞানীর কার্য্য হৃদয়ের সহিত হয় না। বিশ্বাস অপেক্ষাকৃত ভ্রান্ত হইলেও উহা হৃদয়ে দৃঢ় সম্বদ্ধ হওয়া প্রযুক্ত স্বভাব বা সংস্কারের ন্যায় হইয়া যায়, তজ্জন্য বিশ্বাসীর কার্য্য হৃদয়ের সহিত সম্পন্ন হয়। জ্ঞানী ব্যবস্থা দিতে যেরূপ পটু, কার্য্য করিতে সেরূপ পটু নহেন। বিশ্বাসী বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য প্রাণপণে করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানী জ্ঞানানুরূপ কার্য্য করিতে সেরূপ যত্ন করিতে পারেন না। দান কার্য্য জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই উত্তম বলিয়া জানেন, কিন্তু বিশ্বাসী যেরূপ অকাতরে দান করিতে পারেন, জ্ঞানী সেরূপ পারেন না; বিশ্বাসী সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তৃপ্ত, জ্ঞানী কিঞ্চিৎ দান করিবার সময়েও দানের পাত্র কি না, সঙ্কল্পিত অর্থ দেওয়া সঙ্গত কি না ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করিবেন। মদ্য পান জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই অন্যায় বলিয়া থাকেন কিন্তু বিশ্বাসী হিন্দু যেরূপ মদ্য স্পর্শ মাত্রও করিবেন না, জ্ঞানী অন্যে উহার প্রতি তত বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না, আবশ্যক বোধ হইলে তিনি উহা পানও করিবেন। দেশহিতৈষণা জ্ঞানী ও বিশ্বাসী উভয়েই কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন কিন্তু বিশ্বাসী ক্ষত্রিয় যেরূপ দেশের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, জ্ঞানী অন্যে সেরূপ পারেন না। জ্ঞানী যাহাই করুন নিজের প্রতি

দৃষ্টি তাঁহার থাকিবেই. কিন্তু বিশ্বাসী আত্মবিস্মৃত হইয়া কার্য্য করে। এই জন্য বিশ্বাসীরা বিশ্বাস বশতঃ উপবাস, দান, তপস্যা, চিরবৈধব্য, প্রাণ বিসর্জ্জন প্রভৃতি নিতান্ত দুঃসাধ্য কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে, জ্ঞানী তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারে না। ভক্তি, প্রেম বিশ্বাসেরই সহচর। বিশ্বাসী ভক্তি প্রেমভরে নৃত্য করে ও সংজ্ঞা শূন্য হয়, ঐ মত্ততা জনিত সুখ জ্ঞানী পায় না। আর এক কথা—সকল ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয় না। পরীক্ষা দ্বারা যাবতীয় জ্ঞান লাভ ত কাহারও ভাগ্যে ঘটিবার সম্ভবই নাই। শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান লাভও কচিৎ কেহ করিতে পারে। মানবের অল্প জীবন, কার্য্য ব্যপদেশেই তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হয়। যে যৎ-কিঞ্চিৎ সময় থাকে তাহা জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য ব্যয় করিবার সুবিধা অতি অল্প লোকে পায়; কাযেই বিশ্বাস তাহাদের একমাত্র অবলম্বনীয়। বিশ্বাস অবলম্বন না করিলে, তাহাদের কোনও জ্ঞানই লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, শিক্ষা প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে। বিশ্বাসের আর একটী প্রধান প্রয়োজন এই যে, জ্ঞান সকল শরীরে সমান রূপ প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব বা গঠন উপকরণ, সে তদনুরূপ জ্ঞান লাভ করে; যে ব্যক্তি দয়ার্দ্র সে পশু বা নর হত্যা দেখিয়া ক্লেশ পায়; এজন্য সে জীবহিংসা অকর্ত্তব্য বলে—তাহার মতে অহিংসা পরমধর্ম্ম। যে নিষ্ঠুর তাহার পরদ্রোহে কষ্ট নাই, বরং আমোদ আছে, সুতরাং সে নিজের সামান্য উন্নতির জন্য পরদ্রোহ কর্ত্তব্য বলে। যে দুর্ব্বল ও ভীত সে বিবাদে অপটু, সুতরাং বিবাদের অনিষ্ট বুঝিতে পারে, তাহার মতে ক্ষমাই প্রধান ধর্ম্ম। যে বলবান, তেজস্বী ও অভিমানী সে আত্ম ধনমান রক্ষার জন্য বিবাদ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানে। যে প্রণয়ী সে প্রণয় পাত্রের হিতের জন্য আত্ম বলি দেওয়াকেও কর্ত্তব্য বলে। যে অপ্রণয়ী সে আত্ম সুখের জন্য স্ত্রী পুত্রাদির বিনাশ সাধনও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এইরূপ যে শরীর যে পদার্থ দ্বারা গঠিত সে শরীর হইতে তদনুরূপ জ্ঞানের উদয়

হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় সকলকে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া কার্য্য করিতে হইলে মহান্ অনর্থ ঘটে। এই জন্য বিশ্বাসের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক। বিশ্বাস থাকিলে কি দয়ার্দ্র কি কঠিন হৃদয়, কি দুর্ব্বল, কি বলবান্, কি প্রণয়ী কি অপ্রণয়ী সকলেরই একবিধ জ্ঞান জন্মে। তাহাতেই জাতীয়তা, সমাজ ও ধর্ম্ম ভাবের উৎপত্তি হয়। বিশ্বাস না থাকিলে এ সকলের কিছুই হইতে পারে না, এজন্যই সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূলে ঈশ্বর বাক্যের বিদ্যমানতা আছে; ঐ ঈশ্বর বাক্য ও তাহাতে বিশ্বাসই ধর্ম্ম শাস্ত্রের মূল। বিশ্বাস না হইলে কোনও ধর্ম্মশাস্ত্র জন্মগ্রহণ করিত না। হিন্দু শাস্ত্রের মূলে বেদ ঈশ্বর প্রণীত, মুসলমান ধর্ম্মের মূলে কোরাণ ঈশ্বর প্রণীত এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের মূলে বাইবেল ঈশ্বর প্রণীত। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ঈশ্বর প্রণীত নয় বলিয়া উহাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র বলা যায় না; উহার স্থিতিও হইবে না। যদি রাজা রাম-মোহন রায় বেদান্তকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টি না করিতেন তাহা হইলে, আদৌ ঐ ধর্ম্মের উৎপত্তিই হইত না। বিজ্ঞবর কেশবচন্দ্র সেন উহা বুঝিতে পারিয়াই এক্ষণে তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ও তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা শ্রবণ করা যায়। তিনি সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা শ্রবণে করিয়া থাকেন বলিতেছেন। এবং তিনি ঈশা, মুসা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতিকে ঈশ্বরের প্রেরিত মহা-পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। সম্প্রতি আপনাকেও ঐরূপ মহা-পুরুষ বলিয়া পাকতঃ প্রচার করিতেছেন। এবিষয় আমরা ধর্ম্মপ্রবন্ধে আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। ফল,—বিশ্বাস ভিন্ন যে ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে পারে না তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের যদি ধর্ম্ম শাস্ত্রের ও জাতীয়তার প্রয়োজন থাকে তবে বিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যদি বিশ্বাস আমাদের একান্ত আবশ্যক হইল তবে কি আমরা জ্ঞান লাভ করিব না? জ্ঞান যখন বিশ্বাসের বিরোধী তখন বিশ্বাস রাখিতে গেলে জ্ঞান লাভ হয় না; এবং জ্ঞানলাভ হইলে বিশ্বাস থাকে না। আমি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি যুক্তি দ্বারা

তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে সে বিশ্বাস কি প্রকারে থাকিবে? সুতরাং বিশ্বাসকে রাখিতে হইলে জ্ঞান উপার্জ্জনে ক্ষান্ত হইতে হয়, যুক্তি ও বিচারকে এককালে পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে মানবের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? অধিক কি তাহা হইলে মানবের মানবত্বই থাকিবে না, কেননা উন্নতিই মানবের মানবত্ব এবং উন্নতি জ্ঞান সাপেক্ষ। মানবের জ্ঞানোন্নতি না হইলে মানব ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে?

এই [illegible] হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্য্য পণ্ডিতেরা জাতি ভেদ প্রথা [illegible]ত করিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিরোধ না [illegible] তাহার উপায় করিবার জন্য তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে, [illegible]ণগণ জ্ঞান উপার্জ্জন করিবেন অপর সকলে তাঁহাদের জ্ঞাত বিষয় বিশ্বাস করিবেন। তাহা হইলে সকলেই জ্ঞানের ফল লাভ করিবেন অথচ বিশ্বাসের উপকারিতা রহিয়া যাইবে। এই আর্য্য-জাতির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা উভয় কুল রক্ষা করিয়াছে। জাতিভেদ করণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সত্বসাম্য ও স্বাধীনতা।

অনেকে বলেন, ঈশ্বর সকল মানবকে সমান করিয়াছেন ও সকলকেই সমান স্বত্ব ও সমান অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহার বিপরীত প্রকাশ হইয়াছে। সুতরাং কোন্ কথা সত্য তাহা দেখা আবশ্যক। যাঁহারা এ সাম্য মতের সত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষ অসমত্বের কারণ স্বরূপে মানবের দোষের উল্লেখ করেন, অর্থাৎ তাঁহারা বলেন ঈশ্বর মানবকে যে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার

করাতেই মানবগণ পরস্পর অসম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর যে আমাদিগকে স্বাধীনতা দেন নাই তাহা ঈশ্বর প্রকরণে একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা ঐ সম্বন্ধে আরও বিতর্ক করিয়া দেখাইব যে মানবের স্বাধীনতা নিতান্ত অসম্ভব ও তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত।

স্বাধীনতা অর্থাৎ আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিবার সত্ব মানবের আদৌ থাকিতে পারেনা; মানব যখন পরস্পর সাপেক্ষ সামাজিক জীব তখন প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন ইচ্ছা[illegible] [illegible]র্য্য কি প্রকারে করিবে? তাহাকে পরের অর্থাৎ সমা[illegible] [illegible]রিতেই হইবে, তাহা না করিলে সমাজের [illegible] কেন? সমাজের মুখাপেক্ষা [illegible] [illegible]র্ণ স্বাধীনতা থাকিল কৈ? [illegible] [illegible]নতা থাকিত তাহা হইলে সকলেই ইচ্ছা- [illegible] [illegible]ত্ত হইতে পারিত, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইত না। কেননা যখন বলিতেছ সকল মানবই সমান শক্তি সম্পন্ন ও স্বাধীন তখন কেহ কাহারও কার্য্যে অনুমাত্রও বাধা প্রদান করিতে পারে না এবং তাহা হইলে সকলেই একরূপ কার্য্য করিবে। তাহা হইলে স্বাধীনতার অপব্যবহার আদৌ হইতেই পারেনা। কেননা যখন ঈশ্বর সকলকেই সমান শক্তি ও সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন, তখন ঐ সমান কারণে সকলেরই সমান রূপ কার্য্য হইবে। যদি মানব উহার অপ-ব্যবহার করে তবে সকলেই সমান রূপ অপব্যবহার করিবে। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ সমান কারণে অসমান কার্য্য হয় বলিতে হয়; কিন্তু তাহা যুক্তি, বিজ্ঞান ও মানব বুদ্ধির একান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু যখন দেখা যাই-তেছে মানবের অবস্থাগত বৈষম্য অত্যন্ত অধিক তখন হয় সকল মানব সম্পূর্ণ সমান নহে, না হয় সকল মানবের সমান স্বাধীনতা নাই। কেননা কার্য্য যখন সম্পূর্ণ অসমান তখন কারণ অসমান অবশ্য হইবে। সাম্য তত্ব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিচার করিলেও মানবের স্বাধীনতা না থাকাই প্রমাণ হয়। কেননা যখন দেখা যাইতেছে যে, যে বিষয় সম্পন্ন করিবার শক্তি মানবের নাই তাহা করিতেও যখন মানবের ইচ্ছা হয় তখন সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া কি

প্রকারে তাহার স্বাধীনতা রক্ষা হইবে? দেখা যাইতেছে মানব বৃদ্ধাবস্থাতেও মরিতে ও ক্ষণমাত্র দুঃখ পাইতেও অনিচ্ছুক, কিন্তু চিরজীবন ও চিরসুখ যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা বোধ হয় প্রমাণের আবশ্যক নাই। অধিক কি, যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে একের ইচ্ছা তৃপ্তি করিতে হইলে অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় তখন স্ব[illegible] বা ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য কোথায় রহিল? একটী রাজপদ, একটী [illegible] বিচারপতির পদ একজন ভিন্ন পাইতে পারে না, কিন্তু কত [illegible]নে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে। এইরূপ কার্য্য মাত্রেই বহু প্রার্থী হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্য অপেক্ষা প্রার্থীর সংখ্যা অধিক [illegible]ায় অধিক লোকের প্রার্থনা অপূরিত থাকে। সুতরাং অধিক লোকের স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। কোনও একটী স্ত্রী লাভের জন্য দশজন নিতান্ত ইচ্ছুক হইল, কিন্তু ঐ স্ত্রী একজন ভিন্ন ত দশজনের ইচ্ছা পূরণ করিতে পারে না, সুতরাং নয় জনের স্বাধীনতা রহিল না; কেন না উহারা ইচ্ছা মত স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিল না। মনে কর, রাম কমলিনীকে বিবাহ করিতে নিতান্তই ইচ্ছুক, কিন্তু কমলিনী হরিকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করে, রামকে নহে। এস্থানে রাম ও কমলিনী উভয়ের ইচ্ছা পূরণ কিরূপে হইবে? এরূপ সহস্র উদাহরণ নিত্য দেখা যায় যে একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতা নষ্ট হয়। যখন এরূপ অবস্থা তখন সকল মানবের স্বাধীনতা আছে, কি প্রকারে বলা যায়? প্রত্যুত এই সকল দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে মানবের স্বাধীনতা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। তাঁহার অভিপ্রেত হইলে মানব আদৌ অসঙ্গত ইচ্ছা করিত না এবং যাহা ইচ্ছা করিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। তবে যদি কেহ এরূপ বলেন, যে ইচ্ছা পূর্ণ হউক বা না হউক তাহা দেখিবার আমাদের আবশ্যক নাই, যে ব্যক্তি অন্যায় ইচ্ছা করিবে, সেই ব্যক্তিই সেই ইচ্ছা পূরণ না হওন জন্য কষ্ট পাইবে তাহাতে অন্যের কথা কহিবার অধিকার নাই, তাহার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে সে তাহা করিতে পারিবে। এই স্বত্ব মান-

বের আছে,—এইরূপ সত্ত্বের নামই স্বাধীনতা, ইচ্ছামত চলিতে পারার নাম স্বাধীনতা নহে। আধুনিক নব্যসমাজ স্বাধীনতার এইরূপ লক্ষণই করিয়া থাকেন বটে। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যেক মনুষ্য আপনি আপনার দায়ী, তাহার সুখ হউক দুঃখ হউক তাহারই হইবে, অন্যের তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সুতরাং তাহাতে কাহারও হস্তক্ষেপণ করিবার [illegible] শ্যক ও অধিকার নাই। যে কার্য্যে অপরের ক্ষতি হয় [illegible] কথা কহিতে পারে; আমাদের বোধ [illegible] পর হইতে পারেনা; কেননা [illegible] নাই যাহা অপরের সহিত এককালে [illegible] যাহা করিলে অপরের কিছুমাত্রও ক্ষতি বৃদ্ধি হয় [illegible] আহার, বিহার, ভ্রমণ, অবস্থান, দারপরিগ্রহ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই পরস্পর সাপেক্ষ। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে হইলে কতকগুলি কার্য্য অন্য নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে সকল কার্য্যই পরস্পর সাপেক্ষ বলি[illegible] বুঝা যাইবে। তথাপি যদি স্বীকার করা যায় যে কতকগুলি কার্য্য [illegible] ব্যক্তিগত আছে, কিন্তু তাহা হইলে কোন্ কার্য্য অন্য [illegible] ও কোন্ কার্য্য অন্য নিরপেক্ষ তাহা স্থির করা সুকঠিন [illegible] তরাং কোন্ কার্য্যে মানবের স্বাধীনতা আছে তাহা [illegible] রা দুষ্কর হয়। যদিও মানব কোন প্রকারে ব্যক্তিগত [illegible] সকল স্থির করিতে পারে, তথাপি কেবল মাত্র সেই গুলিতে স্বাধীনতা প্রয়োগ করিবার শক্তিকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যায় না; কেননা উহা স্বাধীনতার অতি সামান্য অংশ মাত্র। আমরা বলি ঐ সামান্য স্বাধীনতাও মানবের নাই। কেননা তাহা হইলে পাপ পুণ্য ও ভাল মন্দ বিচার থাকেনা। কারণ যদি ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকার স্বাধীনতা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে বিষয়ের স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন তদ্বিষয়ক ভাল মন্দ উভয়ই মানবকে করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন বলিতে হইবে। সুতরাং ভাল করিলে ভালফল বা মন্দ করিলে ক্ষতি হইবে না। কেননা যদি ভাল মন্দ কার্য্য

জন্য ভাল মন্দ ফল হইল, তবে আর মানবের স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? তাহা হইলেত মানব ভাল করিতেই বাধ্য হইল, সুতরাং তাহাতে মানবের স্বাধীনতা থাকিল না। যদি ভাল কার্য্যের ভাল ফল ও মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল না থাকিল, তাহা হইলেত বিচারই আবশ্যক থাকিল না; ভেদ ফুরাইয়া গেল। তাহা হইলে মানবের মানবত্ব দূরে পা ... পশুত্ব পর্য্যন্ত থাকেনা। এই সকল বিবেচনা করিলে স্প ... মানবের স্বাধীনতা নাই। ব্যক্তিগত ... তা, মা ... । আমরা পরে বুঝাইব ... চেষ্টা করিব যে সকল ... জগত।

এখন স্বাধীনতা মানবের নাই প্রমাণ ... মানবের সমত্ব ভঙ্গের কারণ হইতে পারেনা। যদি ... মানবেরই স্বাধীনতা আছে বলিতেছ, অপর জীব বা উদ্ভিদের না ; তবে পশ্বাদি পরস্পর অসম কেন? বৈষম্য কি কেবল মানবের মধ্যে না সমগ্র বিশ্ব বৈষম্যময়? যেদিকে দৃষ্টি কর সেই দিকেই বল বৈষম্য দৃষ্ট হয়। সংযোগ বৈষম্য, বিস্তৃতি বৈষম্য, বর্ণ ... শক্তি বৈষম্য, বিশ্ব কেবল বৈষম্যময়। আকাশ, বায়ু, আ... তাপ, জল, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর সকলই বিষম; নদী, পর্ব্বত, ..., মরুভূমি, সাগর, মহাসাগর সকলই বিষম; বৃক্ষ, লতা, কীট, ... মৎস্য, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী, মানব সকলই বিষম; বিশ্বের ... বিষম। আবার প্রত্যেক জাতীয় পদার্থ সকলও পরস্পর স...র্গ বিষম, কোনও একটীর সহিত আর একটীর সর্ব্বাবয়বে মিল আছে, এমত পদার্থ জগতে দৃষ্ট হয় না; অধিক কি যে যমজ সন্তানদ্বয় সর্ব্বাবয়বে সমান বোধ হওয়ায় পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া যায় না তাহাদেরই এত বৈষম্য যে ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক বৈষম্য না হইলে বিশ্ব রচনা হইতেই পারিতনা; তাহা হইলে এই বিশ্ব একইরূপ পদার্থে পরিপূর্ণ হইত। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থকে পৃথক বলিয়া চিনিবার উপায় কেবল বৈষম্য। সুতরাং বৈষম্য না থাকিলে পদার্থ সকল

সর্ব্বপ্রকারে এক রূপই হইত, চিনিবারও কোন উপায় থাকিত না। কিন্তু কেবল আকারে বিষম বলিলে নিস্তার পাওয়া যায় না, কেননা পদার্থ সকল যদি শক্তিতে সমান হয় তাহা হইলে এক পদার্থ হইতে অপর পদার্থকে পৃথক বলিয়া চিনিবার আবশ্যক থাকেনা; কারণ যখন কোনও একটী পদার্থ পাইলেই সমান কার্য্য সম্পন্ন হইবে তখন যে কোন পদার্থ পাইলেই চলে, চিনিয়া কোনও একটী লওয়ার আবশ্যক করেনা। আবার যখন সকল পদার্থের সমান শক্তি তখন জগতে উন্নতিই হইতে পারেনা, সমশক্তি বলে পদার্থ সকল চিরকাল একইরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু তাহা হইলে জগতে একটী মাত্র কার্য্য থাকে। বাস্তবিক সৃষ্টির প্রাক্কালে ও পলয়ের পরে ভিন্ন সাম্য বিরাজ করিতে পারেনা। সে সময় আকাশ ভিন্ন কিছুই থাকেনা সুতরাং সে অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলা যাইতে পারে। সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াই বৈষম্য জন্মিতে থাকে। তখন আকাশ হইতে বিষম বায়ু, তেজ, জল ও মৃত্তিকা জন্মে। তাহা হইতে ক্রমে প্রস্তর লৌহাদি জড় পদার্থ, বৃক্ষ লতাদি উদ্ভিদ, কীট পতঙ্গাদি ক্ষুদ্রপ্রাণী, পশু পক্ষ্যাদি ইতর জীব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্মিল। ক্রমেই বৈষম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মানব সভ্য হইয়া আরও বৈষম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। যে পদার্থ বা জাতি যত উন্নত বা সভ্য, সে পদার্থ বা জাতি তত পরস্পর অধিক বিষম। এক জাতীয় জড় পদার্থের বৈষম্য অতি অল্প, উদ্ভিদের বৈষম্য তাহা হইতে অধিক, পশু পক্ষ্যাদির বৈষম্য তাহা হইতেও অধিক, আবার অসভ্য মানবের বৈষম্য তাহা হইতেও অধিক, এবং উন্নত সভ্যজাতির বৈষম্য অত্যন্ত অধিক। জড়ের বৈষম্য বুঝিয়া উঠা ভার; লৌহখণ্ড সকল বা সুবর্ণখণ্ড সকল প্রায়ই একরূপ, উহা অপেক্ষা মিশ্রিত পদার্থের বৈষম্যের পরিমাণ অধিক; সেইজন্য মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতির অনেক বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মৃত্তিকা উর্ব্বরা, কোন মৃত্তিকা অনুর্ব্বরা, কোন বায়ু স্বাস্থ্যকর, কোন বায়ু প্রাণ নাশক ইত্যাদি বিবিধ গুণাবলম্বী হয়। উদ্ভিদের বৈষম্য উহাদিগের অপে-

কোও অধিক। আম্রবৃক্ষ সকল কত ভিন্ন প্রকার আম্রফল প্রদান করে। অপর বৃক্ষের ফলগত বৈষম্য যদিও আম্রের ন্যায় অধিক নয় বটে, কিন্তু সমস্ত বৃক্ষের ফল সকলেরই আকার ও স্বাদগত বৈষম্য আছে; তদ্ভিন্ন বৃক্ষের আকৃতি ও স্থায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে বৈষম্য আছে। জীবের বৈষম্য উদ্ভিদ্ হইতেও অধিক। এক জাতীয় জীবের মধ্যে কোনটী স্থূলাকার, কোনটী কৃশ, কোনটী সুন্দর, কোনটী ক[illegible] শান্ত, কোনটী উদ্ধত, এবং কোনটী দুর্ব্বল [illegible] অপরিমিত দুগ্ধ প্রদান ক[illegible] কোন গাভী [illegible] অশ্ব অতি [illegible] গমন করে, কোন অশ্ব নিতান্ত [illegible] হাদিগের হইতেও অনেক অধিক। কিন্তু অসভ্য [illegible] চত অধিক নহে। নিতান্ত অসভ্যজাতীয় নিতান্ত অক্ষমের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানের বৈষম্য, সভ্য জাতীয় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের বৈষম্যের সহিত তুলনায়, বৈষম্যই নয় বলিলেই হয়। কেননা অসভ্যজাতির বৈষম্য কেবল স্বাভাবিক শক্তি লইয়া। যিনি সর্ব্বা- [illegible] বলবান, তিনি সে জাতির রাজা; অপরের সহিত তাহার বৈষ[illegible] কেবল স্বাভাবিক শক্তিমাত্র লইয়া। আহার, বিহার, গৃহ, বেশ, [illegible] জ্ঞান সমস্তই প্রায় রাজা ও প্রজার সমান। কিন্তু সভ্যজাতির [illegible]ম্য কত দেখ। এ বিষয়ে আমরা সাম্যতত্ত্ব প্রচারকারী ইংরাজদিগের উদাহরণ গ্রহণ করিব। হিন্দুরা জাতিভেদ প্রথাদ্বারা বৈষম্য করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগের উদাহরণ গ্রহণে দোষ হইবে। ইংলণ্ডের একজন নিতান্ত দরিদ্র ও একজন লর্ড বংশীয় ধনীর সহিত তুলনা করিয়া দেখ, তাহাদের কত বৈষম্য। দরিদ্রের অন্ন নাই, গৃহ নাই, শীত নিবারণ বস্ত্র নাই, স্ত্রী নাই, বিদ্যা নাই, আবশ্যক কিছুই নাই; সে দিবারাত্রি ভয়ঙ্কর পরিশ্রম সহ অতি ঘৃণেয় কার্য্য করিয়া কোন প্রকারে যে জীবিকা অর্জ্জন করে তাহা মানবের যোগ্যই নয়; কেননা সে যাহা খায়, যেস্থানে বাস করে, যে বস্ত্র পরিধান করে, তাহা অতি জঘন্য ও শরীর পালন

শাস্ত্রমতে রোগ-নিদান। কিন্তু লর্ড ডনর কি অবস্থায় থাকেন দেখ। তাঁহার গৃহ ও গৃহসজ্জা দেখিলে ঐ দরিদ্রের চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, তাঁহার বেশ ও গাড়ি ঘোড়ার পারিপাট্য দেখিয়া সে নিস্তব্ধ হয় এবং তাঁহার বিদ্যা ও চিন্তা সকলের মর্ম্ম তাহার বুঝিবারই সামর্থ্য নাই। এত অধিক দেখিতে হইবে কেন, একজন কুলি বা একজন ডাক হরকরা মাসিক দশটাকা বেতন পায় আর একজন প্রধান বিচারক বা রাজপ্রতিনিধি লক্ষটাকা বেতন পাইয়া থাকেন। আর দেখ ঐ প্রধান বিচারপতির সহাধ্যায়ী একজন কেরাণিগিরি করিয়া কুড়িটাকা মাত্র বেতন পাইতেছে। একজন সেলর মদ্যপান ও নিতান্ত অসভ্যব্যবহার করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছে, আর কেহ বেকন, কেহ মিল, কেহ বিকন্‌স্‌ফিল্‌ড্‌ হইয়া অনন্ত জ্ঞান আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছে। এইরূপে দেখা যায় যে সভ্য দেশে মানবের বৈষম্য অতি প্রবল। এই সকল দেখিয়াই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া যতই উন্নতি হইতে থাকে ততই বৈষম্য বৃদ্ধি হয়। বৈষম্য বৃদ্ধিই উন্নতি ও সভ্যতা, বৈষম্যের অল্পতাই ধ্বংসের প্রাক্‌কাল এবং বৈষম্যই মানবের মানবত্ব। বাস্তবিক উন্নতিই যদি মানবের মানবত্ব হয়, তবে মানব যতই উন্নত হইবে, ততই অসভ্যের সহিত তাহার বৈষম্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেখ, অমুক বড় আমি ছোট, আমি উহার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা বড় হইব, অমুক উত্তম আহার, উত্তম স্থানে বাস ও উত্তমরূপে শীতাতপ নিবারণ করিতেছে, আমি উহার কিছুই পাইতেছি না, আমি উহার ন্যায় বা উহা অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকিব, এই ইচ্ছা হইতেই চেষ্টা হয় এবং সেই চেষ্টা হইতেই মানবের সভ্যতা ও উন্নতি। যদি সকলেই সমান রূপ শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে সকলেরই সমানরূপ সুখ দুঃখ হইত। সুতরাং কেহ কোন অভাব পূরণ জন্য চেষ্টা করিত না,—উন্নতিও হইত না; তাহা হইলে মানব পশ্বাদি হইতেও হীনভাবে চিরকাল অবস্থিত হইত। অতএব বৈষম্যের পরিমাণ যত

অল্প হয়, ততই অসভ্যত্ব, পশুত্ব ও জড়ত্ব এবং বৈষম্যের পরিমাণ যত অধিক হয় ততই মানবত্ব ও সভ্যতা।

আর এক কথা,—যদি সাম্যই ঈশ্বরের নিয়ম হয়, তাহা হইলে সকলেই সমান কাল জীবিত থাকিবে এবং সমানরূপ ভোজন ও সমানরূপ দার গ্রহণ ও পুত্রাদি উৎপাদন করিবে। কিন্তু তাহা করে না কেন? কেহ শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে ও কেহ জন্মমাত্র বা গর্ভমধ্যেই মৃত হয়, ইহার কারণ কি? মানবের যত স্বত্ব আছে তন্মধ্যে জীবনস্বত্বই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বলিতে হইবে। কেননা জীবনই সকল কার্য্যের মূল, কি আস্তিক কি নাস্তিক সকল মতেই জীবন সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। জীবন না থাকিলে সুখদুঃখ, উন্নতি অবনতি কিছুই থাকে না, ইহকাল কি পরকালের কিছুই হয় না। যখন সত্বই থাকিল না তখন কার্য্য কি প্রকারে হইবে? এমত মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় জীবন স্বত্বই যখন মানবের নাই তখন আর মানবের কি আছে? সমজীবন যদি প্রাকৃতিক নিয়ম হইত তাহা হইলে তাহার এত বৈষম্য হইত না। একদিনে ও ১৩০ বৎসরে বৈষম্য হইত না। মানবের দোষ যদি জীবন বৈষম্যের কারণ হইত তাহা হইলে কখন এত প্রভেদ হইত না। মানবের কি এত দুর্নিবার শক্তি আছে যে ঈশ্বরের নিয়মাবলী একবারে বিচ্ছিন্ন ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে? গর্ভমধ্যে থাকিয়াও মানব এত শক্তি প্রকাশ করিতে পারে? যদি তাহার এরূপ শক্তি থাকে, তাহা হইলেও তাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত; নতুবা তাঁহার বিরুদ্ধ এত প্রবল শক্তি একান্ত অসম্ভব। বাস্তবিক সমজীবন যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহা ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, পৃথিবীতে এত অকাল মৃত্যু রহিয়াছে, তথাপি মানবের আহার দ্রব্য সংকুলান হইতেছে না ও নিয়ত দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা মানব সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। যদি সকলে দীর্ঘজীবী হইয়া নিয়ম মত পুত্রাদি উৎপাদন করিত, তাহা হইলে কি প্রকারে সেই বহুসংখ্যক জীবের আহার দ্রব্য সংকুলান হইত ও কি রূপেই বা এই পৃথিবীতে তাহাদের স্থান

হইত? যখন ঈশ্বর জীব সংস্থিতি ও আহারীয় উৎপাদনের যথেষ্ট স্থান ব্যবস্থা করেন নাই তখন সমজীবন ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? মিলুথস্ এ বিষয় সুন্দররূপ বিবৃত করিয়াছেন, এজন্য এবিষয় সম্বন্ধে আর অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই। আর্য্যপণ্ডিতেরা এই সকল বিবেচনা করিয়াই বলিয়াছেন যে, ব্যক্তিবিশেষের আয়ুঃ স্বতন্ত্র; যাহার যে আয়ুঃ সেই কাল পূর্ণ হইলে তাহাকে মরি[illegible] কেহ তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। [illegible] যাহার যেরূপ জীবনীশক্তি সে তদনু[illegible]।

[illegible] ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয় তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে, এ জগতে রাজা, মন্ত্রী, কৃষক, শ্রমজীবী, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, তন্তুবায়, সূত্রধর, রজক, মিস্ত্রি, ধাঙ্গড়, মেথর, মুদ্দফরাস প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন, উহার কোন একশ্রেণী মাত্র লোকের দ্বারা জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং উক্তরূপ মানবের নানা অবস্থা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আর সাম্য থাকিল কৈ? রাজার প্রজায়, কৃষকে মেথরে কিরূপে সমান হইবে? এই সকল কথার উত্তরে সাম্যবাদীরা বলিতে পারেন যে, সম্পূর্ণ সাম্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হউক কিন্তু অবস্থাগত সাম্যভাব সকলেরই হওয়া উচিত, অর্থাৎ সকল ব্যক্তির সমানরূপ ভোজন, সমানরূপ স্থানে বাস, সমানরূপ জ্ঞানোপার্জ্জন ইত্যাদি করা নিতান্ত উচিত ও তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বিজ্ঞানের মস্তকে পদাঘাত করেন। কেননা যখন প্রমাণ হইল যে সমস্ত মানবের উপাদান পদার্থ সমান নহে, তখন মানবের কার্য্য সকল সমান কি প্রকারে হইবে? উপাদান পদার্থ সমান না হইয়া কার্য্য সমান হইলে বিষম পদার্থের শক্তি প্রকাশ সমান বলিতে হয়, কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। লৌহের ন্যায় প্রস্তর কঠিন হইবে, না সুবর্ণের ন্যায় পিত্তল উজ্জ্বল হইবে; কাচের ন্যায় মৃত্তিকা মসৃণ হইবে, না অগ্নির ন্যায় জল উষ্ণ হইবে? বলবান

যেরূপ প্রভুত্ব করিবে, দুর্ব্বল কি সেইরূপ প্রভুত্ব লাভ করিবে? না সুন্দর পুরুষ যেরূপ প্রিয় দর্শন হইবে, কদাকার পুরুষও সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইবে? বুদ্ধিমান যেরূপ বিদ্যালাভ করিবে, নির্ব্বোধ কি সেইরূপ বিদ্যালাভ করিবে? না কবি, সুকণ্ঠী ও চিত্রকর যেরূপ কবিতা, সংগীত ও চিত্রদ্বারা লোকের মনোহরণ করিবে, ঐ সকলে অপটুও সেইরূপ লোক-মনো[illegible]ণ করিতে পারিবে? তাহা যদি না পারিল তবে বলবান ও [illegible]প ও কুৎসিত, বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ এবং কবি ও অকবি কিরূপে [illegible]পার্জ্জন করিবে? উপার্জ্জন সমান না হইলে অবস্থাই বা সমান হই[illegible]এব, সাম্যবাদী-দিগের অবস্থাসাম্য বাদ নিতান্ত অসার। এই সকল [illegible]রূপ বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে বৈষম্যই ঈশ্বরের নিয়ম, তজ্জন্যই পদার্থ সকল বিষম উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে এরূপ হইলে অক্ষমের স্থান পৃথিবীতে হয় না; কেন না যখন প্রমাণিত হইল যে কাহারও স্বাধীনতা নাই ও সকল মানবের সমান হইবার অধিকার নাই, তখন ইহাই বলা হইল যে বলবান নিয়ত দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, ও দুর্ব্বলের সমস্ত স্বত্ব অপহরণ করিবে। আমরা বলি তাহা নহে; কেননা মানবের স্বাধীনতা ও সাম্য নাই বলিয়া যে মানব যথেচ্ছাচারী হইতে পারে তাহা নহে, বরং মানব যে যথেচ্ছাচারী হইতে পারেনা তাহাই উহাদ্বারা বুঝা যাইতেছে। কেননা আমরা যাহা বলিয়াছি তাহার মর্ম্ম এই যে মানব যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেপারেনা, অর্থাৎ যাহার যে শক্তি সে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারেনা; সুতরাং সকলেই রাজা বা সকলেই কুবের বা সকলেই আর্য্যভট্ট হইতে পারেনা। শক্তি অনুসারে কেহ রাজা, কেহ প্রজা, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্খ হয়েন। প্রজা শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির রাজা হইবার শক্তি ও অধিকার নাই বটে, কিন্তু তাহার প্রজা হইবার শক্তি ও অধিকার আছে। রাজা বা অন্য কেহ তাহার সে শক্তির বিরোধাচরণ করিতে পারেন না। ঈশ্বর সকলকে

সমান শক্তি দেন নাই বটে, কিন্তু যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করার অধিকার তাহার আছে। তাহাই তাহার স্বাধীনতা। কর্ত্তব্য প্রকরণে এ বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করা যাইবে।

সর্ব্বশেষে সাম্যবাদীরা এই আপত্তি করিতে পারেন যে যদি ঈশ্বর মানবকে সমস্বত্ব না দিয়া থাকেন বলাযায়, তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরের এই কলঙ্ক মোচনের জন্যই সাম্যতত্ত্বের কল্পনা হইয়াছে। এ আপত্তি অতি অকিঞ্চিৎকর, কেননা যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে জগৎ বৈষম্যময়, বৈষম্য ভিন্ন জগৎকার্য্য চলিতে পারেনা তখন কেবলমাত্র ঈশ্বরের সমদর্শিত্ব রক্ষা-জন্য, এই প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যাইতে পারেনা, তথাপি আমরা দেখাইতেছি যে ইহাতে ঈশ্বরের পক্ষপাতিতা নাই। কেননা যদিও মানবের অবস্থাগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানসিক সুখ প্রায় সকলেরই সমান। বরং রাজার অপেক্ষা কৃষকের মনের সুখ অধিক। বিষ্ঠাবাহী মেথরও মনোসুখে কোন প্রকারে অন্য হইতে হীন নহে। ঈশ্বর আমাদিগকে এমন করিয়াছেন যে আমরা যে অবস্থায় থাকি তাহাতেই প্রায় সমান সুখ পাই; অর্থাৎ সুখ দুঃখ রাজারও যেমন প্রজারও সেইরূপ। রাজা অট্টালিকাবাসে ও লক্ষাধিপতি হইয়া যেরূপ সুখী হয়েন ও আশা মিটাইতে পারেননা, প্রজা কুটীরে বাস ও শতাধিপ হইয়াও সেইরূপ সুখ লাভ করে ও আশার অধীন থাকে। এইজন্য শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন—

> ইন্দ্রস্যা শুচি শূকরস্যচ সুখে দুঃখে চ নাস্ত্যন্তরং।
> স্বেচ্ছা কল্পনয়া তয়োঃ খলু সুধা বিষ্ঠাচ কাম্যাশনং॥
> রম্ভা চাশুচি শূকরীচ পরম প্রেমাস্পদং মৃত্যুতঃ।
> সংত্রাসোপি সমঃ স্বকর্ম্ম মতিভিশ্চান্যোন্য ভাবঃ সমঃ।

ইন্দ্র ও শূকরের সুখ দুঃখে ভেদ নাই, কেননা না ইচ্ছা পূর্ব্বক ইন্দ্র অমৃত ও শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে; ইন্দ্রের রম্ভা ও শূকরের শূকরী সমানই প্রেমাস্পদ এবং মৃত্যুকে উভয়েই সমান ভয় করে।

তবে ভাল অবস্থা হইতে মন্দ অবস্থায় পড়িলে অনেক কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শেষে তাহাও থাকেনা। এবিষয় জাতিভেদ প্রকরণে বিবরণ করা যাইবে।

অ[illegible] পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্য নিরূপণের উপা[illegible]

মানবের স্বত্বার যে সকল প্রয়োজন তন্মধ্যে কার্য[illegible] এমন কি কার্য্যই মানবের সর্ব্বস্ব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কেননা মানবের উন্নতি, অবনতি, সুখ, দুঃখ, স্বর্গ, নরক, মান, অপমান, পাপ, পুণ্য সমস্তই কার্য্যগত। আমরা যে ঈশ্বর-তত্বকে জীবনের লক্ষ্য বিবেচনা করি, যে বিজ্ঞানদর্শন প্রভৃতিকে মানবের মানবত্ব সম্পাদনের মূল বলি, যে শিক্ষা ও নীতিকে মানবের দেবত্বের কারণ বলি, তৎসমস্তই কার্য্য লইয়া। কেবল মানব কেন, সমস্ত জীব ও পদার্থেরই চরম উদ্দেশ্য কার্য্য। কার্য্য হইতেই মানবের মানবত্ব, পশুর পশুত্ব ও জড়ের জড়ত্ব। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলিয়াছেন, এইজন্য শিহ্লন মিশ্র ঈশ্বর ও দেবতাদিগকে বাদ দিয়া কর্ম্মকেই প্রণাম করিয়াছেন, এবং এইজন্য বৈয়াকরণগণ ক্রিয়া ভিন্ন বাক্য সম্পন্ন হয় না বলিয়াছেন। অতএব আমাদের কার্য্য নিরূপণ করাই আমাদের প্রধান কার্য্য, কেবল ঈশ্বর বা বিশ্বের আদি নিরূপণ করিলে চলিবেনা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঈশ্বর নিরূপণের চেষ্টাও আমাদের কার্য্য জন্য এবং ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ তাহাও কার্য্য জন্য; কেননা তিনি সদসৎ কার্য্যের ফল প্রদান করেন। যদি তাহাই হইল তবে আমাদের কার্য্য নিরূপণ না করিয়া কেবল ঈশ্বর নিরূপণ করিলে কি ফল? মনে কর ঈশ্বর

আস্তিত্ব জানিলাম এবং তাঁহার স্বরূপও অবগত হইলাম, কিন্তু আমাদের কার্য্য কি জানিলাম না, তাহাতে ফল কি? এই জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলে যেরূপ ঈশ্বর নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও তাহাতে নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সকলে সে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে প্রকৃত ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন না, সুতরাং তল্লিখিত কার্য্য ব্যবস্থাও ঈশ্বরানুমোদিত নহে বলিয়া থাকেন। এক্ষণে যে সকল নব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব মাত্র প্রচারিত হইয়াছে; কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি অথবা ঈশ্বরের আদেশ কি তাহার উল্লেখ তাহাতে নাই। এই জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মকে আপন আপন যুক্তি অনুসারে কার্য্য স্থির করিতে হয়; কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের দৃঢ় কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে কার্য্যই আমাদের সর্ব্বস্ব; কার্য্য জ্ঞান না হইলে কেবল ঈশ্বর জ্ঞানে কোন ফল নাই। অতএব আমাদের উপায় কি? কিরূপে আমরা কার্য্য নিরূপণ করিব? উক্ত নব ধর্ম্মাবলম্বীগণ যুক্তিকেই ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে. ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে বৃত্তি বিশেষ দিয়াছেন. সেই বৃত্তি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে উপদেশক স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া.কর্ত্তব্যর উপদেশ দিয়া থাকেন। ঐ বৃত্তিকে ইংরাজিতে (conscience) বলে; বাঙ্গালায় উহার প্রকৃত নাম মিলেনা, এজন্য কেহ উহাকে অন্তঃসংজ্ঞা, কেহ হিতাহিত জ্ঞান ও কেহ বিবেকও বলিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন হিতাহিত জ্ঞান সর্ব্বদাই আমাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয়, ঐ বৃত্তির অনুমোদিত কার্য্যের নাম সৎকার্য্য ও ঐ বৃত্তির অননুমোদিত কার্য্যের নাম অসৎ কার্য্য। কিন্তু আমরা ঈশ্বর প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে, আমাদিগকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেয় এমন কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই, এবং জ্ঞানপ্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি যে আমাদের সহজ কোন জ্ঞান নাই। এক্ষণে সে কথা আমরা আরও বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে কর্ত্তব্য কি অর্থাৎ তাহার লক্ষণ কি জানা আবশ্যক।

নচেৎ আমাদের হৃদয় যাহা বলিয়া দেয় তাহা প্রকৃতকর্ত্তব্য কিম্বা কি প্রকারে তাহার পরীক্ষা হইবে? যদি হিতাহিত জ্ঞান যাহা বলিয়া দেয় তাহারই নাম কর্ত্তব্য হয়, অর্থাৎ তাহাই কর্ত্তব্যের লক্ষণ হয় ও কর্ত্তব্যের অন্য লক্ষণ না থাকে, তবে যাহার হৃদয় যাহা বলে তাহাই কর্ত্তব্য হইবে। তাহা হইলে কার্য্য মাত্রই কর্ত্তব্য হইবে, অকর্ত্তব্য কিছুই থাকিবে না। কেমনা লোকে যাহা করে সমস্তই ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকে। তবে যদি কেহ বলেন, মানব ইচ্ছা পূর্ব্বক যে দুষ্কর্ম্ম করে তাহা তাহার হিতাহিত জ্ঞানানুমোদিত নহে, হিতাহিত জ্ঞানের বিরুদ্ধাচারী হইয়া সে ঐ কার্য্য করে এবং তাহাতেই ঐ কার্য্য জন্য মনস্তাপ পায়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে সহস্র সহস্র দুষ্কার্য্য মানব নিতান্ত মনের সহিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, আবার অতি সৎকার্য্য করিয়াও অনেকে মনস্তাপ পায়। মুসলমানেরা কাফের বধ, শাক্তেরা নর পশু বলি, ও হিন্দুরা সতী দাহ করিয়া আত্ম প্রসাদ লাভ করে; এবং অনেকে কেন পরের উপকার করিতে গিয়া দরিদ্র হইলাম, পরের প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া ভগ্ন-পদ হইলাম, দেশের জন্য প্রাণ হারাইলাম ইত্যাদি বলিয়া মনস্তাপ করিয়া থাকে। এবম্বিধ লক্ষ লক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, যে যদ্দারা বুঝা যায় যে অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ও অতি সৎকার্য্য করিয়াও আত্মগ্লানি জন্মে। অতএব যে কার্য্য করিলে আত্মপ্রসাদ জন্মে তাহা হিতাহিত জ্ঞানের অনুমোদিত ও কর্ত্তব্য এবং যে কার্য্য করিলে মনস্তাপ জন্মে তাহাই হিতাহিত জ্ঞানের অননুমোদিত ও অকর্ত্তব্য এ কথা বলা যায় না। বিশেষতঃ হিতাহিত জ্ঞান বা আন্তরিক কোন শক্তি যে আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত ও অসৎকার্য্য হইতে বিরত করিতেছে না, তাহা আমরা পদে পদে দেখিতেছি। কেন না দেখিতেছি কুদ্রব্য ভক্ষণে বা অধিক ভক্ষণে পীড়া বা প্রাণের হানি হয়। কিন্তু কোন্ দ্রব্য কু অর্থাৎ আমাদের অপকারক বা প্রাণ হানি কর তাহা হিতাহিত জ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দেয় না। শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত

পর্য্যবেক্ষণ কর, কোনও সময়েই হিতাহিত জ্ঞানের কার্য্য লক্ষিত হইবে না, সকল কার্য্যই পরীক্ষা সিদ্ধ বলিয়া বুঝা যাইবে। শিশুরা অগ্নিতে হাত দেয়, সর্পের সহিত ক্রীড়া করে, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যায়, বিষ্ঠা, মূত্র, বিষ প্রভৃতি যাহা পায় তাহাই খায়, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করে, স্মুবর্ণ দিয়া কাচ লয়, যাহা অহিতকর তাহাই করে। হিতাহিত জ্ঞান যদি সহজ হইবে তবে বালকেরা এরূপ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কেন? কেন হিতাহিত জ্ঞান শিশুদিগকে ঐ সকল ভয়ানক অহিতকর কার্য্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত করে না? বালক যত বড় হইতে থাকে তত বিষ্ঠা প্রভৃতি ভোজন ও অগ্নি আদিতে হস্ত দেওয়ায় ক্ষান্ত হয় বটে, কিন্তু যাহার অনিষ্টকারিতা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারে বা শাসনাধীন থাকায় যাহা করিতে অক্ষম হয় তাহাই মাত্র পরিত্যাগ করে, প্রকৃত হিতানুষ্ঠায়ী হয় না। তাহারা বিদ্যা শিক্ষায় নিতান্ত অনিচ্ছুক হয়, আহারে নিয়ত রত থাকে, পীড়া হইলেও প্রাণান্তকর দ্রব্য ভক্ষণে অনুরক্ত থাকে, অতি শিশুকাল হইতে যে পশু পক্ষী কীটাদি হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ অনুরক্ত হয়। পরে যৌবনকাল আগত হইলে তাহারা, ইন্দ্রিয়পর হয়, নরহত্যা, বেশ্যারতি, অর্থনাশ প্রভৃতি কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ভ্রমেও আত্মহিত চিন্তা করে না। তবে যদি বাল্যকাল হইতে পিতা মাতার যত্নে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্যে নিরত হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে হিতাহিত জ্ঞানের আজ্ঞা কি প্রকারে বলিব? কেননা যে ব্যক্তি যেরূপ শিক্ষা পায় সে ব্যক্তি সেইরূপ কার্য্য করে। এই জন্য হিন্দু যুবা এক রূপ কার্য্য করে, ইংরাজ যুবা অন্য রূপ কার্য্য করে এবং যবন যুবা আর একরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। এই জন্য হিন্দুরা যে সতীদাহ, প্রতিমা পূজা, জাতিভেদ প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য বলেন, ইংরাজেরা তাহাকে নিতান্ত গর্হিত মনে করিয়া থাকেন; এবং ইংরাজেরা যে বিধবা বিবাহ, মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য বলেন, হিন্দুরা তাহাকে নিতান্ত অকর্ত্তব্য

বলিয়া থাকেন। যদি হিতাহিত জ্ঞান হিতাহিত জ্ঞানের কারণ হইত তাহা হইলে কি হিতাহিত সম্বন্ধে এবম্বিধ মত পার্থক্য হইত? কখনই না। অতএব যদি হিতাহিত জ্ঞান বাল্যকালে প্রকাশ হইল না ও যৌবনে শিক্ষার অধীন হইল, তবে আর কোন্ সময়ে কার্য্যকর হইবে? বিশেষতঃ আমরা যখন কোনও কার্য্য-সন্ধিস্থলে পতিত হইয়া নিতান্ত নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করি অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানের নিকট বারম্বার জিজ্ঞাসা করি, যে, এ সময়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি বলিয়া দেও, তখনও হিতাহিত জ্ঞান আমাদিগকে কোন হিত পরামর্শ দেন না। কেননা অনেক সময়ে দেখা যায় যে মনুষ্যেরা কোনও একটী কার্য্য করে কিনা কিম্বা কোন্ কার্য্য অবলম্বন করে ইহার চিন্তা ২। ৪ দিন বা ৫। ৬ মাস পর্য্যন্ত করিয়া থাকে অর্থাৎ ঐ কার্য্যের জন্য হিতাহিত জ্ঞানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু তথাচ হিতাহিত জ্ঞানকে কোনও হিতোপদেশ দিতে দেখা যায় না। কেন না এত চিন্তা করিয়া মনুষ্য যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাতেও তাহার অমঙ্গল হইয়া থাকে, এমন কি তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া পড়ে। এই জন্য অনেকের মত এই যে, কোন কার্য্য করিবার সময় অধিক চিন্তা করা যুক্তিযুক্ত নহে। কেননা অনেক সময়ে হিতাহিত-জ্ঞান নিরপেক্ষের মঙ্গল হইতে দেখা গিয়া থাকে অর্থাৎ অনেকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বড় লোক হয়; অনেকে বিদ্যা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কুকর্ম্মে রত হয়, শেষে ঐ কুকর্ম্মের সহায়তা জন্য অর্থ আবশ্যক হওয়ায় অতি সামান্য ও হীন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিপুল অর্থোপার্জ্জন করে ও ক্রমে ধর্ম্মশীল পর্য্যন্ত হয়। অতএব হিতাহিত জ্ঞান বা তদ্রূপ কোন বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে নাই। সুতরাং হৃদয়স্থ বৃত্তিবিশেষের অনুমোদিত কার্য্যকে কর্ত্তব্য বলা যায় না। আমরা কর্ত্তব্যের প্রকৃত লক্ষণ করিবার চেষ্টা করিব।

কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহার যে মত ভেদ থাকুক, এক বিষয়ে অর্থাৎ মূল বিষয়ে সকলেরই মত এক অর্থাৎ ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের

ধ্যায় যে কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। ঈশ্বরাজ্ঞা নিরূপণ কিংপ্রকারে করিতে হইবে তাহা লইয়াই সমস্ত মতভেদ। আর এক বিষয়েও সকলের ঐকমত্য দেখা যায়, অর্থাৎ সকলেই বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর তাঁহার আজ্ঞা অর্থাৎ কর্ত্তব্য সকলের উপদেশ নিজে করিয়াছেন, নিজে না বলিয়া দিলে মানব স্বশক্তিতে কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিত না। ইহার মধ্যে কেহ বলেন তিনি গ্রন্থ প্রদান করিয়া, কেহ বলেন প্রত্যাদেশ দ্বারা, কেহ বলেন মহাপুরুষ প্রেরণ দ্বারা ও কেহ বলেন হৃদয়স্থ বৃত্তি বিশেষ দ্বারা আমাদিগকে কর্ত্তব্যের উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত বলিতে হইবেক যে, যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঈশ্বর আমাদিগকে কোনও প্রকারে বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রমাণ হইল যে ধর্ম্ম শাস্ত্রের লিখিত ব্যবস্থা তাঁহার নহে এবং হিতাহিত জ্ঞান বা তদনুযায়ী কোনও শক্তি তিনি আমাদের হৃদয়ে দেন নাই। তবে কি প্রকারে তিনি আমাদিগকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন? এস্থলে আমরা জিজ্ঞাসা করি কর্ত্তব্য কি কেবল মানবেরই আছে, অপর কোন পদার্থের কি কর্ত্তব্য নাই? অনেকে এইরূপই বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁহাদের একথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের নাম যদি কর্ত্তব্য হয়, তখন অপর জীবের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞা অর্থাৎ নিয়ম নাই একথা কতদূর সঙ্গত? এবং তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি ও স্থিতিইবা হইল কি প্রকারে? অতএব অন্য পদার্থের কর্ত্তব্য নাই বলা নিতান্ত অসঙ্গত। যখন শক্তি প্রকাশের নাম কার্য্য ও যখন পদার্থ মাত্রেরই শক্তি আছে তখন ঈশ্বর যে পদার্থের যে শক্তি দিয়াছেন তাহাই প্রকাশ করা যে তাহার কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব পদার্থমাত্রেরই কার্য্য আছে বলিতে হইবে। কাহার কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত তাহা সেই পদার্থের শক্তি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। কেননা যে পদার্থ দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদন ঈশ্বরের অভিপ্রেত

সেই পদার্থে সেইরূপ শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব অনুরূপ শক্তি প্রকাশের নাম কর্ত্তব্য। লৌহ আকর্ষণ করা চুম্বকের শক্তি সুতরাং লৌহাকর্ষণ চুম্বকের কার্য্য ও কর্ত্তব্য; মাংসাসী জীবের মাংস ভক্ষণ ও জীবনাশ করিবার শক্তি আছে—আহার জন্য প্রাণীনাশ করা তাহার কার্য্য ও কর্ত্তব্য। এইরূপ ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি প্রকাশ করাই তাহার কর্ত্তব্য। নতুবা ঈশ্বর পদার্থ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দিয়াছেন তাহার কারণ কি? শক্তির অনুরূপ কার্য্য করানই যে তাঁহার অভিপ্রায় তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানবের কর্ত্তব্যও ঐরূপ অর্থাৎ ঈশ্বর মানবকে যে শক্তি দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা অর্থাৎ সেই শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করা মানবের কর্ত্তব্য। ঈশ্বরদত্ত শক্তি কখনও নিরর্থক নহে। ইহাতে অনেকে এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে শক্তি প্রকাশই যদি কর্ত্তব্য হইল তবেত আর অকর্ত্তব্য কিছুই থাকিলনা। কেননা যে যে কার্য্য করে তৎসমস্তই শক্তির অধীন হইয়া করিয়া থাকে। আমরা বলি তাহা নহে। আমরা বলি মানবগণ আত্মশক্তির পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে শক্তির অননুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করে ও তজ্জন্যই কার্য্য ও কর্ত্তব্যের প্রভেদ হইয়াছে, নতুবা কার্য্য ও কর্ত্তব্য একই কথা। যথাশক্তিজাত কার্য্য কর্ত্তব্য ও অযথাশক্তিজাত কার্য্য অকর্ত্তব্য।

পশ্বাদিরাও যে কর্ত্তব্য রত হইয়া থাকে প্রথমে তাহাই দেখান যাইতেছে। প্রাণীবধে ব্যাঘ্রের শক্তি আছে সুতরাং নরবধেও তাহার শক্তি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানব সমাজে আসিয়া মানব বধ করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই জন্য ব্যাঘ্র গ্রাম নগরাদিতে প্রবেশ করে না। যদি কোনও ব্যাঘ্র নিতান্ত লোভ পরবশ হইয়া গ্রামে প্রবেশ করে তবে সে কত দূর সাবধান হইয়া চলে; কেননা সে জানে যে, সে তাহার শক্তির অতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং বিশেষ সাবধান না হইলে তাহাকে এই অকর্ত্তব্য কার্য্য জন্য বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইবে।

শৃগালের প্রাণীবধ করিবার শক্তি আছে কিন্তু দুর্ব্বল বিধায় সকল প্রাণী বধ করিবার শক্তি তাহার নাই, তজ্জন্য সে প্রবলতর প্রাণী আক্রমণের চেষ্টা করে না। মানব মধ্যে কখনও অতি সাবধানে শিশু হরণ করে বটে কিন্তু বুঝিতে পারে যে সে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছে, এবং সেই জন্য বিশেষ সাবধান হয়। কিন্তু ক্ষিপ্ত শৃগাল সকল মনুষ্যকেই আক্রমণ করে, কেননা সে জ্ঞান শূন্য অর্থাৎ কর্ত্তব্য বিষয়ে তাহার জ্ঞান নাই। গো মহিষাদির উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করিবার শক্তি আছে কিন্তু কোনও মানবের অধিকৃত উদ্ভিজ্জ লইবার শক্তি তাহার নাই, এজন্য তাহারা যখন কোন শস্য ক্ষেত্রে গমন করে তখন অতি সাবধানে থাকে, মানবের শব্দ পাইলেই পলায়ন করে। বিড়াল পরিত্যক্ত মৎস্য কণ্টকাদি ভক্ষণ করে, ভোজন পাত্র হইতে কিছু লইবার শক্তি তাহাদের নাই। যদি লোভ পরবশ হইয়া ভোজন পাত্র হইতে কিছু লইতে যায় তবে এমন ভাবে লইয়া পলায়ন করে যে তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, সে অন্যায় বা শক্তির অতীত কার্য্য করিতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। এ সকল দ্বারা কি বুঝা যাইতেছে না, যে পশ্বাদিরও কর্ত্তব্য আছে ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করা তাহাদের আবশ্যকও বটে। ব্যাঘ্র যদি বিবেচনা না করে যে তাহার মানব সমাজে যাওয়া উচিত নয়, শৃগাল যদি বিবেচনা না করে যে তাহার মানবাদি আক্রমণ করা উচিত নয়, এবং গো মহিষাদি যদি বিবেচনা না করে যে তাহাদের মানবের শস্যক্ষেত্রে যাওয়া অকর্ত্তব্য, তাহা হইলে কি তাহাদের ও মানবের সমূহ বিপদের কারণ হয় না? বাস্তবিক পশ্বাদি যদি কর্ত্তব্যপর না হইত, তাহা হইলে পৃথিবী ভয়ানক স্থান হইত সন্দেহ নাই। তাহা হইলে হয় ইতর জীব না হয় মনুষ্য ইহার একের লোপ হইত। আমরা জিজ্ঞাসা করি হিতাহিত জ্ঞানই যদি কর্ত্তব্য দেখাইয়া দিবার কারণ হয় এবং যদি পশ্বাদির হিতাহিত জ্ঞান না থাকে তবে তাহারা কর্ত্তব্য নিরূপণ কি প্রকারে করে? তাহা হইলে হয় বলিতে হইবে যে, সকল জীবের হিতা-

হিত জ্ঞান (Conscience) আছে, না হয় বলিতে হইবে যে হিতা, হিত জ্ঞান কর্ত্তব্য নির্ণয়ের কারন নহে। ইহার উত্তরে হয়ত অনেকে বলিবেন যে, পশুদিগের স্বাভাবিক যে ভয় আছে সেই ভয়ের অধীন হইয়াই তাহারা শক্তির অতীত কার্য্য করিতে বিরত হয়, হিতাহিত জ্ঞান তাহাদের কর্ত্তব্য নির্ণয়ের কারণ নহে। তাহা হইলে আমরা বলিব যে মানবও যে কর্ত্তব্যরত হয় তাহারও কারণ ভয়। কেননা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মানবগণ হয় পরকাল ভয়ে নয় সমাজ বা রাজ ভয়ে অথবা আপনার অহিত ভয়ে কর্ত্তব্য নিরত হইয়া থাকে। ভয় ব্যতিরেকে কোন কারণেই মানব কর্ত্তব্য পালনে রত হয় না। বিশেষতঃ ভয় জ্ঞান হইতে জন্মে। অনিষ্ট হইবে এ জ্ঞান না জন্মিলে কখন ভয় হয় না। এজন্য শিশুরা সর্প লইয়া খেলা করিতে ভয় করে না; গো মহিষাদি মানব দ্বারা অনিষ্ট হইবে এ জ্ঞান যত দিন লাভ না করে ততদিন শস্যক্ষেত্রে যাইতে ভয় করে না। অতএব মানব ও পশু একই নিয়মের অধীন হইয়া কর্ত্তব্য নিরত হয়। প্রভেদ এই যে মানব বহুশক্তি সম্পন্ন এই জন্য তাহার কার্য্য অনেক, পশ্বাদি ইতর প্রাণীদেহে শক্তি অল্প তজ্জন্য তাহাদের কার্য্য অল্প।

যাহার যে শক্তি আছে তাহা অবাধে প্রকাশ করিতে পারাকে স্বাধীনতা বলে; স্বাধীনতা চরিতার্থের অপর নাম সুখ। শক্তি প্রকাশের পূর্ব্বভাবের নাম ইচ্ছা। সুতরাং দেখা যাইতেছে ইচ্ছা পূরণ বা সুখই মানবের উদ্দেশ্য। সুখ সাধন হইলেই মানবের তৃপ্তি হয়। কিন্তু যখন বহু যন্ত্রসংযোগে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন মানবে নানা প্রকার শক্তিনিহিত আছে বলিতে হইবে। যত প্রকার শক্তি মানবে আছে, তৎসমুদায়েরই শক্তি প্রকাশ করিতে পারিলে মানব সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইতে পারে, এবং তাহা হইলেই তাহার সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য করা হইল। কিন্তু তদন্তর্গত শক্তি সকলের কতকগুলি এরূপ পরস্পরবিরোধী যে একের তৃপ্তি সাধন করিতে হইলে অপ-রের বিরোধাচরণ করা হয়; সুতরাং এক বিষয়ে সুখী ও কর্ত্তব্যপর

হইতে হইলে অপর বিষয়ে অসুখী ও কর্ত্তব্যবিরত হইতে হয়, এবং মনুষ্য সকল পরস্পর সমধর্ম্মী প্রযুক্ত একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা হয়। সুতরাং একের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গেলে অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু যখন প্রত্যেক মনুষ্য ও প্রত্যেক শক্তি বিশ্বের কার্য্য সাধন জন্য নিযুক্ত, একটীও বৃথা স্থষ্ট নয়, তখন কাহারও স্বাধীনতা নষ্ট করা কখন উদ্দেশ্য হইতে পারে না; আবার যখন একের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে অপরের শক্তি প্রকাশের বাধা জন্মে, তখন সকলের সামঞ্জস্য ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। এক শক্তি উদর-পূরণে ব্যস্ত, অপর শক্তি শরীর রক্ষণে নিযুক্ত, অতএব ঐরূপ দ্রব্য এরূপ পরিমাণে ভোজন করিতে হইবে যে অধিক বা কুদ্রব্য ভক্ষণে শরীর নষ্ট না হয়। এই প্রকারে নিজের ও পরস্পরের শক্তি সকলের সামঞ্জস্য করাই বিশ্ব নিয়মের উদ্দেশ্য, সুতরাং কর্ত্তব্য। অতএব আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি-লাম যে, আমাদের কর্ত্তব্য দুই প্রকার;—ব্যক্তিগত ও সামাজিক। আমাদের দেহে যে সকল পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে তাহার সামঞ্জস্য করাকে ব্যক্তিগত এবং নিজের ও অপর সকলের মধ্যে যে সকল বিরুদ্ধ শক্তি আছে তাহার সামঞ্জস্য করার নাম সামাজিক কর্ত্তব্য। প্রত্যেক শরীরেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, সাহস, বীর্য্য প্রভৃতি আছে, আবার তদ্বি-পরীত ধৈর্য্য, বিনয়, ক্ষমা, দয়া, ভয়, লজ্জা, প্রভৃতি শক্তিও আছে। ইহার কতকগুলিকে নিকৃষ্ট ও কতক গুলিকে উৎ-কৃষ্ট বৃত্তি বলে। বাস্তবিক উহার কোনটীই নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট নহে। অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে সকলই নিকৃষ্ট, সামঞ্জস্য করিয়া ব্যবহার করিলে সকল গুলিই উৎকৃষ্ট। ঐ আত্মগত বৃত্তি সকলের সামঞ্জস্যের নাম ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। আবার ঐ সকল বৃত্তি মানব বিশেষে অধিক বা অল্প পরিমাণে আছে। সেই পরস্পর বিরুদ্ধ ও প্রবল দুর্ব্বল শক্তি সকলের সামঞ্জস্যের নাম সামা-

জিক কর্ত্তব্য। ফলতঃ অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ উভয় প্রকার কর্ত্তব্যই আত্মগত ও সমাজগত, কোনটীই কেবল আত্মগত বা সমাজগত নহে। কেননা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের অবহেলা করিলে আপনার ক্ষতি করা হয়। উহা সকলে বা অধিকাংশ লোকে করিলে সমাজের ক্ষতি হইল। আবার ব্যক্তিগত পাপ অনুকরণ দ্বারা সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে নষ্ট করে। আরও দেখ, যে ব্যক্তি নিজে ক্ষতি করিয় নাশ প্রাপ্ত হয় তাহা দ্বারা সমাজের যে উপকার হইত তাহা হইতে না পারায় সমাজের ক্ষতি হয়। ক্লাইব আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যদি তিনি আত্মনাশ করিতেন তাহা হইলে ইংরাজ সমাজের ভারত অধিকার রূপ উপকার হইত কিনা সন্দেহ। অতএব ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালনে সমাজের উপকার ও অপালনে সমাজের অপকার। এই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নাই। সমাজের হিত বা অহিত দ্বারা যে আপনার হিত বা অহিত হয় তাহা বোধ হয় বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। কেননা সমাজের সহিত বিরোধ করিয়া কে টিকিতে পারে; এবং সমাজের মঙ্গল না হইলে কাহার মঙ্গল হয়?

শক্তি সামঞ্জস্যের নাম যেন কর্ত্তব্য হইল, কিন্তু শক্তি সামঞ্জস্য কাহাকে বলে? প্রবল শক্তি খর্ব্ব ও দুর্ব্বল শক্তি বৃদ্ধি করিয়া উভয় শক্তিকে সমান করাকে কি সামঞ্জস্য বলিব? আমরা বলি তাহা নহে। কেননা তাহা হইলে সকলেরই ও সকল শক্তিরই কার্য্য সমান হইবে; তাহা হইলে অগ্রগণ্য বীর, মহাকবি, প্রবল ধী-শক্তি সম্পন্ন, বিখ্যাত দানবীর, অত্যন্ত প্রণয়ী প্রভৃতি অধিক গুণবিশিষ্ট কিছুই পৃথিবীতে থাকে না; সমস্তই মধ্যম প্রকারের হইয়া সাম্যভাবে ধারণ করে। কিন্তু তাহার অসম্ভবত্ব সাম্য প্রকরণে বলা হইয়াছে। যখন স্বাভাবিক সাম্য অসম্ভব তখন কৃত্রিম সাম্য কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অতএব সকল বৃত্তি বা ব্যক্তিকে সমান করার নাম সামঞ্জস্য নহে। সামঞ্জস্য

করা কাহাকে বলে তাহা সামঞ্জস্য করার কারণ বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। যখন বলা হইয়াছে, শক্তি প্রকাশের নাম কার্য্য ও কর্ত্তব্য, তখন যে ক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শক্তির প্রকাশ হয় তাহাকেই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিতে হইবে। কোনও প্রবল শক্তি প্রকাশ হইতে গেলে যদি কোন দুর্ব্বল শক্তির ক্রিয়া লোপ হয় তাহা হইলে কর্ত্তব্য করা হইল না। সুতরাং প্রবল শক্তি এরূপে ব্যবহার করিতে হইবে যেন তাহাতে কোন দুর্ব্বল শক্তি একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া না যায়, অর্থাৎ যে শক্তি প্রবল তাহার প্রবল কার্য্য হউক ও যে শক্তি দুর্ব্বল তাহার দুর্ব্বল কার্য্য হউক, কিন্তু কোনও শক্তির কার্য্যের যেন একবারে অভাব না হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত কর্ত্তব্য করা হইল ; এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি সাহসী সে নিতান্ত সাহসের কার্য্য করুক কিন্তু তাহার যেন মনে থাকে যে আত্মরক্ষা আবশ্যক, এজন্য সাবধানতাকে একেবারে তাড়াইয়া না দেয়। ঐরূপ যে অত্যন্ত দয়ালু সে নিয়ত পরহিত করুক কিন্তু তাহার যেন মনে থাকে যে আত্মহিতও আবশ্যক।

কিন্তু তাহা বলিয়া পরস্পর বিরোধী প্রবল ও দুর্ব্বল শক্তি সমান করিবার চেষ্টা করিবে না। কেননা তাহা হইলে সাহসী যেমন সাহস করিতে যাইবে আত্মরক্ষা অমনি বাধা দিবে, দয়ালু যেমন দয়া করিতে যাইবে স্বার্থপরতা অমনি বাধা দিবে, কেহই প্রকৃত বীর বা প্রকৃত দয়ালু হইবে না। সাহস ও সাবধানতা, দয়া ও স্বার্থপরতা, অহঙ্কার ও বিনয়, বিবেক ও স্বেচ্ছাচারিতা সমান হইলে কোনও শক্তিরই কার্য্য হয় না। ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের ন্যায় সামাজিক কর্ত্তব্যও ঐ রূপ। একদেশে বা প্রদেশে এক ব্যক্তি প্রভূত শক্তিমান ও বহু অল্প শক্তিমান থাকিলে ঐ বহু শক্তিমানের শক্তি কমাইয়া ও দুর্ব্বল দিগের শক্তি বাড়াইয়া সমান করিতে হইবেনা ; এস্থলে কর্ত্তব্য এই যে, প্রবল শক্তিমান রাজা হইবেন ও দুর্ব্বল শক্তিমানেরা প্রজা হইবে। সামঞ্জস্য এই হইল যে, প্রবল শক্তিমান দুর্ব্বল শক্তিমান গণের শক্তি এককালে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না, তিনি প্রধান বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা হইবেন, দুর্ব্বলেরাও যাহার যেরূপ শক্তি তদনু-

রূপ প্রজা হইবে। ঐ প্রবলের রাজসত্ব ধ্বংস করিবার অধিকার দুর্ব্বলগণের নাই এবং ঐ দুর্ব্বলগণের প্রজা-স্বত্ব ধ্বংস করার অধিকার রাজার নাই। এরূপ হইলে রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব হয় না, সবলে দুর্ব্বলে দ্বন্দ্ব হয় না, ধনীতে নির্ধনে দ্বন্দ্ব হয় না, বুদ্ধিমান নির্ব্বোধে দ্বন্দ্ব হয় না ও ব্রাহ্মণ শূদ্রে দ্বন্দ্ব হয় না। সকলেই যদি আত্মশক্তি অবগত হয়েন ও তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহা হইলে কাহারও সহিত কাহারও দ্বন্দ হয় না অথচ বিশ্বকার্য্য সুনিয়মে চলিয়া যায়, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। অতএব আত্মতত্ব অবগত হওয়াই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহাতে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদি সকলেই শক্তির অনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে শক্তি সংঘর্ষ হয় না, বিবাদ হয় না সুতরাং মানবের উন্নতি হয় না। আমরা বলি সে কথা ভুল, বরং ইহাতে সত্বর উন্নতি হইবারই সম্ভব। কেননা অভাবই মানবের উন্নতির কারণ এবং তাহা অবশ্যম্ভাবী। সেই অভাব নিরাকরণ জন্য মানবকে চেষ্টা করিতেই হইবে, সুতরাং মানবের উন্নতি হইবে বরং আত্মবিৎ হইয়া দুর্ব্বলেরা যদি বৃথা প্রবলের সহিত দ্বন্দ্ব না করিয়া আপনাদের অভাব নিবারণের উপায় ও সম্ভবমত নিজ নিজ শক্তির উন্নতি চেস্টা করে, তাহা হইলে মানব সমাজের সত্বর উন্নতি হয়। সাম্যবাদীরা অনর্থক প্রবলে দুর্ব্বলে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া দিয়া সময় নষ্ট ও পরস্পরের ক্ষতি করেন। তবে যাহাদের মত এই যে, উন্নতি হইলে সকল মানুষ সমান হইবে অর্থাৎ সকলেই রাজা হইবে, সকলেই ধনী হইবে, সকলেই বিদ্বান হইবে; এবম্বিধ সাম্যবাদীগণ আমাদের বৈষম্যবাদকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন। ইহা নিতান্ত অসম্ভব, কেননা "সকল নোড়া যদি শালগ্রাম হইবে তবে ঝাল বাটীবে কি দিয়া?" এরূপ সাম্য যে অসম্ভব তাহা আমরা সাম্য প্রকরণে বলিয়াছি। বিশেষতঃ উন্নতি উক্ত প্রকার সাম্যজনক হইতে গেলে সকলেরই উন্নতি হয় না, তাহাতে কাহারও উন্নতি ও কাহারও অবনতি হওয়া আবশ্যক।

অনেকে বলেন মনুষ্যের সহজাত কোন শক্তি নাই, সকলই মানবের স্বোপার্জ্জিত। আবার কেহ কেহ কতকগুলি শক্তি সহজাত বলিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তি স্বোপার্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যদি এরূপ হয় তবে শক্তি সামঞ্জস্যের নাম কর্ত্তব্য কি প্রকারে বলা যায়? তাহা হইলে যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হইবে তদনুরূপ শক্তি আমাদের উপার্জ্জন করিতে হইবে। সুতরাং কর্ত্তব্যের অন্য লক্ষণ হওয়া আবশ্যক। উক্ত প্রকার বাদীদিগের মূলযুক্তি এই যে, তাঁহারা বলেন বাল্যকাল হইতে মনুষ্য যেরূপ সংসর্গে বাস করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হয়। আরও বলেন, বাল্যকালে যাহার যে শক্তি আদৌ ছিলনা, শিক্ষা-বলে সে তাহা প্রাপ্ত হয়। স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে যদিও ঐ সকল প্রকার কথন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিলে উহার অলীকত্ব স্পষ্টই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে মানবের স্বকীয় কিছুই নাই। তাহার দেহ, তাহার প্রাণ, তাহার সমুদয় শক্তিই প্রাকৃতিক অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জীব ও বিশ্বের অপরা পর পদার্থ হইতে মানবের যে প্রাধান্য তাহা কেবল প্রাকৃতিক বহুশক্তি সমাবেশ হেতু। তবে মানবের স্বকীয় সম্পত্তি কোথা হইতে আসিবে? যখন মানব নিজেই আপনার নহে, তখন তাহার অংশ বিশেষ শক্তি কিরূপে আপনার হইবে? যখন যন্ত্রাধিক্যই মানবের প্রাধান্যের কারণ, তখন যে মানবে ঐ যন্ত্রাধিক্য অর্থাৎ শক্তি নাই তখন সে কিরূপে প্রধান হইবে? যখন সপ্রমাণ হইয়াছে, পূর্ব্বে পৃথিবী বাষ্পময় ছিল, পরে দ্রবত্ব ক্রমে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ক্রমে তাহাতে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী ও মানব উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ বাষ্পময় পদার্থ বিশেষ হইতে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই নির্ম্মিত হইয়াছে, অথচ পদার্থ সকলের শক্তি পরস্পর এত বিভিন্ন যে কিছুতেই বিবেচনা করা যায় না যে, তাহারা একই উপাদানে উৎপন্ন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পদার্থ সকল বাষ্পময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পদার্থের ন্যূনাধিক পরিমাণ সংযোগ ও অবস্থিতির

প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। নতুবা যদি একই প্রকারে সমুদায় পদার্থ নির্ম্মিত হইত তাহা হইলে সমস্ত পদার্থই আকার প্রকার প্রভৃতি সর্ব্বাবয়বে একই প্রকার হইত। তাহা না হইয়া প্রস্তর, স্বর্ণ, গো. অশ্ব, পক্ষী, মানব প্রভৃতি নানা প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হইল কি প্রকারে? সহজাত শক্তি না থাকিলে প্রস্তর অথবা অশ্বকে শিক্ষা দ্বারা ইহজন্মে মনুষ্য করা যাইত। কিন্তু তাহা করা যায় না, কেননা মানবে যে সকল যন্ত্র আছে ঐ সকল পদার্থে তাহা নাই। ঐরূপ সকল মনুষ্য সমান রূপ যন্ত্র লইয়া জন্ম গ্রহণ করেনা। যদি করিত তাহা হইলে কেহ কৃষ্ণ কেহ শ্বেত বর্ণ হইত না; কেহ স্থূল কেহ কৃশ. হইত না; কেহ উন্নত কেহ খর্ব্বকায় হইত না, কেহ মধুর কেহ কর্কশকণ্ঠ হইত না। শত মন সাবান দিয়া ধৌত করিলে কৃষ্ণ বর্ণ শুভ্র বর্ণ হইবে না। এক মন ঘৃত ভোজন করিতে দিলেও কৃশকায় ব্যক্তি স্থূল হইবে না। নিত্য বীণার সহিত মিলাইয়া স্বর পরিচালন করিলেও কর্কশ কণ্ঠ মধুর কণ্ঠ হইবে না। যখন ঐ সকল বাহ্যিক শক্তি পরিবর্ত্তন করিতে কেহ পারে না অর্থাৎ যখন মানব নিজে বর্ণাদি উপার্জ্জন করিতে পারে না, তখন আন্তরিক শক্তি উপার্জ্জন করিতে পারিবে তাহার প্রমাণ কি? সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে, যে কবি হয় সে বাল্যকাল হইতেই কবিতায় নিপুণ, যে গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হয় সে বাল্যকাল হইতেই তাহাতে আসক্ত; যে বীর হয় বাল্যকালেই তাহার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, যে ভীরু হয় সে বাল্যাবধিই গৃহের বহির্গত হইতে পারে না। অতএব সহজাত শক্তি যে সকলের মূল তাহার সন্দেহ নাই। তবে সংসর্গ ও শিক্ষাবলে যে নূতন শক্তি প্রকাশ হইতে দেখা যায়, সে শক্তি নহে—জ্ঞান। জ্ঞান যে স্বোপার্জ্জিত তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি। জ্ঞানকে শক্তি বলিয়া ভ্রম হওয়াতেই এই ভ্রমসংস্কার জন্মিয়াছে। শিক্ষা দ্বারা নূতন শক্তি উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু সহজ শক্তির উৎকর্ষ হয়। সে বিষয় আমরা পর পরিচ্ছেদে আলোচনা করিতেছি।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা ও শাসন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কেবল কর্ত্তব্যের লক্ষণ ও কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায় মাত্র নিরূপিত হইয়াছে, কি প্রকারে কর্ত্তব্যে রত হওয়া যায় তাহার কিছু বলা হয় নাই। শক্তি সামঞ্জস্যের নাম কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, কিন্তু কাহার কিরূপ শক্তি আছে ও সেই শক্তি সকল কিরূপ করিলে সামঞ্জস্য হয়, তাহা পরীক্ষা ব্যতীত জ্ঞাত হওয়া যায় না। যে দুর্ব্বল সে যতক্ষণ বলবানের সহিত যুদ্ধ না করে ততক্ষণ তাহার দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারেনা, যে নির্ব্বোধ সে যতক্ষণ বুদ্ধিমানের সহিত একত্র পরীক্ষা না দেয় ততক্ষণ তাহার নির্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারেনা। আবার কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে পীড়া হয় জানিতে হইলে, সেই দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া পীড়িত না হইলে বুঝিতে পারা যায় না এবং যে দ্রব্য ভক্ষণে মৃত্যু হয়, তাহা ভক্ষণ করিলে যখন মৃত্যু হইল তখন সে পরীক্ষায় কোন কার্য্য হইল না; তবে তদ্দৃষ্টে অপরে জানিতে পারে বটে। অতএব দেখা যাইতেছে যে নিজশক্তি পরীক্ষা ও অন্য পদার্থ বা ব্যক্তির সহিত নিজের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা জানিতে হইলে বারংবার নিজে বিপদে পড়িতে হইবে ও অপরকেও বারংবার বিপদে পড়িতে বা প্রাণ হারাইতে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে কিছু কিছু করিয়া জানিতে পারা যায় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প এবং তাহাতেও যে অনেক ভ্রান্তি হয় তাহা জ্ঞান ও বিশ্বাস প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। ঐরূপে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা সমষ্টি করিলে বৃদ্ধবয়সেও অতি অল্প জানা হয়। এই জন্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে, কেবল প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করিলে চলে না। বিশেষতঃ আমাদের ২০।২৫ বৎসর বয়স কালে বা

তাহার কিছু পূর্ব্বে বা পরে কর্ত্তব্য কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে এমত নহে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেই যখন আমাদের কার্য আরম্ভ হয়, তখন সেই সময় হইতেই আমাদিগকে কর্ত্তব্যপর হইতে হইবে। কিন্তু শিশুর জ্ঞান কোথায় ও শক্তি কোথায় যে সে কর্ত্তব্য অবধারণ ও পালন করিবে? তাহার ক্ষুধা হয় বটে, কিন্তু কিরূপে সেই ক্ষুধা নিবারণ করিতে হয় তাহা সে জানেনা। খাওয়াইতে না শিখাইলে সে খায়না, আবার যখন সে খাইতে শিখে তখন যাহা পায় তাহাই খায়, খাদ্য অখাদ্য বিবেচনা করিতে পারেনা। অখাদ্য খাইতে ও অতিরিক্ত খাইতে নিবারণ না করিলে, তাহাকে আহার সম্বন্ধে কর্ত্তব্যপর করা যায় না। এইরূপে দেখা যায়, তাহার যাহা কিছু আবশ্যক তাহা করাইবার জন্য নিয়ত তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়, প্রলোভন দেখাইতে হয় ও ভয় প্রদর্শন করিতে হয়। এরূপ কার্য্য যে কেবল বাল্যকালেই আবশ্যক এমত নহে। বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানব শিক্ষা ও শাসনের অধীন। প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কেহই বাল্যকাল হইতে কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হয় না; ভয়ের অধীন ও আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়াই সকলে কর্ত্তব্য কার্য্য করে। এইকারণে বালকদের জন্য জুজু সৃষ্ট হইয়াছে, ও নিয়ত তাহাদিগকে ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র ইত্যাদি দিবার আশ্বাস দেওয়া হইয়া থাকে; এবং এই জন্যই যুবা ও বৃদ্ধদের জন্য স্বর্গ, নরক এবং সামাজিক ও রাজকীয় দণ্ডাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। যিনি অতি জ্ঞানী ও প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ তিনিও প্রথমে শিক্ষা ও শাসনের অধীন হইয়া ক্রমে তত্ত্ব জানিবার শক্তি পাইয়াছেন; কোন ব্যক্তিই প্রথম হইতে শিক্ষা ও শাসনাধীন না হইয়া আপনা আপনি তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষা ও শাসন আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ অনেক মনুষ্য ভবিষ্যতে সুখ পাইব বলিয়া আপাতমধুর সুখত্যাগে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, ও সকল মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমান প্রকার না থাকায় সকলে ভবিষ্যৎ সমান রূপ বুঝিতে পারে না। আবার কাহারও কাহারও বৃত্তি-বিশেষ এত

প্রবল থাকে যে কার্য্য কালে তাহার শক্তিকে সে পরাস্ত করিতে পারে না। যখন প্রকৃতিই কার্য্য উৎপাদনের মূল, তখন কিরূপে সেই তেজস্বিনী শক্তির প্রকৃতি উল্লঙ্ঘন করিবে? প্রবল তেজস্বী কিরূপে সর্ব্বদা বিনম্রী হইবে? এবং রাগান্ধ কি রূপে ক্ষমাশীল হইবে? এই বিঘ্ন নিবারণের উপায় কেবল মাত্র শিক্ষা ও শাসন। তাহারা মনুষ্যদিগের শক্তি সর্ব্বদা সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত থাকে। যদিও শিক্ষা ও শাসন মানবের নূতন শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, কিন্তু উহা শক্তি-বিশেষের প্রবলতা ও দুর্ব্বলতা সম্পাদন করিতে পারে। দেখা যাইতেছে পরিচালন দ্বারা অঙ্গ বিশেষের বৃদ্ধি ও পরিচালনের অভাবে ক্ষুদ্রত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। কোন বৃক্ষকে দীর্ঘে উন্নত করিতে হইলে তাহার শাখা প্রশাখা ছেদন করিতে হয়; লৌহখণ্ডকে লম্বে বাড়াইতে হইলে পরিসর কমাইতে হয়; অধিক বহনে বাহক ও হল-শকট-চালক গো সকলের স্কন্ধের স্থূলতা বৃদ্ধি হয়; কেবল মাত্র মানসিক বৃত্তি চালনে শরীর ও শরীর চালনে মনোবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হয়; ব্যবহার না করিলে অস্ত্র সকলের তীক্ষ্নতা থাকে না; নিয়ত নরহত্যা করায় ঘাতকের দয়া থাকে না। এইরূপে দেখা যায়, যে, যে বৃত্তির পরিচালন অধিক হয় তাহার প্রবলতা ও যাহার পরিচালন অল্প হয় তাহার দুর্ব্বলতা সম্পাদিত হইয়া থাকে। শাসন ও শিক্ষা বৃত্তিবিশেষকে পরিচালিত ও বৃত্তি-বিশেষের শক্তি প্রকাশে বাধা দিয়া অপরিচালিত রাখে। তাহাতেই কোন বৃত্তি বর্দ্ধিত ও কোন বৃত্তি দমিত হয়। শাণিত হইলে অস্ত্র যেরূপ তীক্ষ্নধার হয়, শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিও সেইরূপ মার্জ্জিত হয়; বেশ ভূষা করিলে শরীর যে রূপ শোভিত হয়, শিক্ষা দ্বারা অন্তরেরও সেইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ শিক্ষা দ্বারা মানবগণ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে, প্রকৃত স্বার্থ কি বুঝিতে পারে, পরার্থ যে স্বার্থ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে, বৃত্তি সকলের সাম-ঞ্জস্য করিবার শক্তি জন্মে এবং তাহাই আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য। শিক্ষা দ্বারা শক্তি সকলের বিকাশ হইয়া মানবগণ এরূপ ভিন্ন

প্রকারের হয় যে, অশিক্ষিত দিগের সহিত তাহাদিগকে একই পদার্থ বলিয়া চিনিয়া লওয়া ভার হইয়া উঠে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখিলে বোধ হয় যেন শিক্ষায় নূতন শক্তি সকলের উৎপাদন করিয়া দিয়াছে। সুতীক্ষ্ণ তরবারি সামান্য লৌহ হইতে কোন দ্রব্য বিশেষে ভিন্ন নহে, কিন্তু উভয়ের শক্তির পার্থক্য দেখিলে একই পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। ঐরূপ ভীল কুলি হইতে আর্য্য জাতি ভিন্নধর্ম্মী না হইয়াও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। শিক্ষা দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্ব, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সংযোগফলে নানা রূপ পদার্থ উৎপন্ন করা যাইতে পারে। তাহার ফলে নির্ব্বোধ বংশে বুদ্ধিমান, কুৎসিত বংশে সুন্দর ও ভীরু বংশে বীর্য্যবান সন্তানের উদ্ভব হইয়া থাকে। ঐ প্রকারে এক্ষণে ইউরোপের নানা স্থানে পশু ও পক্ষী সকলের আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে; কতকগুলি সামান্য বন্য শস্য পুনঃ পুনঃ বপন দ্বারা উৎকৃষ্ট গোধুম রূপে পরিণত হইয়াছিল। অতএব যদিও শিক্ষার দ্বারা নূতন পদার্থ বা শক্তি বিশেষ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু শক্তি সকলের বিকাশ ও সংযোগে এরূপ উন্নত শক্তি সকল উদ্ভূত হইতে পারে যে তাহাদিগকে নূতন উৎপাদিত শক্তি বলিয়া বোধ হয়।

এক্ষণে শিক্ষা ও শাসন কি তাহা জানা আবশ্যক। জ্ঞান ও বিশ্বাসে যে রূপ প্রভেদ, শিক্ষা ও শাসনেও সেই রূপ প্রভেদ এবং প্রকৃত জ্ঞান বিশ্বাস রূপে পরিণত হইলে ঐ বিশ্বাস দ্বারা যেরূপ মানবের জ্ঞানের কার্য্য হয়, প্রকৃত শিক্ষা শাসন রূপে পরিণত হইলে, সেই শাসন দ্বারাও সেইরূপ শিক্ষার ফললাভ হয়। অতএব প্রথমে শিক্ষার বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে শিক্ষা কি, সকলেই শিক্ষা করিতে পারে কি না, এবং শিক্ষা পাইয়া শিক্ষামত কার্য্য হইতে পারে কিনা জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা কাহাকে বলে? লিখিতে শেখার নাম শিক্ষা, না পড়িতে শেখার নাম শিক্ষা? বাঙ্গলা ভাষা শিখিলে শিক্ষা হয়, না সংস্কৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলে,

অথবা ইংরাজি না শিখিলে শিক্ষা হয় না? বানান করিতে জানার নাম শিক্ষা, না অর্থ করিতে জানার নাম শিক্ষা? অধিকাংশ লোকেই বাস্তবিক উক্ত সকল প্রকারকে শিক্ষা বলিয়া থাকেন, আধুনিক প্রথা অনুসারে কোন প্রকারে ইংরাজি পড়িয়া একটী উপধি গ্রহণ বা কোন রাজ-কার্য্য করিতে পারিলেই উচ্চ শিক্ষা হইল; ইংরাজিতে হাত পাকাইয়া কেরাণীগিরি করিতে পারিলেও মধ্যবিধ শিক্ষা হয়; আর যিনি বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে অন্ততঃ আট আনা ইংরাজি মিশাইতে পারেন, দুই একটী সভায় গমন ও লেকচার দিতে বা শুনিতে পারেন, দেশের লোক ভ্রমান্ধ, ভারতকে মজাইল ইত্যাদি বুলি ঝাড়িতে পারেন ও দেশি বিলাতি মিশ্রিত খিচুড়ি ধরণে চলিতে পারেন, তিনি কোন চাকুরি না করিলেও শিক্ষিত; তাহাতে তিনি পৈত্রিক বিষয় নষ্ট-কারী হউন অথবা পরস্কন্ধামোহী বেয়ারিংপোষ্টভোজী বা হুউন তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই; কারণ তিনি শিক্ষিত। তিনি যে শিক্ষিত তাহার প্রমাণ এই, যে, তিনি পুরাতন সমস্তই ঘৃণা করেন। প্রাচীন দলের মধ্যে যিনি ব্যাকরণ অভিধান মুখাগ্রে করিয়া, স্মৃতি সংগ্রহের দুই চারিটী তত্ত্ব পড়িতে পারিলেন তিনি মহা পণ্ডিত, আর যিনি অন্ততঃ দশকর্ম্ম করিতে শিখিলেন তিনিও কম নহেন। বাস্তবিক ঐ সকলকে যে প্রকৃত শিক্ষা বলে না তাহা বোধ হয় অধিক বুঝাইবার আবশ্যক করেনা। বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, জ্ঞান ও শিক্ষা একই, অথবা জ্ঞানের জন্যই শিক্ষা। উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই, যে, জ্ঞানের উপাদান কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় ও বৃত্তি, শিক্ষার উপাদান তাহা হইতে অধিক; অন্যে যে জ্ঞান লাভ করে তাহা অবগত হওয়াকেও শিক্ষা বলে। মানব নিতান্ত অল্পায়ু ও অল্প শক্তি যুক্ত, বিশ্ব ব্যাপার অপরিসীম। সুতরাং মানব একাকী বিশ্ব সম্বন্ধে অতি সামান্য জ্ঞান লাভ করিতে পারে। এই জন্য পরস্পরের জ্ঞাত বিষয় ও পূর্ব্ব পুরুষদিগের জানিত বিষয় সকল শিক্ষা করিলে অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। এক্ষণে পৃথিবীতে এত জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, যে, তৎ সমস্ত না শিখিয়া কেবল

মাত্র আপন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার সহিত তুলনায় কিছুই জানা হয় না। এই জন্য এক্ষণে শিক্ষালব্ধ জ্ঞানই জ্ঞানপদ বাচ্য হইয়াছে। কিন্তু অন্যের জ্ঞাত ও প্রকাশিত বিষয় শিক্ষা করিলেই যে জ্ঞান লাভ হয় এমত নহে। যে সকল বিষয় শিক্ষা করা যায় তাহারি সত্যতা পরীক্ষা আবশ্যক; যাহা শিক্ষা করা হইল তাহাই বেদবৎ অপৌরুষেয় বলিয়া মানিলে চলিবে না। কেননা অনেকে ভ্রান্ত জ্ঞান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত কঠিন, এবং এই জন্য অল্প শিক্ষা মহান্ অনিষ্টকর। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরা শিক্ষিত বিষয়ের ভ্রান্তি বুঝিতে না পারিয়া, ভ্রান্ত শিক্ষানুরূপ কার্য্য সম্পাদন দ্বারা মহান্ অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। যিনি বহুতর শিক্ষা করিয়া তাহা হইতে সত্য নিষ্কাশন করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। এরূপ শিক্ষা কয় জনের হইতে পারে! কেননা কেবল শিক্ষাই আমাদের কার্য্য নহে, অন্তত: জীবন ধারণ উপযোগী কার্য্যগুলিও আমাদের করিতে হইবে। আমাদের আয়ু এত অল্প, যে, তাহার সমুদায়ই যদি শিক্ষা কার্য্যে ব্যয় করা যায় তাহা হইলেও উক্ত প্রকারে সমস্ত বিষয় শিক্ষা হওয়া দূরে থাকুক নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষাও হইতে পারে না। কিন্তু যিনি সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শিক্ষা কার্য্যে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন তিনিও সমগ্র জীবনের বিংশতি ভাগের এক ভাগও ব্যয় করিতে পারেন না। কেননা শৈশব, বার্দ্ধক্য, রোগ, শোক, নিদ্রা, বিশ্রাম, স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকা অর্জ্জন প্রভৃতিতে মানবের এত সময় অতিবাহিত হয়, যে, হিসাব করিয়া দেখিলে জীবনের বিংশতি ভাগের একভাগ সময়ও থাকে না। ঐ অল্প সময় মধ্যে কোন একটী বিষয়েরও শিক্ষা হইতে পারে না। আবার সকল মনুষ্যের অবস্থা সমান নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকেই শিক্ষা পাইবার উপযোগী কোনও উপায় প্রাপ্ত হয় না। অনেকে অর্থাভাবে শিক্ষা গৃহে প্রবেশ করিতেই পারে না। অনেকে জীবিকা অর্জ্জনের নিমিত্ত দিবারাত্রি ভয়ানক পরিশ্রম করিতেছে,

তাহাদের শিক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ সময় পাওয়াও দুরূহ, সুতরাং তাহাতে কি শিক্ষা হইবে? আবার যে সকল লোকে শিক্ষা জন্য যথা কথঞ্চিৎ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারে, তাহাদের প্রবৃত্তি সমান নহে। কেহ শিক্ষাকে কষ্টকর বলিয়া তাহার দিকে যাইতে চায় না, কেহ বিষয় বিশেষের প্রিয় ও কেবল সেই বিষয় মাত্র শিখিতে ইচ্ছুক, কাহারও বিষয় বিশেষ বুঝিবার শক্তি নিতান্ত অল্প সুতরাং তাহাতে তাহার রুচি নাই ও তজ্জন্য তাহা শিখিবার যত্ন করে না, যদিও যত্ন করে তাহাতে তাদৃশ ফল লাভ হয় না। অনেকে সাহিত্যে মহোপাধ্যায় পণ্ডিত, কিন্তু গণিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই। অনেকের বিজ্ঞানে বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু ইতিহাস ভূগোল বিষয়ে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, যে, প্রকৃত শিক্ষা মানবের হইতে পারে না। যদিও বিবেচনা করা যায়, যে, দুই এক জন ব্যক্তি জীবন শেষে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহাতেই বা ফল কি? দুই একজন শিখিলে সমগ্র পৃথিবীর লোকের কি হইবে এবং অতি বৃদ্ধ বয়সে শিক্ষা শেষ হওয়ায় ঐ দুই এক জনেরই বা তাহাতে কি উপকার? শিক্ষাইত মানবের লক্ষ্য নহে, যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কোন সময়েই হউক শিক্ষা পাইলেই মানব কৃতার্থ হইল। যখন কর্ম্মই মানবের প্রধান আবশ্যক এবং কি কর্ম্ম করা আবশ্যক তাহা জানার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন তখন মৃত্যুর দুই চারি দিন থাকিতে শিক্ষিত হইলে ফল কি? সমস্ত জীবন যখন কার্য্য করিয়া আসিলাম তখন শিক্ষা হয় নাই সুতরাং অন্যায় কার্য্য করিয়া আসিলাম, এক্ষণে মরিতে বসিয়াছি, কর্ম্ম করিব আর সময় নাই, এক্ষণে শিক্ষা ও কর্ত্তব্য জ্ঞান হইল, তাহাতে ফল কি? আরও এক কথা এই যে জন্মাবধি অন্ততঃ ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত সকলকেই পরীক্ষা-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল মাত্র শিক্ষা ও শাসনের অধীন হইতে হইবে। অতএব স্পষ্টই বুঝা গেল যে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিয়া কার্য্য করা যাইতে পারে না। অতএব তবে ঐ শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তির নিজের কার্য্য তত অধিক না হউক অন্যের কার্য্য অনেক হয়;

কেননা তিনি যাহা শিখিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পরবর্ত্তী লোক তাহা শিখিতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে শিক্ষা ও শাসন একই বিষয়, তাহার কারণ এই যে, যত প্রকার শাসন আছে তৎ সমস্তই শিক্ষা সম্ভূত। কি ধর্ম্ম শাসন, কি সমাজ শাসন, কি রাজ শাসন সমস্তই শিক্ষিত ব্যক্তি দিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। যিনি শিখিতে শিখিতে জীবন শেষ করেন, তিনি সেই সমস্ত শিক্ষালব্ধ বিষয় ভবিষ্যৎ লোকদিগের জন্য রাখিয়া থাকেন। কেহ ঐ সকল নীতি পুস্তক স্বরূপে রাখিয়া যান, কেহ আবশ্যক বোধে ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্ম পুস্তক স্বরূপে প্রচার করেন, কেহ উহা সমাজ শাস্ত্র রূপে প্রচলিত করেন, আবার কেহ রাজ্য শাসনের জন্য ব্যবহার শাস্ত্র রূপে প্রণয়ন করিয়া যান। সুতরাং শিক্ষিত ব্যক্তি বহু অনুসন্ধান করিয়া যাহা অবগত হয়েন তাহা আমরা তৎপ্রণীত গ্রন্থপাঠে নীতি বলিয়াই হউক, ঈশ্বরাজ্ঞা বা রাজাজ্ঞা বলিয়াই হউক জানিতে পারি। সুতরাং জ্ঞাতব্য বিষয় জানা সম্বন্ধে শিক্ষা ও শাসনের একই ফল; কিন্তু শিক্ষা দ্বারা যেরূপ প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হওয়া যায়, শাসন দ্বারা তাহা হয় না। যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে জানা গেল পরদারাভিগমন মহাপাপ, যে ব্যক্তি ঐ পাপের অনুষ্ঠান করে সে নরকে গমন করিয়া তপ্ত লৌহ সংযুক্ত হইয়া অনন্তকাল কষ্ট পায়। আর শিক্ষা দ্বারা জানা গেল যে পরদারাভিগমন করিলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়, কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া নিজের ও সমাজের বিবিধ অনিষ্ট সম্পাদন করে, রোগ জন্মে, ধন ক্ষয় হয়, এমন কি উহা দ্বারা জীবন নাশ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয় দ্বারাই জানা গেল, যে, পরদারাভিগমন অন্যায় কার্য্য, কেবল ঐ কার্য্যের ফল যাহা জানা হইল তাহা ভিন্ন, সুতরাং অনুষ্ঠান সম্বন্ধে উভয়ের কার্য্যকারিতা তুল্য। তবে ভ্রান্ত জ্ঞান দ্বারা অনেক কুসংস্কার জন্মিয়া কার্য্যের অনেক সময়ে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। যেমন ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে জানা গেল

মদ্যপান মহাপাপ, শিক্ষা দ্বারাও তাহাই জানা হইল বটে, কিন্তু আবশ্যক হইলে অর্থাৎ পীড়াদির সময়ে শিক্ষা-নিরত ব্যক্তি মদ্যপান অন্যায় মনে করেন না; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি প্রাণান্তে মদ্যের পাত্রে অপর পদার্থও পান করিতে পাপ জ্ঞান করেন। ইহাতে হয়ত উপযুক্ত ঔষধ অভাবে কোন সময়ে জীবন নষ্টও হইতে পারে। শাসনের যেমন এই দোষ লক্ষিত হয়, তেমনি মহৎ উপকারিতাও আছে; ধর্ম্ম শাস্ত্ররত ব্যক্তি কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য যেমন ঐকান্তিক যত্ন করেন, শিক্ষানিরত ব্যক্তির কর্ত্তব্য পালনে তত ঐকান্তিকতা জন্মে না। অর্থাৎ জ্ঞানজ কার্য্য অপেক্ষা বিশ্বাসজ কার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়তা অধিক হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই জন্য শাসন সকল যদি ভ্রান্ত না হয় তাহা হইলে শিক্ষা অপেক্ষা তাহার কার্য্যকারিতা শক্তি অধিক। কিরূপে শাসন সকল প্রকৃত শিক্ষানুগত হয় তাহা বলিবার পূর্ব্বে শাসনের প্রকার সমস্তের কথা বলা যাইতেছে। শাসন নানা প্রকার, তন্মধ্যে ধর্ম্মশাসন, সমাজ শাসন, রাজশাসন ও পারিবারিক শাসন প্রধান। আমরা একে একে ঐ সকলের বিষয় বিচার করিব।

ধর্ম্ম শাসন।

মানব যখন প্রথমে পৃথিবীতে আসিয়াছিল, তখন সমাজ ছিল না, রাজা ছিল না, নৈসর্গিক বৃত্তির অভাব পূরণ করণ জন্য যে সকল নৈসর্গিক পদার্থের আবশ্যক তদ্ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন মানব ইতর জন্তুর ন্যায় অনাচ্ছাদিত দেহে আবাস শূন্য হইয়া অনায়াসলব্ধ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া ইচ্ছামত বাস করিত। তখন মানবগণ কোথা হইতে মেঘ উৎপন্ন হয়, কোথা হইতে নদীর জল আইসে, কিরূপে বৃক্ষের ফল সকল জন্মে, এবং কেনই বা ঐ সকলের অভাব হয়, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না। সুতরাং নৈসর্গিক শক্তি-বিশেষকে ঐ সকলের কারণ জ্ঞান করিয়া দেবতা বিবেচনা করিত। ঐ দেবতা প্রসন্ন হইলে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে এবং অপ্রসন্ন হইলে ঐ

সকল দ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে এই বিশ্বাস তাহাদিগের ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। ঐ সময় হইতে মানবগণ দেবতাগণকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং যে কর্ম্ম দেবতার অপ্রসন্নকর বিবেচনা করিল, তাহা করিতে বিমুখ হইতে লাগিল, ঐ দেবভক্তি ক্রমে এত প্রবল হইল যে, নিতান্ত নিষ্ঠুর, ঘৃণাকর ও লজ্জাকর কার্য্য সকলও দেব-প্রীতিকর বোধে তাহারা অবিকৃত মনে সম্পাদন করিতে লাগিল। ঐ দেব-ভক্তি ও পরকালে দেবতার প্রসন্নতা লাভের আশায়, আবার মানবগণ এরূপ নিঃস্বার্থ হয় যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা ঐ কারণে আপনার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী, পুত্র, এমন কি—আপনার প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তাহাদিগের বিশ্বাসমতে দেব-প্রীতিকর বলিয়া যাহা বোধ হইবে, তাহা হিতকর হউক বা অহিতকর হউক, লজ্জাকর হউক বা শ্রদ্ধাকর হউক, ঘৃণাকর হউক বা প্রীতিকর হউক, নিষ্ঠুরতা হউক বা সদয়তা হউক, দেশ উৎসন্নকর হউক বা মহৎ-উন্নতিকর হউক, বিবেচনা না করিয়া প্রীত মনে সম্পন্ন করিবে। কেন না তাহারা জানে না যে, তাহারা কি ; চতুঃপার্শ্বস্থ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিই বা কি ; এ সকল কোথা হইতে আসিল, কি জন্য আসিল, কেন এই সকলের বিনাশ ও পুনরায় উৎপত্তি হয়, কেন রথ-চক্রের ন্যায় সুখ ও দুঃখ আবর্ত্তন করিতেছে, কি জন্য রোগ, শোক, দারিদ্র্য মানবগণকে কষ্ট প্রদান করে, কি জন্য অতুল সম্পদ, সম্ভ্রম, বন্ধু-প্রীতি মানবগণকে প্রসন্ন করে, এবং কি জন্যই বা মানবগণ মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় এবং তাহার পরেই বা তাহাদিগের কি গতি হয়। এ সকলের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া মানব জ্ঞানাতীত দেব পদার্থের উপর নির্ভর করে। যখন তাহারা জানিল, সেই পরাৎপর দেব তাহাদিগের সকল সুখ-দুঃখের হেতু, যখন জানিল যে, তিনি তুষ্ট হইলে সুখী হইবে ও তাঁহার অতুষ্টিতে দুঃখ জন্মিবে, তখন যে কার্য্যে তাঁহার তুষ্টি হইবে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিবে, তাহা সম্পাদন করিতে ও যে কার্য্য

করিলে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন বিবেচনা হইবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে মানবগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বস্ব ধন দেবদেবের আরাধনা করিতে মানবগণ না করিতে পারে এমন কর্ম্মই নাই। মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এই সকল দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, মানবগণকে কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে ও কোন২ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে দেবাজ্ঞা যে রূপ উৎকৃষ্ট উপায়, এরূপ আর কিছুই নাই। এই ভাবিয়া তাঁহারা যে সকল কার্য্য দেশের হিতকর বিবেচনা করিলেন, সেই সকলকে দেবাজ্ঞা বলিয়া প্রচার করিলেন। ঐ সকল ব্যবস্থা ক্রমে ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে পরিণত হইল। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্র দেব-প্রণীত বলিয়া সকলে বিশ্বাস করিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে চলাই মানবের মুখ্যকার্য্য বলিয়া স্থির হইল। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপরীতাচারী মানব-নামের যোগ্য নহে, তাহাকে স্পর্শ করিলেও দেবতার অপ্রীতি-ভাজন হইতে হইবে, বিশ্বাস জন্মিল। অতি প্রাচীনকালে ধর্ম্মশাসন ভিন্ন আর কোনও প্রকার শাসন ছিল না। তখন লোকের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ছিল, ধর্ম্মভয়ে কোন ব্যক্তি বিশ্বাসানুরূপ অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্রই মানবের সকল অভাব দূর করিয়া দিত। তখন ধর্ম্ম-শিক্ষাই প্রধান শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-শাসনই প্রধান শাসন ছিল। বাস্তবিক ধর্ম্মশাসনের তুল্য উৎকৃষ্ট শাসন আর নাই। কেন না, ধর্ম্মভাবে যে কার্য্য করা হয়, তাহা অন্তরের সহিত করা হয়; তাহাতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা বা কুটিলতা থাকে না। উহাতে অন্তরের মলিনতা দূর করে; এবং উহার আরাধনায় মনের পবিত্রতা জন্মে। আহা! সেই প্রাচীন কাল—সেই সত্যকাল—সেই পুণ্যকাল মানবগণের কি সুখেরই ছিল! তখন ধর্ম্মরূপ বৃষ চারি পাদে অবস্থিতি করিতেন, তখন সকলেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু ছিলেন, ধর্ম্মই মানবের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। এমন কি, সাংসারিক বিবাদাদি অনর্থ সকল ধর্ম্ম দ্বারাই মীমাংসিত হইত। ঐ প্রাচীন কালের ন্যায় যদি চিরকাল মানবের মনে ধর্ম্মভাব থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী কি সুখের স্থানই

হইত। তাহা হইলে আর কোন প্রকার শাসনের আবশ্যক হইত না। কিন্তু জগতের কি আশ্চর্য্য প্রকৃতি! এমন সুন্দর ভাবও অধিক দিন থাকিতে পাইল না। ক্রমে মানবের ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সকলেই একই প্রকার দেবতা ও একই প্রকার দেবাজ্ঞা অবগত হইয়াছিল। ক্রমে তাহার ভিন্নত্ব উপলব্ধি হইতে লাগিল। আদিম বৈদিককালে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতারূপে পরিগণিত ছিলেন। পরে ঔপনিষদিক কালে একমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম সকল দেবের দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইল। দার্শনিকগণ ঈশ্বর নির্ণয়ে যুক্তি খাটাইলেন ও পৌরাণিকেরা কৃষ্ণ, কালী, শিব প্রভৃতি পরম দেবতার সৃষ্টি করিলেন। আবার বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও নাস্তিকতা সঙ্গে সঙ্গে অবতারিত হইল। দেশ বিদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম্ম প্রচলিত হইল। ধর্ম্ম নানা-প্রকার হইল, কিন্তু তাহার আধার এক মাত্র মানব রহিল। সুতরাং মানবের মহা বিপদ। কাহাকে ঈশ্বর বলিবে, কোন্ ধর্ম্ম-শাস্ত্র লিখিত ব্যবস্থা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া মানিবে, তাহা তাহাকেই নির্ণয় করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ছিল, তাহা স্খলিত হইল। সত্য-সন্ধিৎসু নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিছু দিন পরে যখন জানিল যে, সে ধর্ম্মও প্রকৃত নহে, আবার নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই রূপে ধর্ম্মের প্রতি মানবের যে অচল বিশ্বাস ছিল, তাহার খর্ব্ব হইতে লাগিল। সুতরাং প্রাচীনকালে ধর্ম্ম-শাসন দ্বারা মানবের যে উপকার হইত, ক্রমে তাহার অল্পতা হইতে লাগিল। প্রত্যুত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা এক্ষণে উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগ অধিক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এক্ষণে অনেক ধর্ম্ম শাস্ত্র মধ্যে অজ্ঞান ও স্বার্থপরতা দুষ্ট বহুতর ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়; সেই সকল ধর্ম্ম ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করিয়া অনেক সময়ে অনেক অটল বিশ্বাসী দেশের মহান্ অনিষ্ট সাধন করেন। আলেক্জেণ্ড্রীয় পুস্তকালয়-দাহন ও সোমনাথ প্রভৃতির মন্দির ধ্বংস ইহার প্রমাণস্থল। আবার যাহাদিগের ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাস নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক ব্যবস্থা দেখিয়া যাঁহারা ধর্ম্মব্যবস্থায় সন্দিগ্ধ

হয়েন, অথবা নানা প্রকার ধর্ম্মে নানাবিধ বিপরীত ব্যবস্থা দেখিয়া ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা পরিশেষে প্রায়ই নাস্তিক হইয়া পড়েন। সুতরাং ধর্ম্ম-শাস্ত্র এক্ষণে কি অটলবিশ্বাসী কি সন্দিগ্ধচিত্ত কাহারও উপকার সাধন করিতে পারিতেছে না।

সামাজিক শাসন।

মানবের প্রকৃতি-পরিবর্ত্তন করিতে ধর্ম্মশাসন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইলেও সামাজিক শাসন নিতান্ত আবশ্যক। কেননা অনেকে পরকালের ভাবীসুখ বা দণ্ড ভাবিয়া আপাত-মধুর সুখত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে না পারিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া পরধন, পরদার গ্রহণে লোলুপ হয়। ঐ সকল নিবারণের জন্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লৌকিক শাসনের নিতান্ত আবশ্যক।

মানব সমাজ-প্রিয়, সমাজ ভিন্ন মানব একাকী থাকিতে পারে না। স্ত্রী, পরিজন, প্রতিবাসী সতত প্রয়োজন; এমন কি সর্ব্বদা ব্যবহৃত দ্রব্য সকল পরস্পর বিনিময় করিয়া না লইলে পাওয়া যায় না। এই জন্যে সমাজ কোন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তাহাকে বিশেষ দণ্ড দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সমাজস্থ কোন ব্যক্তি তাহার সহিত ভোজন করে না, কেহ তাহাকে কন্যাদান করে না, প্রয়োজনীয় কোনও দ্রব্যই তাহার সহিত আদান প্রদান করে না। সুতরাং অন্যায়কারী ব্যক্তি নিরুপায় হইয়া সমাজের শরণাগত হয়, এরূপ কর্ম্ম পুনরায় করিব না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং সমাজের নিয়মানুসারে দণ্ড গ্রহণ করে। সমাজের এ প্রকার শাসনের নাম সামাজিক শাসন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, সামাজিক শাসনই আমাদের প্রধান শাসন; এবং সমাজই আমাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। কেন না, সমষ্টির নামান্তর সমাজ। যখন প্রমাণিত হইয়াছে বিশ্ব সমষ্টিই

ঈশ্বর, তখন যে কোনও সমষ্টিই দেবতা, সুতরাং সমষ্টির আরাধনা দেবতার আরাধনা ও আমাদের প্রকৃত কর্ত্তব্য। যত সমষ্টি হইবে, তত ঈশ্বরত্ব ও যত ব্যষ্টি হইবে, ততই বিশ্বত্ব বা ঈশ্বর হইতে দূরত্ব। এই জন্য যাহারা সমাজ বদ্ধ তাহারা উন্নত; এই জন্য উদ্ভিদ্ অপেক্ষা পশু পক্ষ্যাদি ও পশ্বাদি অপেক্ষা মানব উন্নত এবং এই জন্য ঐক্য কার্য্যের প্রধান সাধন। ঐক্য ও সমষ্টি আছে বলিয়াই ইয়ুরোপীয়েরা লৌহবর্ত্ম, বৈদ্যুতিক সংবাদ প্রভৃতি মহৎ কার্য্য সকল সাধন করিতেছেন এবং পূর্ব্বকালে ঐ সমষ্টি দ্বারা ভারতীয়গণ মহান্ কীর্ত্তি সকল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন; ঐক্যনিবন্ধন প্রাচীন ক্ষত্রিয়কুল প্রাণ থাকিতে অপরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু এক্ষণে সমষ্টি বা ঐক্যরূপ প্রাণাভাবে দেহ মাত্রাবশিষ্ট বিংশতি কোটি মনুষ্য কএক সহস্রের সম্পূর্ণ অনুগ্রহাধীন রহিয়াছে। এই বিশ্বব্যাপার অসীম, ইহার মধ্যে কে একাকী তিষ্ঠিতে পারে? সমষ্টি না হইলে কেহই একাকী এই অনন্তসাগরে বালুকা কণার তুল্যও হইতে পারে না, সুতরাং কাহার এমত শক্তি আছে যে এই অনন্ত বিশ্ব সংঘর্ষে একাকী টিকিয়া যাইতে পারে? এই জন্যই যত কিছু কার্য্য আছে, যত কিছু ন্যায় বা অন্যায় আছে, তৎসমস্তই সমাজ-ঘটিত। ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও যে সকল ন্যায় অন্যায় বিধান আছে, উপাসনা ব্যতীত তৎসমস্তই যে সমাজ সম্বন্ধীয়, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যাইবে। আমাদের উন্নতি, অবনতি, স্বাধীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি সমস্তই সমাজ লইয়া। একের উন্নতি ও অবনতিতে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সমাজের যৎসামান্য উপকার হইতে যদি সহস্র উন্নত ব্যক্তির ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাও ভাল; কিন্তু সমাজের সামান্য ক্ষতি করিয়া লক্ষ ব্যক্তির বিশেষ উন্নতিও ভাল নহে। সমাজের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, ব্যক্তিগত উন্নতি উন্নতিই নয়। আজি ভারত পরাধীন, ভারতের কোটি ব্যক্তি ইংলণ্ডে যাইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিলে, ভারতের কিছুই উপকার হইবে না, ভারত সেই পরাধীনই থাকিবে। কিন্তু ভার-

তের ঐ কোটি ব্যক্তি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া যদি ভারতকে স্বাধীন করিতে পারে, তবেই ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের আচার ব্যবহার ভাল নয় বলিয়া নিজে সাহেব সাজিলে ভারতের কিছুই উপকার হইবে না। ভারত-সমাজের আচারব্যবহার ভাল করিতে পারিলেই প্রকৃত উন্নতি করা হইবে। যিনি নিজের উন্নতি-অভিলাষে সমাজকে পরিত্যাগ করেন, তিনি নিজের উন্নতি করা দূরে থাকুক, বিশেষ অপকার করেন এবং সমাজেরও ক্ষতি করেন। সমাজমধ্যে থাকিয়া যিনি উন্নতি করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত উন্নতি করেন। কিন্তু এক্ষণে কেহই তাহা করেন না, সকলেই এক্ষণে সমাজকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা পান, সুতরাং ধর্ম্মের ন্যায় সমাজের অবস্থাও ভাল নয়। সামাজিক নিয়ম সকল দূষণীয় হওয়ায় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অত্যন্ত প্রচার হওয়ায় সমাজ ও সামাজিক শাসনের এরূপ দুর্গতি হইয়াছে। আজি কালি সকলই স্বাধীন হইতে চাহেন ও সমাজের অধীনতাকে বন্ধন মনে করিয়া তদধীন থাকা বিড়ম্বনা জ্ঞান করেন। লোকে স্বাধীনতায় এত লুব্ধ হইয়াছে যে, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, সমাজ সকলই প্রত্যেকের আপন আপন রুচির অধীন হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ রুচি তিনি সেই রূপ ঈশ্বর, সেই রূপ ধর্ম্ম ও সেই রূপ সমাজ ভালবাসেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে, সমাজ তাঁহাদের অধীন নহে, তাঁহারাই সমাজের অধীন; অঙ্গ সকল যেরূপ দেহের অধীন, ব্যক্তিবর্গও সেই রূপ সমাজের অধীন। কোন্ ব্যক্তি দেহের ক্ষতি করিয়া অঙ্গ বিশেষের উন্নতি করিতে পারে? অঙ্গ সকল দেহের অংশ জ্ঞান করিয়া দেহের উপকারক কার্য্য না করিলে যেরূপ দেহ ও অঙ্গ উভয়েরই নাশ হয়, ব্যক্তি সকলও সমাজের অংশ ভাবিয়া সমাজের হিতকর কার্য্য না করিলে সেইরূপ সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই লোপ হয়। সুতরাং সমাজ রক্ষাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য ও সামাজিক শাসন প্রধান শাসন।

সামাজিক শাসনের একটী আশ্চর্য্য গুণ এই যে উহাদের সাক্ষাৎ

ভাবে দণ্ড প্রদান করে না। আমাদিগের এমন কর্ত্তব্য কার্য্য অনেক আছে যে, তাহার করণে বা অকরণে সমাজ বা রাজা সাক্ষাৎ-ভাবে কোন প্রকার দণ্ডবিধান করিতে পারেন না, অথচ সেই সকলের নিবারণ বা অনুষ্ঠান না হইলে, আমাদিগের মহান্ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। সমাজ ঐ সকল করণ বা অকরণ জন্য এ প্রকার গূঢ় ভাবে শাসন করিয়া থাকেন যে, তদ্দ্বারা ঐ সকল অনিষ্ট বহুল পরিমাণে নিবারিত হইয়া থাকে এবং বহু প্রকার ইষ্ট সাধিত হইয়া সমাজের হিতকর হয়। কাহারও ক্ষতি না করিয়া, অনেকে মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন এবং মদ্যপান ও বেশ্যারত হয়েন। ঐ মিথ্যাদি দ্বারা যখন কাহারও ক্ষতি হইতেছে না, তখন সমাজ বা রাজার প্রকাশ্য শাসন করিবার অধিকার নাই; কিন্তু ঐ প্রকারে মিথ্যা-দির ব্যবহার হইতে হইতে তাহা অভ্যাস পাইয়া গিয়া লোকে প্রকৃত মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া দাঁড়ায়। তখন তাহার ও সমাজের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। কেহ ভিক্ষুককে ভিক্ষা, অতিথিকে অন্ন ও সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানে অর্থ না দিলে, এবং কোন জলমগ্ন পুরুষকে নিজে কষ্ট করিয়া উদ্ধার না করিলে, সমাজ বা রাজা কিছুই বলিতে পারেন না, অথচ ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না হইলে, দেশের অনেক হিতকর কার্য্য সম্পন্ন হয় না। এই সকল অহিত নিবারণ ও হিতানুষ্ঠানে মানবকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সমাজ গূঢ় ভাবে আশ্চর্য্য উপায় করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার নাম—যশ ও নিন্দা। কেহ উক্তরূপ অনিষ্টকর কার্য্য করিলে লোকে তাহাকে নিন্দা করে এবং কেহ কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে লোক-সমাজ তাহার প্রশংসা করে। উক্তরূপ নিন্দা ও সাধুবাদে মানবের মন বিচলিত হয় ও তদনুসারে মানবগণ নিন্দনীয় কর্ম্ম না করিতে ও যশস্কর কর্ম্ম করিতে, সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হয়। মানব, নিন্দাভয়ে অনেক বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়া থাকে এবং যশোলিপ্সু হইয়া, নিজের প্রাণান্তকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মৃত্যুর পর কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া

অনেকে আয়াসকর ও বহু ব্যয়সাধ্য মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; যশোলিপ্সা না থাকিলে, ঐ সকল কার্য্যের আদৌ অনুষ্ঠানই হইত না। মৃত্যুর পর যশ হইলে মানবের কোন লাভ আছে কি না এবং যদি থাকে, তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত না থাকিয়াও, কি জন্য মানব পরকালের যশের জন্য এত লালায়িত হয়? কি জন্য "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" বাক্যের এত আদর? যদিও তাহার গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করা দুরূহ, তথাপি স্পষ্টতঃ ইহা জানা যাইতেছে যে, মৃত্যুর অন্তে স্থায়ী কীর্ত্তির ফলভোগ, জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়—তাহাতে মানব সুখী হইবে, তাহার সন্দেহ কি? এবং যখন আমরা কালিদাস, আর্য্যভট্ট প্রভৃতির নাম স্মরণ করিয়া, ভক্তি-গদ্ গদ্ চিত্তে বিমল যশের ব্যাখ্যা করি, তখন আমরা ঐরূপ যশোভাজন হইব, এরূপ আশা মনোমধ্যে উপস্থিত হইলে, কেন না বিমল আনন্দ লাভ করিব? বিশেষতঃ যখন যশ ও নিন্দা সমাজ-ঘটিত অর্থাৎ সমাজের হিতকর ক্রিয়া করিলে যশ ও অহিতকর কার্য্য করিলে নিন্দা হয়, তখন মানবকে উহার অধীন হইতেই হইবে। সমাজের সাক্ষাৎ দণ্ড অপেক্ষা মানব এই নিদারুণ দণ্ডে অধিক শাসিত হয় এবং প্রত্যক্ষ পুরস্কার অপেক্ষা যশোরূপ পুরস্কারে অধিকতর উৎসাহিত হয়; সুতরাং নিন্দা ভয় ও যশোলিপ্সা, আমাদের বিশেষ উপকারী। ইহার আরও গুণ এই যে, উহা কেবল মাত্র স্ব সমাজ মধ্যে আবদ্ধ নহে, সকল সমাজেরই লোকেরা পরস্পর পরস্পরের নিকট নিন্দাভাজন না হইতে ও যশোভাজন হইতে ইচ্ছা করে। ইহাতে মানবের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতাও আছে; সুতরাং রাজশাসন প্রভৃতি অপেক্ষা ইহার উৎকর্ষতা অধিক; কিন্তু দুঃখের বিষয়—ইহার দ্বারাও এক্ষণে মানবের তদনুরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না। কেন না; নিন্দা ও যশ যে সমাজ লইয়া, সেই সমাজই যখন বিশৃঙ্খল হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা কি প্রকারে হইবে? এক্ষণে সমাজের বিশৃঙ্খলতাহেতু নিন্দাকর ও যশস্কর কার্য্যের নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। এক্ষণে লোকে একবিধ কার্য্য করিয়া নিন্দনীয় ও যশস্বী উভয় প্রকারই হই-

য়াছে। এক্ষণে লোকে যেমন অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া নিন্দনীয় ও যশস্বী হয়, সেইরূপ অধিক বয়সে বিবাহ দিয়াও নিন্দনীয় ও যশস্বী হইয়া থাকে; স্ত্রীকে অন্তঃপুরে বদ্ধ রাখিয়া যেরূপ নিন্দনীয় ও যশস্বী হয়, বাহিরে বাহির করিয়াও সেইরূপ নিন্দনীয় ও যশস্বী হইয়া থাকে; ইউরোপীয় বেশ ধারণ, ইউরোপীয় ভোজ্য ভোজন ও ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া যেরূপ নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় হইতেছে, সামান্য দেশীয় পরিচ্ছদ ব্যবহার ও দেশীয় রীতি নীতির অনুসরণ করিয়াও সেইরূপ নিন্দিত ও প্রশংসিত হইতেছে। কেহ হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীকে মূর্খ, কুসংস্কার-সম্পন্ন বলিয়া ঘৃণা করিতেছেন, কেহ চস্‌মা-শ্মশ্রুধারী নব্য-ব্রাহ্মকে নাস্তিক ও দেশের কণ্টক বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। এইরূপে দেখা যায় যে, সমাজ মধ্যে কোন্ কার্য্য নিন্দনীয় ও কোন্ কার্য্য যশস্কর তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মানবের মনে নিন্দা, ভয় ও যশের আশা অনেক কমিয়া গিয়াছে। একই কার্য্য করিয়া, কোন স্থানে যশস্বী ও কোন স্থানে নিন্দনীয় হইয়া, মানব প্রকৃত নিন্দনীয় ও যশস্কর কার্য্যের অবধারণে অসমর্থ হইয়াছে; সুতরাং উক্তরূপ নিন্দা ও যশকে কেহ গ্রাহ্য করিতেছে না। যাহার মনে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয়, সে তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছে, ও লোকের মতামত কুক্কুর শৃগালের ধ্বনিবৎ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে।

রাজশাসন।

রাজশাসনও একপ্রকার সামাজিক শাসন। সমাজপতির নামান্তর রাজা। কেহ আদিম কালে রাজাকে ঐ ক্ষমতা দেয় নাই; তিনি নিজ বাহুবলে বহু লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার অধীনস্থ লোক সকল তাঁহার শাসনে বশীভূত হইয়া ও তাঁহার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া তাঁহার সহায় হইয়া উঠিল। তিনি ঐ সহায়-বলে ক্রমে বহু সমাজের অধিপতি হইলেন। সকল দেশেই ঐরূপ এক বা বহুসংখ্যক লোক

জন্মিয়াছিল; তন্মধ্যে যিনি শক্তি ও গুণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল লোক ধর্ম্মশাসন ও সামাজিক শাসন অগ্রাহ্য করিয়া অত্যাচারী হয়, রাজশাসন তাহাদের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। রাজা কায়িকদণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে সুপথগামী করেন, সুতরাং রাজা ধর্ম্ম ও সমাজ উভয়েরই রক্ষক। রাজদ্রোহ করিলে ধর্ম্ম ও সমাজের বিদ্রোহাচরণ করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ে রাজগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ও ভ্রমবশতঃ প্রজাবর্গের অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকেন। প্রজাবর্গ যখন সে সকল সহ্য করিতে না পারে, তখন তাহারা বিদ্রোহী হয় এবং ঐ রাজার পরিবর্ত্তে অন্য এক জন বলবান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিকে রাজপদ প্রদান করে। পূর্ব্ব রাজাও আপনার পদ-রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করে। ঐ সময়ে দেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, রাজ-শাসন অভাবে দেশে সমূহ অত্যাচার হয়, এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দ্বারা দেশ উৎসন্ন হইয়া যায়। এই জন্য যাহাতে রাজ-বিপ্লব না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ চেষ্টা রাজা ও প্রজা উভয়েরই করা বিধেয়। রাজাকে বিবেচনা করিতে হইবে, যে, তিনি প্রজাগণের বেতনভুক্ কর্ম্মচারীমাত্র, প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকে, তাহার বিধান করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, অথবা অসাবধান হইয়া পদে পদে ভ্রম করিলে প্রকৃতিবর্গের সমূহ অনিষ্ট হইবে; তাহাতে তাঁহার কার্য্য থাকিবে না এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলা জন্য তিনি পাপী হইবেন। প্রজাবর্গেরও বিবেচনা করিতে হইবে, যে রাজা তাঁহাদিগের হিতের জন্য দিবানিশি চিন্তা করিতেছেন, সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছেন এবং এমন কি অনেক সময়ে নিজের প্রাণ-পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহাকে এত অধিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় যে, তাহাতে পদে পদে ভ্রম হওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ, প্রজাগণ যে কার্য্য অন্যায় বিবেচনা করিতেছে, তাহা প্রকৃত অন্যায় কি না তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। অন্য এক জন রাজা

হইলেও হয়ত তাঁহাকেও ঐরূপ কার্য্য করিতে হইত। অতএব রাজার বিদ্রোহাচরণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। এই জন্য মনু লিখিয়াছেন।—

বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধর্ষশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং॥

কিন্তু রাজশাসন অত্যন্ত তীব্র ও বলপ্রযুক্ত বিধায় ও তাহার অপব্যবহারে সমধিক অত্যাচার সম্ভব হওয়ায়, আধুনিক লোকে রাজশাসনে বিরক্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য এক্ষণে স্বাধীন জাতি সকল রাজপদ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতেছেন; সুতরাং এক্ষণে প্রজা রাজার অধীন নহে, রাজাই প্রজার অধীন। ভারত পরাধীন, ভারতের প্রজার কোন শক্তি নাই, বিদেশের রাজা ভারতের উপর প্রভুতা করিতেছেন। বিদেশীয় রাজা, সকল সময়ে দেশের হিতসাধন করিতে পারেন না। কেন না, অনেক সময়ে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পর রাষ্ট্রে উৎপাত করিতে হয় এবং পররাষ্ট্রের উপযোগী রীতি নীতির মর্ম্ম ভাল বুঝেন না বলিয়া তৎসমস্ত রক্ষণে তাঁহার যত্ন না থাকায়, দেশের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। রাজসম্বন্ধীয় অধিক কথা আমরা বলিতে চাহিনা।

পারিবারিক শাসন।

পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তাহাদের একের সুখে অন্যে সুখী ও একের দুঃখে অন্যে দুঃখী হয়, এইজন্য উহাদিগের পরস্পরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা ও অধিকার আছে। তদ্ভিন্ন ঐ সকলের সহিত আকর্ষণিক সম্বন্ধ থাকা হেতু নৈসর্গিক বলে পরস্পরের প্রতি নৈসর্গিক অনুরাগ জন্মে; সেই অনুরাগ-বলে পরস্পর পরস্পরের প্রিয়চিকীর্ষু হয়। এই জন্য পরিবারস্থ কোন

ব্যক্তির শাসন অন্য শাসন অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ হয়। কেন না, এখানে শাসনকারীর অন্তরে হিতাভিলাষ মূর্ত্তিমান রহিয়াছে এবং শাসিত ব্যক্তিও মনে মনে জানিতেছে যে, শাসনকারী তাঁহার হিতাভিলাষী ও প্রিয়পাত্র। দেখ, পিতা মাতা, পুত্রের শুভ অভিলাষে কি শাসনই না করিতেছেন? তাঁহারা প্রহার, কারাবন্ধ, অনশন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কঠিন শাসনেই তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাদের বিরোধী হয় না। পিতা মাতা যদি ঐরূপ শাসন করিয়া শিক্ষাদি না দিতেন, তাহা হইলে কয় জন বালক শিক্ষা লাভ করিতে পারিত? কোন্ বালক বাল্যকালে আপনা হইতে শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করে? পিতা মাতা প্রভৃতির ঐকান্তিক যত্ন, শাসন ও উপদেশ না পাইলে বোধ হয়, কোন বালকই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারিত না। তাহা হইলে শিক্ষা লাভ দূরে থাকুক, শিশুগণের জীবন রক্ষা হওয়া দুষ্কর হইত। সুতরাং শিশুগণের পক্ষে পারিবারিক শাসন যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পিতা পুত্রের ন্যায় দাম্পত্য-শাসনও বিশেষ হিতকর। দাম্পত্য শাসনের আশ্চর্য্য শক্তি এই যে, উহাতে কায়িক দণ্ড নাই, অবরোধ নাই, অর্থ দণ্ড নাই, অথচ এমনই মধুর তীব্র শাসন, যেন তাহাতে শাসিত হইতেই হইবে। অনেক দম্পতি, স্ত্রী বা স্বামীর নীরস বা সরস শাসনের অধীন হইয়া লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। এমনও অনেক দেখা গিয়াছে যে, যে সকল দোষ শিক্ষায় সারে নাই, ধর্ম্মভয়ে শোধিত হয় নাই, সমাজ-ভয়ে শাসিত হয় নাই এবং রাজদণ্ডেও দমিত হয় নাই, সে সকল দোষও কেবল একমাত্র স্ত্রীর সরল ও সরস শাসনে শোধিত হইয়া গিয়াছে। দেখা গিয়াছে, অনেক পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল, বিবাহিত হইয়া ঐ শাসনের গুণে আশ্চর্য্য কর্ম্মদক্ষ হইয়াছে। অতএব পারিবারিক শাসন আমাদিগের নিতান্ত হিতকর—এমন কি, এই শাসন না থাকিলে, সমাজের দুর্গতির সীমা থাকিত না; জ্ঞান, বিদ্যা, উন্নতি, প্রণয় প্রভৃতির আস্বাদ-মাত্রও পাওয়া যাইত না; মানব অপর জীব হইতে কোনও অংশে

শ্রেষ্ঠ হইতে পারিত না। কিন্তু অপরাপর শাসনের ন্যায় পারিবারিক শাসনেরও এক্ষণে সেরূপ উপকারিতা নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

সভ্যতা।

সভ্যতা ও উন্নতিই মানবের গৌরবের মূল ও মানবত্বের কারণ; সুতরাং সভ্য ও উন্নত হওয়া মানবের নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু, সভ্যতা কাহাকে বলে? সভ্যতার কোন লক্ষণ নাই; অথবা সভ্যতা-নির্ব্বাচক কোন গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি যাহাকে সভ্যতা বল, আমি তাহাকে অসভ্যতা বলি। হিন্দুরা যাহাকে সভ্যতা বলেন, ইয়ুরোপীয়েরা তাহাকে অসভ্যতা বলেন। এইরূপ, ধর্ম্মের ন্যায় সভ্যতা-সম্বন্ধেও নানা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব, প্রকৃত সভ্যতা কিরূপে নির্ণীত হইবে? সভ্যতার লক্ষণ কি?—বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার নাম অসভ্যতা; সুতরাং সভ্যতা অপ্রাকৃতিক। কেননা, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—যে সকল মনুষ্য প্রাকৃতিক অবস্থায় বাস করে, অর্থাৎ যাহারা অনাবৃত স্থানে থাকে, ফল মূল ভক্ষণ করে, যথেচ্ছ বিচরণ করে, উলঙ্গ থাকে, ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য। যাহারা প্রাকৃতিক শক্তির সহিত বিরোধ করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসতি করে, কৃষিজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, বেশ বিন্যাস করিয়া কদর্য্য অঙ্গ আবৃত করে, ইন্দ্রিয় দমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিণীতা স্ত্রী ভিন্ন অপর স্ত্রী গ্রহণ করে না, তাহারা সভ্য। দেখা যাইতেছে, যে জাতি প্রকৃতিকে যত অধিক পরিত্যাগ করিয়া চলে, সে জাতি তত সভ্য, এবং যে জাতি যত অধিক প্রকৃতি অবলম্বন করিয়া চলে, সে জাতি

তত অসভ্য। যাহারা অনাবৃত স্থানে বাস করে, তাহারা নিতান্ত অসভ্য, যাহারা পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা উলঙ্গ থাকে, তাহারা অত্যন্ত অসভ্য, যাহারা বল্কল পরিধান করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য; যাহারা বন্য ফল মূল ও মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা অসভ্য, যাহারা কৃষি-জাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা ইচ্ছা হইলেই স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য, যাহারা মনের মিলন পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধন ছেদন করে না, তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা যাবজ্জীবন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ থাকে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা নিজের মাত্র ভরণ পোষণ করে, তাহারা অসভ্য, যাহারা স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করে তাহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য, যাহারা সকলেরই ভরণপোষণ করিবার চেষ্টা করে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য; যাহারা কেবল আপন সুখের জন্য ব্যস্ত, তাহারা অসভ্য, যাহারা প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা তদপেক্ষা সভ্য, যাহারা সর্ব্বভূতকে আপনার ন্যায় দেখে, তাহারা আরও সভ্য; যাহারা প্রণয় জন্য ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, যাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া ভালবাসে, তাহারা সভ্য; যাহারা দুঃখ হইলেই কাঁদে এবং সুখ পাইলেই হাসে, তাহারা অসভ্য; এবং যাহারা সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করে, তাহারা সভ্য; যাহারা অহঙ্কার মত্ত, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা বিনয়ী, তাহারা সভ্য; যাহারা ক্রোধ হইলেই জ্বলিয়া উঠে, তাহারা অসভ্য, যাহারা ক্রোধ নিবারণ করিতে পারে, তাহারা সভ্য; যাহারা ক্ষতিকারকের ক্ষতি করে, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা ক্ষমা করে, তাহারা সভ্য। এইরূপে প্রমাণিত হইবে যে, যে কার্য্য, প্রকৃতির যত অধীন, সে কার্য্য তত অসভ্য, এবং যে কার্য্য যত কৃত্রিম, তাহা তত সভ্য বলিয়া প্রথিত। যুক্তি অনুসারে

বিবেচনা করিয়া দেখিলেও, উহা সত্য বলিয়া বোধ হয়। কেননা যাহা কিছু প্রাকৃতিক, তাহা আপনা হইতেও হয়, তাহার জন্য মানবের প্রয়াস পাইতে হয় না। যাহা কৃত্রিম, তাহা মানবের যত্ন দ্বারা সাধন করিতে হয়। যাহা আপনা হইতে হয়, তাহা যদি সভ্যতা হইত, তাহা হইলে বন্য মানব ও ইতর পশু পক্ষীরাও সভ্য হইত। পরিধান জন্য যাহারা বল্কল ব্যবহার করে, তাহারা বিনা আয়াসে প্রকৃতি-প্রদত্ত পদার্থ লইয়া পরিধান করে, যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা কত বুদ্ধি কৌশল প্রকাশ করিয়া তুলা, পশুলোম বা গুটী হইতে সূত্র প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করে, সেই বস্ত্রকে কত প্রকার বর্ণে রঞ্জিত করে, এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি সংলগ্ন করিয়া কত সৌন্দর্য্যশালী করে। যে যত বুদ্ধিকৌশল ও শিল্প নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, সে তত উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। ঐ সকলে বুদ্ধিচালনা, চিন্তা, চেষ্টা ও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়, এই জন্য সকলে তাহা পারে না; যাহারা যত পারে, তাহারা তত সভ্য—তাহাদিগের তত গৌরব। সুতরাং প্রাকৃতিকতা অসভ্যতা এবং অপ্রাকৃতিকতা সভ্যতা। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রাকৃতিক-মাত্রেই সভ্যতা হইতে পারে না। মানবের আহার নিদ্রা প্রাকৃতিক। উপরিউক্ত নিয়মানুসারে যাহারা আহার করে বা নিদ্রা যায়, তাহারা অসভ্য এবং যাহারা আহার ও নিদ্রা ত্যাগ করে, তাহারা সভ্য; যাহারা স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহারা অসভ্য এবং স্ত্রীত্যাগী সন্ন্যাসীরা সভ্য; যাহারা পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভালবাসে, তাহারা অসভ্য, এবং যাহারা একেকালে মমতা-শূন্য, তাহারা সভ্য। কিন্তু তাহা কখনই হইতে পারে না। তাহা যদি না হইল, তবে অপ্রাকৃতিক মাত্রই সভ্যতা নহে। তবে সভ্যতার লক্ষণ কি? এ স্থলে একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। যাহা প্রাকৃতিক, তাহা আমাদিগের প্রয়োজনীয়; সুতরাং তাহার কোনও একটী ত্যাগ করিলে, আমাদিগের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। আবার পূর্ব্বেই বলা

গিয়াছে যে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কখনও সম্ভবে না। তবে কি প্রকারে আমরা প্রাকৃতিকতা পরিত্যাগ করিব? এবং যদিও ত্যাগ করিতে পারি, তাহাতে কখনই আমাদের মঙ্গল হইতে পারে না। যাহা অত্যজ্য এবং যাহা ত্যাগ করিলে আমাদের অহিত হয়, তাহা ত্যাগ কখনও সভ্যতা হইতে পারে না। তাহা হইলে সভ্যতাই অপ্রাকৃতিক হয়। প্রকৃতির মধ্যে কখনও কি অপ্রাকৃতিকতা থাকিতে পারে? কখনই না। তবে সভ্যতা কি? আমাদের বোধ হয়, সভ্যতার প্রকৃত অর্থ এই, যে, যাহা হিতের জন্য প্রকৃতি-মধ্যে প্রকাশ্যভাবে নাই, অথচ গূঢ় ভাবে আছে, সেই হিতকর গূঢ় প্রকৃতির প্রকাশই সভ্যতা; অন্যথা, প্রকৃতির অবাধ্যতা বাস্তবিক সভ্যতা নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ—গৃহ, বস্ত্র, অন্ন, ব্যঞ্জন ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থ সকল প্রাকৃতিক না হইয়াও, প্রাকৃতিক। যেহেতু ঐ সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণ প্রাকৃতিক, যোগাকর্ষণাদি শক্তি প্রাকৃতিক এবং ঐ সকল সংযোগ করিয়া প্রস্তুত করিবার শক্তি যাহা মানবের আছে, তাহাও প্রাকৃতিক। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে, মানব-নির্ম্মিত কোন পদার্থই কৃত্রিম নহে। যদি তাহা হইত, তবে বাবুইয়ের বাসা কৃত্রিম, উইএরঢিবি কৃত্রিম এবং লাক্ষা, মধু প্রভৃতিও কৃত্রিম। কেন না, ঐ সকল মধুমক্ষিকা প্রভৃতি ইতর জন্তুপ্রণীত। ইতর জন্তুপ্রণীত পদার্থ যদি কৃত্রিম না হইল, তবে মানবপ্রণীত পদার্থ কৃত্রিম হইবে কেন? উহারাও ত ইতর জন্তুর ন্যায় ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এ প্রবন্ধে আমাদের সে বিষয় আলোচনার আবশ্যকতা নাই। আমরা মানবপ্রণীত পদার্থকে কৃত্রিম বলিতে প্রস্তুত। তবে এই মাত্র বলিতেছি, যে, মানব যাহা প্রস্তুত করে, তাহা প্রাকৃতিক শক্তির বলে করিয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতির বিরুদ্ধ কিছু করিবার মানবের সাধ্য নাই; তাহা করিতে হইলে, বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আহার, নিদ্রা—জীবন-রক্ষার জন্য নিতান্ত আবশ্যক; তাহা বন্ধ করিলে, প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ করা হয়। সুতরাং তাহা মানবের

সাধ্যাতীত। তাহার চেষ্টা করিলে, নষ্ট হইতে হয়। গৃহ, পরিচ্ছদাদি প্রকৃতির প্রতিকূল নয় বরং অনুকূল। কারণ, যদিও প্রকৃতি গৃহ প্রদান করেন নাই, তথাপি পর্ব্বতগুহা, বৃক্ষতল ও বল্কলাদি প্রদান করিয়াছেন। মানব তাহা হইতে উত্তম গৃহ ও বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে। আবার প্রকৃতি যেমন ক্রোধ দিয়াছেন, তেমনি আবার ক্ষমাও দিয়াছেন, যেমন ভালবাসা দিয়াছেন, তেমনি বৈরাগ্যও দিয়াছেন, যেমন স্বার্থপরতা দিয়াছেন, তেমনি আবার সহানুভূতিও প্রদান করিয়াছেন, যেমন সুখ দিয়াছেন, তেমনি দুঃখ দিয়াছেন, এবং ঐ সকল দমন ও বৃদ্ধি করিবার শক্তিও দিয়াছেন। ইহার একটী চরিতার্থ করিতে হইলে, অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। সুতরাং মানব, হিতাভিলাষে ঐ সকলের সামঞ্জস্য করিতে পারে। অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, মানব হিত-সাধন বা অহিত-নিবারণ জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাকৃতিক উপকরণ লইয়া যাহা প্রকাশ করে, তাহাই প্রকৃত সভ্যতা। এই জন্যই সভ্যতা মানবের এত কাঙ্ক্ষণীয়, এবং সভ্যজাতির এত আদর। যাহা আপনা হইতেই হয়, তাহার আবার প্রশংসা কি? তাহার যে প্রশংসা, সে কেবল প্রকৃতির বা ঈশ্বরের। ঈশ্বর চুম্বককে লৌহাকর্ষণের শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে সে লৌহাকর্ষণ করে, তাহার নিজের চেষ্টায় সে কিছুই করে না। তাহাতে তাহার গৌরব এই যে, সে বলিতে পারে—আমি মৃত্তিকা না হইয়া চুম্বক হইয়াছি, আমি বড় ঘরে জন্মিয়াছি। ঐরূপ যে স্ত্রী, রূপে মুগ্ধ হইয়া কোন সুন্দর যুবককে ভালবাসে, তাহাতে তাহার প্রশংসা কি? সে ত যুবার রূপে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াই ভালবাসিতেছে, স্রোতে তাহাকে লইয়া যাইতেছে। আর যে নারী, পতি কুৎসিত, ভালবাসার যোগ্য নয় দেখিয়াও শুদ্ধ কর্ত্তব্যের অধীন হইয়া ক্রমাগত চেষ্টা দ্বারা ভালবাসিতেছে, তাহারই ভালবাসার প্রশংসা। কেন না, প্রকৃতি, তাহাকে ভালবাসিতে বলেন নাই, বরং ঘৃণা করিতে

বলিয়াছেন, কিন্তু সে চেষ্টাবলে ঘৃণা দূরীকৃত করিয়া ভালবাসা আনিয়াছে; ঐ ভালবাসা জন্মাইতে তাহার অনেক আয়াস লাগিয়াছে। যদি ঐ কার্য্য করায় তাহার বৃত্তি সামঞ্জস্য করা হইয়া থাকে, অথবা তদ্দ্বারা মানবের হিত করা হইয়া থাকে, তবে উহাকে সভ্য ব্যবহার বলিতে হইবে। ঐ কার্য্য নারীর প্রকৃত প্রশংসা যোগ্য। যখন আমরা সভ্যতা বর্ণনা করিব, তখনই এই রমণীর প্রশংসা করিব। আর যখন স্বভাবের শোভা বর্ণনা করিতে করিতে ময়ূর ময়ূরীর নৃত্য বর্ণন করিব, নীল আকাশে চন্দ্রিকা-ভাতির সুখ্যাতি করিব, যখন নির্ম্মল নদীর লহরী-লীলার শোভার বিষয় বলিব, যখন ভ্রমরের মধুপান, ভানুদর্শনে কমলিনী প্রকাশাদির বর্ণনা করিব, সেই সময়ে প্রথমোক্ত রূপমুগ্ধা যুবতীর প্রণয়ের প্রশংসা করিব। সৌন্দর্য্যে ঐ রমণীর প্রণয় শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু মানবীয় উচ্চ ভাব উহাতে কিছু নাই; সুতরাং মাহাত্ম্য-হীন। এই জন্য ভারত-সতী সাবিত্রী ও ভারতীয় কুষ্ঠ-রোগ-গ্রস্ত ব্রাহ্মণ-পত্নীর সতীত্বের যত মাহাত্ম্য, অজ-রমণী ইন্দুমতী ও ভরত মাতা শকুন্তলার তত মাহাত্ম্য নহে। কেন না, পতিপরায়ণা সাবিত্রী এক বৎসর পরে বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে জানিয়াও, কর্ত্তব্য অনুরোধে সঙ্কল্পিত স্বামী সত্যবানকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং ঐ ভারতোক্ত পতিব্রতা রমণী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পতির মনস্তুষ্টি জন্য কত দুরূহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছেন। ইন্দুমতী ও শকুন্তলার প্রণয় অধিক বটে, ঐ প্রণয়ের মধুরতা অধিক বটে, কিন্তু তাহা তত শ্লাঘনীয় নহে। কেন না তাঁহাদের প্রণয় প্রাকৃতিক আকর্ষণজাত।

সভ্যতার এত প্রশংসার কারণ এই যে, যাহা প্রাকৃতিক, তাহা হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাঁহাত আমরা পাইতেছি। তদ্ভিন্ন কৃত্রিম পদার্থ হইতে যে উপকার পাওয়া যায়, তাহা সভ্যতা না হইলে, পাওয়া যায় না; এবং প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে আমাদের যে অপকার হয়, তাহা নিবারণ করিবার প্রাকৃতিক যে সকল

উপায় আছে, কৃত্রিম উপায় তদপেক্ষা অনেক হইতে পারে। সুতরাং সভ্যদিগের সুখসম্পাদন ও দুঃখ-নিবারণ করিবার যত উপায় আছে, অসভ্যদিগের তাহা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। তুলনায় সভ্যেরা দেব এবং অসভ্যেরা পশু তুল্য হয়। যেখানে যত সভ্যতা, সেখানকার মানব তত উচ্চ-শক্তিবিশিষ্ট এবং যেখানে যত অসভ্যতা, তথাকার লোক তত পশু-শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু অগ্নি যেমন রন্ধন ও গৃহদাহ দুইই সম্পাদন করে, সভ্যতাও সেইরূপ হিত ও অহিত উভয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। অসভ্যদিগের শারীরিক বল অধিক, মানসিক বল অল্প এবং সভ্যদিগের মানসিক বল অধিক, শারীরিক বল অল্প। কারণ, অসভ্যেরা কেবল শরীর চালনা করায় তাহাদের শারীরিক বল বৃদ্ধি হয়। সভ্যগণ অধিক মানসিক চিন্তা করায়, তাহাদের শরীর দুর্ব্বল হয়। অসভ্যদিগের শরীর দৃঢ়, মন অটল, অভাব অল্প; সুতরাং তাহাদের সুখ চরিতার্থ না হওয়ার জন্য দুঃখও অল্প হয়। আহার-বিহারাদি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যগুলি সম্পাদন করিতে পারিলেই, তাহারা সুখী হয়। কিন্তু সভ্যগণের শরীর শক্তিহীন, মন চিন্তাযুক্ত ও অভাব অনেক হওয়ায় তৎ-সমস্ত অসম্পাদিত থাকে তজ্জন্য সমধিক দুঃখ প্রাপ্ত হয়। অসভ্যেরা সমস্ত কার্য্য দৈহিক বল দ্বারা সম্পন্ন করে, সভ্যেরা অনেক কার্য্য যন্ত্রবলে সমাধা করে। সভ্যেরা আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে সহস্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করিতে পারে, তজ্জন্য অসভ্য মল্লযুদ্ধে তাহারা অপারগ। বাষ্পীয় রথে তাহারা এক মাসের পথ একদিনে যায়, সুতরাং অসভ্যদিগের পথ ভ্রমণে তাহারা অশক্ত। শীত-বাতাদি নিবারণোপযুক্ত যথেষ্ট দ্রব্য সভ্যদিগের আছে, তজ্জন্য তাহারা অসভ্যদিগের ন্যায় শীত বাতাদি সহ্য করিতে পারে না। এই প্রকারে সভ্যদিগের কায়িক শক্তি মাত্রেরই অল্পতা হয়। কিন্তু তৎ-পরিবর্ত্তে তাহাদের মানসিক শক্তি ও শ্রমের বৃদ্ধি হয়। সেই মানসিক শক্তি-প্রভাবে তাহারা নানা প্রকার আশ্চর্য্য বিজ্ঞান, দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করে, নানা প্রকার উৎকৃষ্ট শিল্প জাত দ্রব্য

প্রস্তুত করে এবং নানা প্রকার সুখকর পদার্থ ও সমাজ-স্থিতির সুশৃঙ্খলা প্রস্তুত করে বটে, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হওয়ায় নানাপ্রকার শারীরিক রোগ যন্ত্রণা এবং পুনঃ পুনঃ অবস্থার বৈপরীত্য ঘটায় নানা প্রকার মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে। আবার মনের সরলতা প্রাকৃতিক, সুতরাং উহা অসভ্যদিগের ধর্ম্ম। কুটিলতা কৃত্রিম, উহা সভ্যদিগের ধর্ম্ম। প্রতিবেশীকে আত্মবৎ দেখা সভ্যতার কার্য্য সত্য বটে, কিন্তু যদি ঐ প্রতিবেশী কাহারও বিরোধী বলিয়া জ্ঞান হয়, তবে সভ্য সেই প্রতিবেশীর সহিত কুটিল ব্যবহার করিতে ক্রুটী করে না। ঐ কুটিলতা হইতে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চাটুবাদ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; এবং তাহা হইতেই ক্রমে নানা প্রকার বিবাদ বিসংবাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসভ্যেরা শক্তি অনুসারে মাননীয় হয়; যাহার যত অধিক বল, সে তত প্রধান। এমন কি, বলই রাজত্বের কারণ। যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তত সম্মানিত হয়, এবং যে যত কার্য্য করিতে পারে, সে তত যশস্বী হয়। নির্গুণেরা সমাজে অপদস্থ থাকে। কিন্তু সভ্যসমাজে তদ্রূপ নহে। সভ্যসমাজে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ সাম্যভাব ঘোষিত হয়, অথচ কার্য্যে অসভ্যদিগের হইতেও বৈষম্য অধিক থাকে; এজন্য মানব মনোবেদনায় অস্থির হয়। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধের ন্যায়। তাহারা মনে মনে জানিতেছে যে, কার্য্য মাত্রেই তাহারা সমান অধিকারী, কিন্তু কার্য্যের অনুষ্ঠানকালে তাহার বিপরীতাচরণ দেখিয়া মনঃক্লেশে চঞ্চল হয়। সভ্যেরা কেবল মুখেই সর্ব্বস্ব দেখাইয়া অর্থাৎ ইতর, ভদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকে মহাশয় বলিয়া ও মান্যবর পাঠ লিখিয়া সাম্যের ফল প্রদান করেন। সভ্যসমাজে এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যদিও সভ্যসমাজ চাকচিক্যপূর্ণ, এবং সুখের নানাবিধ পদার্থে পরিব্যাপ্ত, তথাপি ইহা প্রকৃত পক্ষে অসভ্যদিগের ন্যায় সুখী নহে। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সভ্যসমাজে যত রোগ, যত মারীভয়, যত কলহ, যত মনঃকষ্ট—অসভ্য সমাজে তাহার সংখ্যা অনেক কম। অসভ্য সমাজে সুখকর দ্রব্যের

আধিক্য নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের দুঃখের ভাগ অল্প। কিন্তু মানুষ সুখী না হউক, যদি দুঃখ না পায়, সেই তাহার ভাল। অসভ্যদিগের সুখ অর্থাৎ বিলাসের দ্রব্য বেশী নাই; কাজেই তৃপ্তি-সুখ তাহাদের অল্প, কিন্তু অভাব পূরণ হইল না বলিয়া যে দুঃখ, তাহা তাহাদিগের অল্প। সভ্যেরা সুখ-জনক দ্রব্যের অনেক আস্বাদ পাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে অভাবাপূরণ জনিত যথেষ্ট দুঃখ পাইতে হয়।

কষ্ট দুই প্রকার; দুঃখজনিত এবং অসুখজনিত। আবশ্যক পদার্থের অভাবে দুঃখ জন্মে; এবং সুখকর পদার্থের অসদ্ভাবে অসুখ ঘটে। আমাদের শরীর রক্ষার নিমিত্ত আহার, পানীয় জল ও বায়ুর প্রয়োজন, তাহার অভাব হইলে ক্ষুধা, পিপাসা ও গ্রীষ্ম রূপ দুঃখ জন্মে। গোলাপ পুষ্পের সুগন্ধি পাইলে আমরা আমোদিত হই, কিন্তু যদি তাহা না পাই, তাহা হইলে পুষ্পাঘ্রাণ-জনিত সুখ পাইলাম না বলিয়া আমাদের অসুখ হয়। ঐরূপ মিষ্টান্ন ভোজনে রসনার সুখ, সংগীত শ্রবণে কর্ণের সুখ, সুশোভিত পদার্থ দর্শনে চক্ষুর সুখ, এবং সুকোমল পদার্থ স্পর্শনে অঙ্গের সুখোৎপত্তি হয়। যদি ঐ সকল সুখের অভাব হয় অর্থাৎ ঐ সকল সুখ ভোগ করিবার উপযুক্ত পদার্থ আমরা না পাই, তবে আমাদের ঐ সকল সুখের অভাব অর্থাৎ অসুখ হয়। আমাদের যে সকল সুখের অভাব হয়, সেই সকল সুখ আমরা কখনও ভোগ না করিয়া থাকিলে, তাহার অভাবে আমাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। যদি সুখকর বস্তুর ক্বচিৎ আস্বাদ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহার অভাবে অল্প কষ্ট হয়। আর যদি উহা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার অপ্রাপ্তিতে আমাদের কষ্ট প্রায় দুঃখেরই ন্যায় হইয়া থাকে। অসভ্য কালে যখন মানবগণ উৎকৃষ্ট হর্ম্যে বাস, সুকোমল শয্যায় শয়ন, বিবিধ সুমিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন, বিশুদ্ধ তান লয় সংযুক্ত সংগীত শ্রবণ, বহুবিধ ভোগ্য ও বিলাস দ্রব্য উপভোগ জনিত আনন্দের কিছুমাত্র আস্বাদন পায় নাই, তখন ঐ

সকলের অভাবে তাহাদিগের কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। অদ্যাপি অসভ্য ও সভ্যদেশবাসী পল্লীগ্রামস্থ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের ঐ সকলের অভাব জন্য মনে নিরানন্দ উদিত হয় না। যেহেতু তাহারা কখনও ঐ সকল সুখের রসগ্রহ করে নাই সুতরাং তাহার প্রার্থীও হয় নাই। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সুখ ও ভোগবিলাসের অশেষ কৃত্রিম পদার্থের সৃষ্টি হয়। যত অধিক বস্তু প্রস্তুত হয়, মানবগণের সেই সকল পাইবার অভিলাষ ততই বৃদ্ধি হয় এবং সেই অভিলাষ যত অপূর্ণ থাকে, ততই অসুখ বৃদ্ধি হয়। আমরা সভ্যসমাজে সুখকর দ্রব্য ভোগ করিতে করিতে এমত অভ্যস্ত হইয়া যাই যে, তদভাবে আমাদিগের প্রাকৃতিক অভাবজনিত দুঃখের ন্যায় অসুখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপ অবস্থা সভ্য সমাজে নিয়ত ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা ঐরূপ কষ্টের একান্ত কারণ। ইউরোপীয় সভ্যতা সকলকেই স্বাধীন ও সমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে ও সকলকেই সুখোপভোগে তুল্য অধিকারী বলিয়া উদ্ঘোষণ করিতেছে। সুতরাং সকলেই সুখ লাভের জন্য লোলুপ, সকলেই বড় চাকুরি, বড় পদের নিমিত্ত লালায়িত, অথচ তাহা অতি অল্প লোকে পায়; অবশিষ্ট লোকে মনোদুঃখে ফিরিয়া আইসে। আবার কেহ কেহ কিছুদিনের জন্য পদমর্য্যাদাসম্পন্ন হইয়া সুখ ও বিলাস ভোগে অভ্যস্ত হইয়া অপদস্থ হয়, তখন তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। তখন সে পদ নাই, সে অর্থ নাই, সে বিলাসের দ্রব্য কোথায় পাইবে? তখন তাহাকে অট্টালিকা ছাড়িয়া কুটীরে বাস করিতে হয়, শকট-ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বেড়াইতে হয়, পলান্ন, পিষ্টক, সুমিষ্ট ভোজ্য বর্জ্জন করিয়া, শাকান্ন আহার করিতে হয়, বহুমূল্য বেশবিন্যাস পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হয়, ভৃত্যাভাবে সমস্ত স্বয়ংই নির্ব্বাহ করিতে হয়। অসভ্য জাতিকে এ সকল কষ্ট কিছুই পাইতে হয় না। তাহাদিগের সুখের সামগ্রী অধিক নাই সুতরাং তাহা পাইবার জন্য তাহাদিগের লালসা জন্মে না—

তাহা না পাওয়ায় কষ্টও হয় না। তাহাদিগের কেবল স্বাভাবিক নিত্যনৈমিত্তিক পদার্থের প্রয়োজন হয়, তল্লাভার্থে আহাব। চেষ্টা করে, এবং সেই চেষ্টা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রায়ই সফল হয়। অব-শিষ্ট সময় তাহারা বিশ্রাম ও মনোমত ক্রীড়া-সুখে অতিবাহন করে। সভ্যগণের সুখের সামগ্রী অনেক এবং তাহা পাইবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তন্নিমিত্ত তাহারা বাল্য হইতে বৃদ্ধ কাল পর্য্যন্ত দিবা রাত্রি ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করে, তাহাতে শরীর ও মন উভয়ই অসুস্থ হয়: কিন্তু যাহা পাই-বার জন্য এই কঠোর তপস্যা করিয়া দেহ ও মন নষ্ট করে, তাহা না পাইয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়; প্রকৃত সুখের স্বাদ গ্রহণ তাহাদের অদৃষ্টে আদৌ ঘটে না। শুদ্ধ রোগ, শোক, নৈরাশ্য, প্রভৃতির নিমিত্ত কষ্ট ভোগ করিতে করিতেই তাহাদের জীবন শেষ হয়। সভ্য সমাজের এই সকল দুরবস্থা দেখিয়া অনেকে অসভ্যতাকে প্রকৃত সুখকর মনে করিয়াছেন। এই জন্য গোল্‌ডস্মিথ প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কৃষি-জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন এবং শিহ্লণ মিশ্র প্রভৃতি আর্য্য পণ্ডিতগণ মানব অপেক্ষা পশু জীবনের প্রশংসা করিয়াছেন। শিহ্লণ মিশ্র বলিয়াছেন,—

> যদ্বক্ত্রং মুহুরীক্ষসে ন ধনিনাং ব্রূষে ন চাটুং মৃষা
> নৈষাং গর্ব্বগিরঃ শৃণোষি ন পুনঃ প্রত্যাশয়া ধাবসি
> কালে বালতৃণানি খাদসি সুখং নিদ্রাসি নিদ্রাগমে,
> তন্মে ব্রূহি কুরঙ্গ! কুত্র ভবতা কিন্নামতপ্তং তপঃ॥

কিন্তু তাহা বলিয়া মানব সভ্য না হইয়া অসভ্যই থাকিবে, একথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। সভ্যতাই মানবের মানবত্ব এবং অসভ্য-তাই মানবের পশুত্ব। পশুতে ও মানবে প্রভেদ এই যে, পশুবা কেবল প্রকৃতির অনুসরণ করে মানব তাহা করে না। পশুগণ চিরকালই প্রকৃতির নির্দ্দেশ মত আহার, নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভো-গাদি করিয়া কালযাপন করে; চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পশুরা যে প্রকারে বিচরণ করিত, এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে, তাহার অনু-

মাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের মানবের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, কত প্রভেদ হইয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার বৃটনীয়দের সহিত এক্ষণকার বৃটনদিগের তুলনায় পশু ও দেবতার প্রভেদ লক্ষিত হইবে। সভ্যতাই ইহার হেতু। যদি সভ্যতা না হইত, তাহা হইলে পশুদিগের মত ইহারাও চিরকাল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া এক রূপই থাকিত। তাহা হইলে পশুতে আর মানবে বৈলক্ষণ্য কি থাকিত? তাহা হইলে মানব পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হইতে পারিত না। ঈশ্বর মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ ও পরিবর্ত্তনশীল করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত সভ্যতা মানবের স্বাভাবিক, সুতরাং অবশ্যম্ভাবী। মানব জন্মিলে যেমন প্রথমে বাল্যকাল তৎপরে যৌবন আপনা হইতেই আইসে, সমাজেরও সেইরূপ অসভ্য কালের পরে সভ্যকাল আসিবে। সমাজের পক্ষে অসভ্যাবস্থা শৈশব কাল এবং সভ্যাবস্থা যৌবন কাল। বাল্যকাল যেরূপ স্বভাবতঃ ক্রীড়া সুখের কাল, অসভ্য কাল সেইরূপ সমাজের স্বভাবতঃ মানসিক সুখের কাল। যৌবন কাল যেরূপ মানবের চিন্তা-জটিল কার্য্যকাল, সভ্যকালও সেইরূপ সমাজের সুখদুঃখমিশ্রিত উন্নতির কাল। যৌবন কালে মানবগণ নানাবিধ সুখ দুঃখে ব্যাপৃত থাকে, নানাবিধ চিন্তা কার্য্যের ভার আসিয়া পড়ে বলিয়া যদি চির-বাল্যের প্রার্থনা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে সভ্যকালের নানা প্রকার কষ্ট দেখিয়া চির অসভ্য কালের কামনা যুক্তিসিদ্ধ হইবে; কিন্তু চির-কালই বাল্য-ক্রীড়ায় ও পিতা মাতার হস্তাবলম্বনে প্রতিপালিত হইয়াই যদি জীবন অতিবাহিত করিতে হইল, তবে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কোথায় থাকিল? অতএব অসভ্যাবস্থার কামনা কখনও উচিত নহে। বিশেষতঃ সভ্যতা কেবল মানবের যত্নে আইসে না ও মানবের যত্নে যায় না। উহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে আপনিই আসিয়া পড়ে। তাহা না হইলে উহা কখনও আসিত না। কেননা মানবের যত্ন করিয়া সভ্যতা আনার কোন কারণ নাই। কারণ, অসভ্য কালেও মানব জন্মিত ও মরিত, এই সভ্যকালেও মানব

জন্মে ও মরে, বরং এক্ষণে অল্প বয়সেই মৃত্যু হয়। সেই অসভ্যকালে মরিলে মানবের যে গতি হইত, এই সভ্যকালে মরিলেও সেই গতি হয়। অধিকন্তু তখন সুখ ছিল, এখন ঠিক তদ্বিপরীত। এরূপ অবস্থায় অসভ্যকালের অনায়াসলভ্য ফল মূল পরিত্যাগ করিয়া সভ্যকালোচিত শ্রমার্জ্জিত খাদ্যের যত্ন করিতে মানবের স্বতঃপ্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। ফল সমান, অথচ বৃথা কষ্ট বাড়াইবার প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে লোকে সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া আহারাদি করিত, কেন এক্ষণে আহারচিন্তায় জর্জ্জরিত হয়? মানব কি কেবল চাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া কষ্টকর সভ্যতা আনয়ন করিয়াছে? কখনই না। প্রাকৃতিক অভাবই সভ্যতা আনয়নের নিদান। ক্ষুধা অর্থাৎ আহার করিবার ইচ্ছা মানবের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, আহার না করিলে মানবের অত্যন্ত যাতনা হয় ও পরিশেষে মৃত্যু হয়। আদিমকালে ক্ষুধা নিবারণ করিবার জন্য ফল-মূলাদি প্রাকৃতিক পদার্থ সকল ছিল, পিপাসা নিবারণের জন্য নদী প্রভৃতিতে জল ছিল, রৌদ্র, বৃষ্টি নিবারণ করিতে গিরিগুহা ও বৃক্ষতল ছিল। ক্রমে যখন মানবের সংখ্যা বহুল হইয়া পড়িল, ঐ সকল প্রাকৃতিক ফলে সকলের কুলাইল না, তখন মানবের কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইল; যখন নদীনীরে পিপাসা শান্তি হইল না, তখন অগত্যা তাহাকে পুষ্করিণী খনন করিতে হইল, যখন গিরিগুহা প্রভৃতি হইতে রৌদ্র বৃষ্টি আদি নিবারণের উপায় হইল না, তখন কাজেই তাহাকে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইল। অভাব হওয়াতেই তাহা নিরাকরণের ইচ্ছা ও চেষ্টা হইল; বুদ্ধি বলে তাহাতে তাহারা কৃতকার্য্যও হইল। এইরূপে অভাব মোচনের নিমিত্ত মানব প্রথমে সভ্যতার সৃষ্টি করিল ও ক্রমে কৃত্রিম আবশ্যক ও সুখদ দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়া তদুৎপাদনে অধিকতর যত্নশীল হইল। ক্রমে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, দাসত্ব প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য আরব্ধ হইল; বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্যোতিস্তত্ত্বাদি প্রভৃ

প্রণীত হইল; সমাজের পূর্ণ যৌবন কাল হইল,—তখন মানব নাম সার্থক হইল। কিন্তু যেমন যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য ও তদন্তে মৃত্যু হয়, সমাজেরও সেইরূপ সভ্যতার পরে শান্তি ও তদন্তে ধ্বংস হয়। কোন সমাজ চিরকাল সমভাবে থাকে না। পূর্ণ সভ্যতার পরে কিছু কাল সমাজ সুস্থির থাকে, তদানীং সমাজের আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না। তৎপরে আর সে সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও থাকে না। বৃদ্ধের অন্তে তাহার পুত্র যেরূপ তৎস্থলাভিষিক্ত হইয়া কার্য্য করে, তদ্রূপ ঐ বৃদ্ধ সমাজের পরে আবার নূতন সমাজ সভ্য হইতে থাকে। এই জন্য প্রাচীন সভ্যজাতি মিসর, আসিরিয়া প্রভৃতির লোপ হইয়াছে এবং নবীন সভ্যজাতি ইয়ুরোপীয়েরা তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া এক্ষণে পৃথিবীর শোভা বিস্তার করিতেছেন; ভারত এক্ষণে জীবিত মাত্র রহিয়াছে।

এই সকল দেখিয়া অনেকে ভাবিতে পারেন, যখন সভ্যতা মানবের অবশ্যম্ভাবী এবং উহাতে যখন মানবের কষ্ট বৃদ্ধি হয়, তখন সভ্যতা মানবের বিড়ম্বনা। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যৌবন কাল যদি মানবের বিড়ম্বনা হয়, তবে সভ্যতাও বিড়ম্বনা হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সভ্য জাতির যে এত কষ্ট হইয়াছে, সভ্যতা নির্ব্বাচনের দোষই তাহার প্রধান কারণ। সভ্যতার প্রকৃত লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া, মানব এমত অহিতকর বিষয় সকল সভ্যতা মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে যে, কেবল তদ্দারাই সভ্যসমাজের এত দুর্গতি হইয়াছে। যদি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ সহকারে সভ্যতা নির্ব্বাচন করা যায়, তাহা হইলে কখনই এত কষ্ট হয় না এবং তাহা হইলে সমাজের দীর্ঘ-জীবী হওয়াও সম্ভব হয়। তাহার প্রমাণ স্বরূপে আমরা ভারতীয় সভ্যতার উল্লেখ করিতে পারি। ভারতীয় সভ্যতায় দোষের ভাগ অত্যল্প ছিল বলিয়া এই প্রাচীন ভারত ৭।৮ শত বৎসর ক্রমাগত অপরাপর যুবা শত্রুদিগের সহিত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ করিয়াও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। এখনও ভারতের নব উন্নতির আশা আছে। কেবল ভারতীয় সভ্যতার উৎকৃষ্টতাই এই

প্রাচীন শরীরে উন্নতির আশার হেতু। কিন্তু এক্ষণে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করিয়া ভারতকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। কিন্তু ধন্য ভারতীয় সভ্যতা! এখনও ইহা ইয়ুরোপীয় সভ্যতাকে পরাজয় করিবে, বোধ হইতেছে। আমরা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা যে ভারতীয় সভ্যতা অনেক উৎকৃষ্ট তাহা পদে পদে প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এ গ্রন্থে সে চেষ্টা করা হইল না, কেবল মাত্র স্ত্রী পুরুষ ও জাতিভেদ পদ্ধতির সমালোচনা দ্বারা ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষের উদাহরণ দেখাইয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। ভিন্ন গ্রন্থে সমস্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী পুরুষ।—স্ত্রী স্বাধীনতা।

আজি কালি স্ত্রীজাতি লইয়া বড় গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় সভ্যতা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতীদিগের মূল যুক্তি এই যে, ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ সকলকেই সমান করিয়াছেন, কাহাকেও কাহারও অধীন করেন নাই; সুতরাং কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই আপন আপন ইচ্ছা মত কার্য্য করিবে। কিন্তু আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, পৃথিবীস্থ কোন পদার্থই পরস্পর সমান নয়। সর্ব্বাবয়বে সম্পূর্ণ সমান কোনও পদার্থই আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। তবে স্ত্রী পুরুষ কি প্রকারে সমান হইবে? যখন আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে,স্ত্রী পুরুষ আকৃতি ও প্রকৃতি আদি সর্ব্বাবয়বে ভিন্ন, তখন তাহাদিগকে সমান কি প্রকারে বলিব? পুরুষের বল অধিক, শরীর ও মন দৃঢ়, হৃদয় কঠিন ও সাহস অপর্য্যাপ্ত, কিন্তু স্ত্রী অবলা, কোমলাঙ্গী, লজ্জাশীলা ও সাহসহীনা। অনেকে বলেন প্রাকৃতিক শক্তি এই পার্থক্যের কারণ নহে, অভ্যাসই ইহার

মূল কারণ। পুরুষেরা বাল্যাবধি যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, যদি স্ত্রী-দিগকে সেইরূপ কার্য্য করিতে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে, তাহারাও পুরুষের ন্যায় দৃঢ় কায়াদি গুণসম্পন্ন হইত। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, যদি স্ত্রীজাতির পুরুষের ন্যায় হইবার শক্তি থাকিত, তবে কেন হয় নাই? পুরুষ তাহাকে কি প্রকারে উক্ত সকল শক্তি বর্জ্জিত করিয়া আপনার অধীনে আনিল? যদি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিল, তবে স্ত্রী কেন পুরুষের অধীন হইল? পুরুষ কেন স্ত্রীর অধীন হইল না? এই প্রকাণ্ড পৃথিবী মধ্যে কোনও স্থানেই যে স্ত্রী পুরুষকে অধীনে আনিতে পারে নাই, অথবা পুরুষের সমান হইতে পারে নাই তাহার কারণ কি? যদি বাস্তবিক স্ত্রীর পুরুষের ন্যায় শক্তি থাকিত তাহা হইলে অবশ্য কোন না কোন কালে এবং কোন না কোন দেশে স্ত্রী পুরুষকে অধীন করিতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন পারে নাই, যখন সর্ব্ব-কালে ও সর্ব্বদেশে স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল। কেননা সকল দেশেই সমান রূপ অপ্রাকৃতিক অত্যাচার বা সমান রূপ ভ্রম হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। ইতর জন্তুর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও উহা প্রমা-ণিত হয়। প্রায় সকল জাতীয় প্রাণী মধ্যেই দেখা যায়, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতি দুর্ব্বল—যণ্ড অপেক্ষা গাভী দুর্ব্বল, অশ্ব অপেক্ষা অশ্বিনী দুর্ব্বল এবং হস্তী অপেক্ষা হস্তিনী দুর্ব্বল। যে দন্ত হস্তীর প্রধান অস্ত্র হস্তিনীর তাহা নাই। অশ্বকে ভাল রূপে শাসন করিতে হইলে তাহার পুরুষত্ব হানি করিতে হয়। একটি গোদা হনুমান কতগুলি স্ত্রী-হনু-মানের উপর প্রভুত্ব করে, তাহা যাঁহারা হনুমানের পাল দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ জানিয়াছেন। ইতর প্রাণীমধ্যে সামাজিক শাসন ও কোন প্রকার অপ্রাকৃতিক অত্যাচার না থাকিয়াও যখন তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তখন উহারা যে স্বভাবতঃ দুর্ব্বল তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্ত্রী ও পুরুষের প্রাকৃতিক অবস্থা বিবে-চনা করিলে এ বিষয় আরও বিশদ হইবে। স্ত্রীজাতির মাসিক ঋতু,

গর্ভ ধারণ, সন্তান প্রসব, স্তন্য প্রদান ও সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্য অত্যন্ত বলের হানিকর। তাহার লজ্জাশীলতা অর্থাৎ ঈপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠতা কার্য্যনাশের প্রধান হেতু। তাহার অল্পে অল্প বয়সে সন্তান জন্মে তাহাতে তাহাকে অল্প বয়স হইতেই গর্ভযন্ত্রনা ও সন্তান পালনাদি জনিত কষ্টকর ও সন্তানহিতকর কার্য্যে-ব্রতী হইতে ও সর্ব্বতোভাবে সন্তানের সুখ দুঃখের অধীন হইতে হয়; সুতরাং স্ত্রী-জাতি জ্ঞানাদি অর্জ্জন করিতে নিতান্ত অল্প সময় প্রাপ্ত হয়। পুরুষের এ সকল কিছুই নাই। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন, কোনও প্রাকৃতিক কার্য্য তাহাদের বল বা স্বাধীনতার বাধা দিতে পারে না। সভ্যতা প্রবিষ্ট না হইলে সন্তানের ভরণ পোষণের ভারও তাহাদের স্কন্ধে পতিত হইত না, তাহা হইলে সন্তান জন্ম দেওয়ার সুখ ভাগেরই মাত্র অংশ তাহারা গ্রহণ করিত, প্রতিপালনাদি কষ্টকর ভাগের অংশ গ্রহণ করিত না; ইতর জন্তু তাহার প্রমাণস্থল। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুরুষ প্রাকৃতিক স্বাধীন ও স্ত্রী প্রাকৃতিক পরাধীন এবং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কি বল কি জ্ঞান সকল বিষয়েই নিকৃষ্ট। নিকৃষ্ট হইলেই উৎকৃষ্টের অধীন হইতে হইবে, নচেৎ সবলে দুর্ব্বলে সমান বলিলে, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। অনেকে বলেন, যে, যেমন কতকগুলি শক্তি স্ত্রীজাতির পুরুষাপেক্ষা অল্প, তেমনি কতকগুলি শক্তি স্ত্রী-জাতি অপেক্ষা পুরুষের অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং পরস্পরে পরস্পরের অধীন বা উভয়েই গড়ে সমান। আমরা স্বীকার করি যে, কতকগুলি শক্তি স্ত্রী-জাতির অধিক আছে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে, যে সমস্ত শক্তি স্ত্রীজাতির অধিক আছে, তৎসমস্তই দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক ও অধীনতা-সহায়। স্ত্রীজাতির দয়া, স্নেহ, প্রণয়, লজ্জা ও ধৈর্য্য অধিক, কিন্তু ঐ সকলই দুর্ব্বলতা-ব্যঞ্জক ও অধীনতার কারণ। কেননা দয়া, স্নেহ ও প্রণয় দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহা আপনার ক্ষতি করিয়া হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দয়াদির অধীন হয়, সে আত্মবিস্মৃত হইয়া অপরের সুখের প্রতি দৃষ্টি করিতে বাধ্য

হয় সুতরাং তাহার অধীন হয়। যে প্রণয়ী হয় সে প্রণয় পাত্রের অধীন হয়, যে লজ্জা করে সে ঈপ্সিত কার্য্য করিতে অপারগ বা কুণ্ঠিত হয়, যাহার ধৈর্য্য আছে সে পরকৃত অত্যাচার বা আগত কষ্ট সহ্য করে। এই সমস্তই আত্ম-কষ্ট-জনক ও পর-মুখাপেক্ষী সুতরাং অধীনতা সহায়। এই সকল শক্তি বলে স্ত্রী আত্ম বিস্মৃত হয়। যে আত্মবিস্মৃত অর্থাৎ আত্ম হিতের দিকে যাহার দৃষ্টি অল্প সে পরের অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? যে জাতি পুত্রের ও স্বামীর মঙ্গলের জন্য আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, যে জাতি নিন্দা ও লজ্জা ভয়ে অতি সুখকর কার্য্য করিতেও বিমুখ হয়, যে জাতি সহস্র কষ্ট অকাতরে সহ্য করিতে পারিলে সুখী হয়, তাহার অধীনতাই সুখকর। এই জন্যই স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের অধীন। নতুবা যদি অধীনতা স্ত্রীজাতির স্বাভাবিক না হইত, তাহা হইলে কখনই তাহারা পুরুষের অধীন হইত না। বিশেষতঃ স্ত্রী যদি পুরুষের অধীন না হয়, তাহা হইলে সাংসারিক কার্য্য এক কালে অচল হইয়া পড়ে। যদি স্ত্রী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিত তাহা হইলে পুরুষ কখনই স্ত্রীজাতির অঙ্গজাত সন্তান পালনের ভার লইত না, যদিও লইত তাহা হইলে উভয়কেই সমান সমান কার্য্য করিতে হইত, কিন্তু তাহা হইলে নিতান্ত অমঙ্গলকর ব্যাপার ঘটিত। কেননা, শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীজাতির কোন প্রকার শ্রমকর কার্য্য করা উচিত নয়। বাস্তবিক সে সময়ে তাহাদের সেরূপ করিবার সামর্থ্যও থাকে না। কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর অধীন অর্থাৎ তাহার মতানুযায়ী না হয় তবে স্বামী কেন সে সময়ে তাহাকে সাহায্য করিবে? যখন উভয়েই সমান অর্থাৎ যখন স্ত্রী স্বাধীন বলিয়া আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া, স্বামীর বিরুদ্ধাচারী হয়, স্বামীর মতানুযায়ী কার্য্য করে না, তখন স্বামী যে কার্য্য করিবে স্ত্রীকেও তাহাই করিতে হইবে; যে পুরুষ যান বহন করে তাহার স্ত্রীও তাহাই করিবে, যে পুরুষ কৃষিকার্য্য করে তাহার স্ত্রীকেও সেই কৃষিকার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু গর্ভাদি

কালে স্ত্রী যখন তাহা পারে না ও পারিলেও অমঙ্গলের কারণ হয়, তখন অবশ্যই তাহাকে পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। ঐরূপ অধীনতা স্বীকার করিয়াছে বলিয়া অধিক কষ্টকর কার্য্য সকল পুরুষ নিজে করে এবং অল্প কষ্টকর কার্য্য সকলের ভার স্ত্রীর প্রতি প্রদান করিয়া, সুব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। আরও দেখ, যে সময়ে পুরুষের সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে তদপেক্ষা অন্ততঃ ৫। ৬ বৎসর পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির সন্তান জন্মিবার শক্তি জন্মে। সুতরাং যে স্ত্রী-পুরুষ মিলিত অর্থাৎ দম্পতী-সম্পর্ক বিশিষ্ট হয়, তন্মধ্যে পুরুষেরই বয়োধিক হওয়া স্বাভাবিক ও কর্ত্তব্য। স্বভাবতঃ কনিষ্ঠ অপেক্ষা বয়োধিকের জ্ঞান ও বল অধিক হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বত্র কনিষ্ঠ অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের সম্মান অধিক। যখন কনিষ্ঠ পুরুষ জ্যেষ্ঠের অধীন হয়, তখন কনিষ্ঠ স্ত্রী জ্যেষ্ঠ স্বামীর অধীন হইবে তাহাতে আর কথা কি? এই সকল কারণেই মনু লিখিয়াছেন--"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি"। কিন্তু যাঁহারা স্ত্রীর অধীনতাকে বন্দীর অধীনতার সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের ইহাতে অনেক ভ্রম দৃষ্টি হইবে। কিন্তু বাস্তবিক স্ত্রীর অধীনতা সে প্রকার নহে। পুত্র যেরূপ পিতার অধীন, কনিষ্ঠ যেরূপ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অধীন, স্ত্রীও সেইরূপ পুরুষের অধীন; অর্থাৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্র অপেক্ষা পিতার জ্ঞান অধিক বলিয়া যেরূপ পুত্রকে পিতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়, স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের জ্ঞান ও বল অধিক বলিয়া স্ত্রীকেও সেইরূপ পুরুষের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। নচেৎ পুরুষ যে স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে এমত নহে। পুত্র যেরূপ পিতার শাসনে সুখী ও নিরাপদ থাকে, স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীর শাসনে সুখী ও নিরাপদ হইবে; উহাতে পুরুষেরও অধীনতা থাকে, পিতা যেমন পুত্র-স্নেহের অধীন হয়েন স্বামীও সেইরূপ স্ত্রীর প্রণয়ের অধীন হইয়া পরস্পর পরস্পরের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন।

অন্তঃপুর।

ইয়ুরোপীয় সভ্যতা অন্তঃপুর প্রথারও বিরোধী; ইহারও মূল যুক্তি

সাম্যবাদ। যাঁহাদের মতে অন্তঃপুর থাকা উচিত নয় অর্থাৎ যাঁহারা বলেন পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরসৃষ্ট স্ত্রীজাতির যথেচ্ছ ভ্রমণাদি করিবার ও প্রকাশ্য স্থানে পুরুষগণগুলীসহ একত্র অবস্থান করিবার অধিকার আছে, তাঁহারা এরূপও বলিতে পারেন যে, যখন মানবের সমস্ত অঙ্গই ঈশ্বর-সৃষ্ট তখন তাহার কতগুলি অশ্লীল হওয়া উচিত নহে, সমস্ত অঙ্গই প্রকাশ্য ও অনাবৃত রাখা উচিত। কিন্তু কেন মানব সকল অঙ্গ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করে না? কি জন্য কতকগুলি অঙ্গ অশ্লীল পদবাচ্য হইয়াছে? অশ্লীল অঙ্গ সমস্ত এত দূষণীয় ও ঘৃণাকর যে, তৎসমস্ত সাধারণ সমক্ষে প্রকাশ করা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি ঐ সকলের নামমাত্র উচ্চারণ করে, তাহাকে লোকে নিতান্ত নীচ মনে করিয়া অশ্রদ্ধা করে। কিন্তু ইহার কারণ কি? যখন অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় ঐ সকলও ঈশ্বরসৃষ্ট ও যখন ঐ সকল অঙ্গের চালনা ব্যতিরেকে অনাদি অনন্ত বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কেন এমত হিতকর অঙ্গবোধক শব্দমাত্র উচ্চারণে পাপ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে কারণে অশ্লীল অঙ্গ আবরণ ও অশ্লীল বাক্য কথন নিষেধের নিয়ম হইয়াছে সেই কারণেই অন্তঃপুর প্রথার বিধান হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মানবের সন্তান-জননেচ্ছা পশুদিগের ন্যায় নিয়মবদ্ধ নহে, অর্থাৎ পশ্বাদি যেরূপ সন্তান জনন কাল ব্যতিরেকে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয় না, মনুষ্য সেরূপ নহে। তাহাদের স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনেচ্ছা সকল সময়েই হইয়া থাকে। নিয়ত স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনে যে বহু রোগ জন্মে, কার্য্য নষ্ট হয় ও অহরহ পরস্পর কলহ জন্মে তাহা বোধ হয় প্রমাণ করিবার আবশ্যক হইবে না। নিয়ত স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে রত হইলে মানব সমাজের যে কি ক্ষতি হয় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। এই মহান্ অনিষ্ট নিবারণ জন্যই উলঙ্গ মানব বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, অশ্লীল বাক্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ ভিন্ন স্থানে বাস করিবার নিয়ম করিয়াছে। কারণ সংসর্গ দোষে অনেক দোষ ঘটে। বিশেষতঃ লোভনীয় পদার্থ নিয়ত

সম্মুখে ও স্মরণপথে থাকিলে তল্লাভে নিয়ত চেষ্টা হয়; যে কার্য্য সাধন জন্য সতত চেষ্টা করা যায় তৎসাধন প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইলে, যাহাতে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় ও যাহাতে তাহা স্মরণাতীত হয় তাহাই করা উচিত। এই জন্য সুরাপান ও বেশ্যাশক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য উক্তরূপ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের নাম বিস্মৃত হইবার জন্য সাধু সমাজে প্রবিষ্ট বা নিয়ত কার্য্যলিপ্ত হইতে হয়। পুত্রশোকরূপ মহাদুঃখও মানব পুত্রকে বিস্মৃত হইবার উপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নিবারিত করে। অতএব নিয়ত স্ত্রীপুরুষ সম্মিলন পরিত্যাগ করিতে হইলে, সর্ব্বদা স্ত্রী সহবাস, অশ্লীল অঙ্গ দর্শন ও অশ্লীল শব্দ শ্রবণ ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা হইলে রিপু উত্তেজক-বিষয়-স্মৃতি সর্ব্বদা মানবকে উত্তেজিত করিতে পারে না। মানব যখন উলঙ্গ ছিল তখন নিয়ত ব্যভিচার-রত ছিল, বস্ত্রাবৃত হইয়া এই দোষের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাহাতেও দোষের শান্তি হইল না দেখিয়া অশ্লীল অঙ্গের নাম করিতে নিষেধ হইল অর্থাৎ যাহাতে ঐ সকল স্মরণ না হয় তাহার চেষ্টা হইল। তাহাতেই অশ্লীল বাক্যকথন নিষেধ হইয়াছে। নতুবা অশ্লীল বাক্য কথনে বা উলঙ্গ অবস্থানে অন্য কোনও পাপ নাই। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ একস্থানে বাস ও একত্র বিচরণ করাতে উত্তেজনার হ্রাস হইল না দেখিয়া পণ্ডিতেরা "ঘৃতকুম্ভ সমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্‌" ইত্যাদি বলিয়া স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ অবস্থান স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। তাহাতেই পুরুষ-নিবাস বা বহির্বাটী ও স্ত্রী-নিবাস বা অন্তঃপুর হইল। যে কারণে অন্তঃপুর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ বাসস্থান আবশ্যক হইল, সেই কারণে গমনাগমনের জন্য স্ত্রীপুরুষের পৃথক্ বর্ত্ম ও কার্য্যের জন্য পৃথক্ স্থান আবশ্যক হইল। অহরহ সুন্দরী রমণী দর্শনে ঋষিরও মনশ্চাঞ্চল্য জন্মে দেখিয়া, স্ত্রীর স্বামী ভিন্ন অপর পুরুষের নিকট যাওয়া উচিত নয় ব্যবস্থা হইল এবং ভ্রাত্রাদি যে সকল পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীজাতির অনেক সময়ে একত্র অবস্থান করিতে হয়, তাহাদি-

গের পরস্পর সম্মিলন নিতান্ত পাপজনক বলিয়া বিধান হইল। অন্তঃপুর না থাকিলে ও স্ত্রীদিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণে বাধা না দিলে, যে ব্যভিচার বৃদ্ধি হয় তাহা ইয়ুরোপ ও ভারতে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ডে যে এককালে অন্তঃপুর প্রথা নাই এমত নহে· এবং তথায় যে স্ত্রীজাতিরা ইচ্ছা হইলেই পুরুষের ন্যায় যথেচ্ছ ভ্রমণ ও বাস করে তাহাও নহে, তথাপি অন্তঃপুর প্রথার কিঞ্চিৎ শিথিলতা থাকাতেই তথায় কত ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। কিন্তু অন্তঃপুর প্রথার দৃঢ়তা থাকাতে ভারত সতীর আকর স্থান হইয়াছে। এক্ষণে সেই ভারতে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আগমনে অগণিত ব্যভিচার ও বেশ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে অনেকে বলেন গৃহে আবদ্ধ করিয়া সতীত্ব রক্ষার মাহাত্ম্য কি? যাহারা সর্ব্বপ্রকারে স্বাধীন থাকিয়া সতী থাকিতে পারে তাহাদেরই প্রকৃত প্রশংসা। আমরা বলি এরূপ প্রশংসা লাভে ঈশ্বর আমাদিগকে অধিকারী করেন নাই। কেননা ক্ষুধা থাকিতে সম্মুখস্থ মিষ্টান্ন ভোজন করিবেনা, চক্ষু থাকিতে সম্মুখস্থ সুন্দর বস্তু দর্শন করিবেনা, কর্ণ থাকিতে প্রাপ্ত সুমধুর গীত শ্রবণ করিবেনা ইহা যেরূপ অসম্ভব, সর্ব্বেন্দ্রিয় মনোহারিণী সুন্দরী রমণী দর্শনে মন চঞ্চল হইবে না একথা তাহা অপেক্ষাও অসম্ভব। চুম্বক সম্মুখস্থ লৌহকে আকর্ষণ করিবে না যদি বলিতে পারা যায়, তথাপি সর্ব্বজন মনোহারিণী রমণী দর্শনে পুরুষের মন চঞ্চল হইবে না, বলিতে পারা যায় না। কেননা ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সে শক্তি কোথায় যাইবে? পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলেই এই শক্তির অধীন হইয়া স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইবার যত্ন করে। তবে ঈশ্বর তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন করিয়াছেন, আমাদিগকে তদ্রূপ নিয়মাধীন না করায় আমাদিগকে সভ্যতানুমোদিত নিয়ম সকল করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। তজ্জন্য বিবাহ, পরস্ত্রী সহবাস নিষেধ, স্ত্রী পুরুষ পৃথক স্থানে অবস্থান ইত্যাদি নিয়ম সকল কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত নিয়ম না হইলে কখনই মানবের ইন্দ্রিয় দমন হইতনা। এত নিয়মের মধ্যে

থাকিয়াও অহরহ ব্যভিচার ও অধিক স্ত্রী সম্মিলন জনিত রোগ, শোক, অর্থনাশ ও বিবাদাদি হইতে মানব নিস্তার পায় নাই। যদি ঐ সকল নিয়ম না হইত তাহা হইলে মানব সমাজের দুর্গতির পরিসীমা থাকিত না। কেবল মাত্র নৈতিক উপদেশ দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নাশ হইতে পারেনা। চক্ষুর নিকট সুন্দর পদার্থ রাখিয়া বলিবে উহা দেখিতে নাই বা এরূপ দ্রব্য লইবার ইচ্ছা করিতে নাই, তাহাতেই চক্ষুর কার্য্য বন্ধ হইবে বিবেচনা করা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব ব্যভিচার যদি দোষাবহ হয়, যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষের মিলন যদি অনিষ্টকর হয় ও সতীত্বের আদর যদি আবশ্যক হয়, তবে অন্তঃপুর প্রথা অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের পৃথক অবস্থান, পৃথক ভ্রমণ ও পৃথক রূপে কার্য্য করার নিয়ম যে একান্ত আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ নাই। নচেৎ লোভনীয় বস্তু নিয়ত সুপ্রাপ্য ও দৃষ্টিপথারূঢ় থাকিয়াও মানবগণ জিতেন্দ্রিয় হইবে যাঁহারা বিবেচনা করেন, তাঁহারা পদার্থ তত্ব বুঝেন না ও বিজ্ঞানে তাঁহাদের কিছু মাত্র অধিকার নাই। আজি কালি বঙ্গবাসীগণ যে পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইতেছেন, নিয়ত স্ত্রী সন্নিধানে অবস্থান যে তাহার একটী প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বঙ্গে বেশ্যা সংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং এক্ষণে যুবকগণ ইয়ুরোপীয় প্রথার অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া অনেক সময়েই স্ত্রী সন্নিধানে অবস্থান করেন। সর্ব্বদা স্ত্রী সন্নিধানে থাকিলে শারীরিক দুর্ব্বলতা জন্মে ও সন্তানও দুর্ব্বল হয়। উহাতে যেমন অপকার হয় সেইরূপ পরস্পরের প্রণয়েরও অল্পতা হইবার সম্ভব। কেননা নিয়ত উৎকৃষ্ট পদার্থ দর্শন, স্পর্শন, আস্বাদনাদি করিলে তাহার সেরূপ স্বাদুতা থাকে না। দূরাগত বন্ধুকে দেখিলে যেরূপ উল্লাস জন্মে, নিয়ত দেখিলে সেরূপ আনন্দ হয় না। স্ত্রীপুরুষও সেইরূপ নিয়ত একত্র থাকিলে, তদনুরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারে না। বরং নানাবিধ কারণে তাহাদের অপ্রণয় জন্মিবার সম্ভব। এরূপ অবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পূরণরূপ তৃপ্তি আদৌ জন্মিতে পারে না। এই সকল বিষয় ও স্ত্রীজাতির লঘুচিত্ততা ও দৌর্ব্বল্যের বিষয়

বিবেচনা করিলে, স্ত্রী পুরুষের পৃথক স্থানে বাস ও ভ্রমণ ব্যবস্থা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইবে। নিয়ত স্ত্রী পুরুষের পরস্পর দেখা হইলে সুযোগ পাইয়া পুরুষ প্রলোভন দ্বারা স্ত্রীকে ভুলাইয়া কুপথে আনিতে পারে এবং অত্যাচারও করিতে পারে।

বিবাহ।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতীয় বিবাহ প্রথাকেও বিচ্ছিন্ন করিবার যত্ন করিতেছে। আজি কালি বিবাহ সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন আদৌ বিবাহ আবশ্যক নাই, যাহার প্রতি যখন যাহার ইচ্ছা হইবে, তখন সে তাহার সহিত মিলিত হইতে পারিবে; কেহ বলেন যে স্ত্রীর সহিত যে পুরুষের প্রণয় হইবে, সেই পুরুষ সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে ও যতদিন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ থাকিবে ততদিন তাহারা মিলিত থাকিবে, মনের মিলন ভঙ্গ হইলেই বিবাহ ভঙ্গ হইবে; কেহ বলেন বিবাহ বন্ধন চিরজীবন থাকা আবশ্যক, তন্মধ্যে কাহারও মত এই যে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পর আপনাপন স্বামী বা স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, ও কাহারও মতে পিতা মাতাই পাত্র ও পাত্রী স্থির করিয়া দিবেন; কেহ বলেন অধিক বয়সে ও কেহ বলেন অল্পবয়সে বিবাহ হওয়া উচিত; কেহ বলেন স্ত্রী পুরুষ সকলেরই পুনর্ব্বিবাহ হওয়া উচিত ও কাহার মতে স্ত্রী জাতির পুনর্ব্বার বিবাহ হওয়া উচিত নয়। আমরা এই সকল সম্বন্ধে ক্রমে বিচার করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটী বিষয় জানা আবশ্যক বোধ হইতেছে অর্থাৎ এমত কার্য্যই জগতে নাই, যাহা করিলে সার্ব্বাঙ্গীন ভাল কি মন্দ হয়। মনুষ্য কৃত কর্ম্ম দূরে থাকুক ঈশ্বর কৃতও এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা করিলে সকলদিকে ভাল হয়। যে আহার আমাদের শরীর রক্ষার নিদান তাহাই আবার শরীর নাশের কারণ, যে প্রণয় সংসারবন্ধনের মূল তাহাই বৈরাগ্যের কারণ, যে জল, বায়ু, অগ্নি ব্যতিরেকে কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না তাহারাই আবার সর্ব্বনা-

শের মূল। অতএব ভাল বলিলে এমত বুঝিতে হইবেনা যে, তাহার কোনস্থানে মন্দ নাই। যাহাতে মন্দ অপেক্ষা উত্তমের ভাগ অধিক তাহাকেই ভাল বলা যায়। নচেৎ সর্ব্বাঙ্গীন ভাল কি মন্দ পদার্থ কি কার্য্য পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। যদি কোন নিয়মকে উৎকৃষ্ট বলা যায়, তাহাতে এই বুঝিতে হইবে যে, ঐ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে যত মন্দ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা ভাল অধিক হয়। মনুষ্য যখন কোন কার্য্য দ্বারা অধিকতর অনিষ্ট হইতেছে দেখে, তখন সেই অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পায় ঐ চেষ্টা দ্বারা সমুদয় অনিষ্ট নিবারণ না হউক যথাসম্ভব অধিকতর অনিষ্ট নিবারিত হইলেই যথেষ্ট। যদ্দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকার বিদূরিত হয়, তাহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে হয়। কেননা সর্ব্ববিধ অপকার দূর হইবার নহে। অতএব উক্ত সকল বিষয় মধ্যে কোন্‌টী ভাল কোন্‌টী মন্দ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কোন্ নিয়ম অবলম্বন করিলে অল্প অনিষ্ট ঘটে ও কোন্ নিয়ম অবলম্বনে অধিক অনিষ্ট ঘটে; যদবলম্বনে অল্প অনিষ্ট ঘটে তাহাকেই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে হইবে।

বিবাহপদ্ধতি যে মানবের নিতান্ত আবশ্যক তাহা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কেননা বিবাহ প্রথা ভাল নয় এরূপ বাদী লোক অতি অল্প এবং তাঁহাদের যুক্তিও নিতান্ত দুর্ব্বল। তাঁহাদের মূল যুক্তি এই যে, বিবাহ একটী বন্ধন বিশেষ, উহাতে কোনও উপকার নাই, স্বাধীন মানব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিনা কারণে ঐ বন্ধন রজ্জু গলে দিয়া কষ্ট পাইবে কেন? পশুরা যেরূপ যথেচ্ছ স্ত্রী পুরুষে মিলিত হয় অথচ পরস্পর আবদ্ধ হয় না, মনুষ্যেরাও যদি সেইরূপে ইচ্ছাধীন মিলিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় অথচ বন্ধনজন্য কোন কষ্ট পায় না। তাঁহাদের এই মত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। কেননা যদি মানব মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত না হইত, যদি পশ্বাদির ন্যায় মানবের স্ত্রীপুরুষ সম্মিলনের

নিয়ম হইত, তাহা হইলে কোনও মনুষ্যই পিতৃ অবগত হইতে পারিত না ও কোনও পুরুষই পুত্রমুখাবলোকন সুখ অনুভব করিতে পারিত না; সকলেই কেবল মাতৃমাত্র অবগত হইত এবং মাতাই মানবের সর্ব্বস্ব হইত; তাহা হইলে স্ত্রীজাতিই কেবল সন্তান পালনে বাধ্য হইত এবং সন্তানেরা পিতার কিছুমাত্র সাহায্য পাইত না। তাহা হইলে পুরুষ জাতির কেবল নিজের ভরণ পোষণমাত্র কার্য্য হইত, সমস্ত কার্য্যই কেবল স্ত্রীজাতির উপরে নিপতিত থাকিত। এবং তাহা হইলে পুরুষজাতি পশু অপেক্ষা কোনও অংশে উৎকৃষ্ট হইতে পারিত না। বিবাহপ্রথা না হইলে সংসার হইত না সুতরাং মানবের মানবত্বের, সভ্যতা ও উন্নতির মূলীভূত সমাজ সংগঠিত হইতে পারিত না। কেননা তাহা হইলে পুরুষেরা পশ্বাদির ন্যায় নিজের আহারমাত্র চেষ্টা করিত ও ইচ্ছামত স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রী গ্রহণমাত্র করিয়া অবশিষ্ট কাল নিদ্রা ও বিশ্রামে কাটাইয়া দিত; সুতরাং সংসার স্থাপনের আবশ্যকই হইত না। কেবল ইহাই নহে, বিবাহপ্রথা না থাকিলে মানবের কোনও রূপ সুখই অদৃষ্টে ঘটিত না। দুঃখের সময় স্ত্রীপুত্রাদির সহায়তা পাইত না এবং প্রণয়জন্য যে মনোসুখ তাহার কিছুমাত্র আস্বাদ পাইত না; বিবাহ না থাকিলে পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি কাহাকেও অবগত হইতে পারা যাইত না। সুতরাং মাতৃ ব্যতিরেকে ভালবাসার পাত্র মানবের পৃথিবীতে আর কিছুই থাকিত না। মাতাও পুত্রকে চিরকাল আপনার নিকট রাখিতে পারিতেন না, কেননা নারী একাকিনী আপনার ও সন্তান সমস্তের জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিবে কেন? সুতরাং একটু বয়স হইলেই সন্তানদিগকে আপনাপন জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইত। কাযেই মাতার পুত্রস্নেহ ও পুত্রের মাতৃভক্তি বিদূরিত হইত—পশুদিগের ন্যায় মাতা ও সন্তান চিরবিচ্ছিন্ন থাকিত। অধিকন্তু অল্পবয়সেই প্রত্যেককে জীবনোপায়ের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হওয়াতে কেহই জ্ঞানোন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে পারিত না। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্যই

বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। যখন কোন পুরুষ কোন স্ত্রী গ্রহণে লোলুপ হইল, তখন ঐ স্ত্রী বলিল যদি তুমি সন্তান পালনের ভার গ্রহণ কর, যদি তুমি আমাকে বিপন্নাবস্থায় ফেলিয়া না যাও, তবে আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি; স্বাভাবিক শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষকে স্ত্রীর ঐ সকল প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল; তাহা হইতেই বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পুরুষেরা পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃ-প্রীতি, পিতৃভক্তি ও রমণী-প্রেমের মর্ম্ম অবগত হইয়া, বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করিয়াছেন। নচেৎ বিবাহ না করিলে যদি মানবের অসু-বিধা না হইত তাহা হইলে কেহই স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ঐ বন্ধন-রজ্জু গলে পরিত না ও কখনই পৃথিবীর সকল দেশে বিবাহ প্রথা প্রচলিত হইত না। মানব সভ্য হইয়া পশুরীতি পরিত্যাগ করিয়া সভ্য বিবাহ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে, অতএব যাঁহারা বলেন বিবাহ পদ্ধতি ভাল নহে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

প্রণয়ান্ত বিবাহ প্রথারও ঐ দোষ। যতদিন মনোমিলন থাকে ততদিন বিবাহবন্ধন থাকিবে, তাহার অভাব হইলে বিবাহ ভঙ্গ হইবে ও অপরকে বিবাহ করিবে যদি এ নিয়ম হয় তাহা হইলেও প্রায় পশু প্রথা হইয়া যায় অর্থাৎ বিবাহ না হওয়ার তুল্য ফল হয়। কেননা জগতে যত স্ত্রী পুরুষের মনোমিলন দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকংশই অবস্থাজন্য। যেমন কোনও ব্যক্তি দরিদ্রাব-স্থায় থাকিয়া মাসিক দশ টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির অবস্থা যখন উন্নত হয় তখন তাহার শত মুদ্রায়ও সংকুলন হয় না এবং যদি সে কখনও রাজা হইতে পারে তাহা হইলে তখন তাহার লক্ষ মুদ্রাতেও তৃপ্তি হয় না, সেইরূপ মানবের যখন স্ত্রী মাত্রই পাওয়া দুর্ঘট, তখন একটী সামান্যা স্ত্রী পাইলেই সে তুষ্ট হয়। কিন্তু যখন সে দেখে যে, পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্ত্রী পাইতে পারে, তখন আর পূর্ব্ব পরিণীতার উপর অনুরাগ থাকে না, উৎকৃষ্টতর স্ত্রী গ্রহণে তাহার লালসা হয়। আবার এমনও অনেক সময়ে ঘটে যে, প্রথমে যে স্ত্রীকে উৎকৃষ্ট দেখিয়া কেহ বিবাহ

করিয়াছে পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেখিতে পাইয়া, পূর্ব্বার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নবীনার প্রতি লালসা হয়। তদ্ভিন্ন অনেক মানব বয়স্থা অপেক্ষা নবীনা রমণীকে অধিক ভাল বাসে। এইরূপ অনেক কারণ আছে যদ্দ্বারা নিয়ত মানবের পূর্ব্ব পরিণীতা স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা ও নূতন স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি অনুরাগ জন্মে। সুতরাং মনোমিলনান্ত বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে বিবাহ প্রায়ই স্থায়ী হয় না, নিয়তই বিবাহ ভঙ্গ হইতে থাকে। তাহাতে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হয় না, স্ত্রী ও স্বামীর প্রতি সহানুভূতি থাকেনা এবং পিতা, ভ্রাতৃ, পুত্র প্রভৃতির প্রতি তাদৃশ ভক্তি, শ্রদ্ধা বা স্নেহ থাকে না। কেননা এরূপ হইলে, মাতার অনেক স্বামী, পিতার অনেক স্ত্রী এবং মাতৃ ও পিতৃ সম্বন্ধে বহুতর ভ্রাতা ভগিনী হইবার সম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ হইলে সন্তানদিগকে পিতা কিম্বা মাতা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং পুরুষ কিম্বা স্ত্রীকে সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয়। কেননা অধিক স্থলে বিবাহের অল্প দিবস পরেই সন্তান হইয়া থাকে; সুতরাং যত বিবাহ ভঙ্গ হয়, তাহার অধিকাংশই সন্তান জন্মের পরে হওয়া সম্ভব। সে সময় পিতা মাতা বিচ্ছিন্ন হইলে একতরকে সন্তান পরিত্যাগ করিতে হয় এবং সন্তানেরও একতর বিচ্ছেদ ঘটে। এতদ্ভিন্ন নিয়ত স্ত্রী পরিবর্ত্তন হইলে কোন গৃহেরই সুশৃঙ্খলা থাকেনা। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা লইয়াই মানবের গৃহ এবং ঐ রূপ গৃহ সমষ্টিই সমাজ। যে গৃহে স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী ও পিতা মাতার দৃঢ় সম্বন্ধ নাই সে গৃহ গৃহই নহে ও তদ্রূপ গৃহসমষ্টি সমাজই নহে। এই সকল কারণে বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করা অতি আবশ্যক হইয়াছে ও ইচ্ছামাত্রেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে বিবাহ আজীবন সম্বন্ধ যুক্ত করা হইয়াছে; এই দৃঢ় বন্ধন হইয়াছে বলিয়াই মানব মধ্যে এরূপ পিতৃ মাতৃ ভক্তি, অপত্য স্নেহ, দাম্পত্য প্রেম, ভ্রাতৃবৎসলতা, আত্মীয়স্বজন প্রীতি, জাতীয়তা ও সামাজিকতা জন্মিয়াছে। এই সমস্তই মানবের মানবত্ব ও পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। ঐ সমস্ত না

থাকিলে পশুর ন্যায় মানবও বনচর জন্তু বিশেষ হইত, কখনও এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি হইতে পারিতনা। অতএব বিবাহ বন্ধনের দৃঢ়তাই মানবত্বের কারণ সুতরাং অত্যাবশ্যক।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ভাল কি ব্রাহ্ম বিবাহ ভাল অর্থাৎ দয়িত নির্ব্বাচনের ভার যুবক যুবতীর উপর থাকা উচিত কি পিতা মাতার হস্তে থাকা উচিত। যাঁহারা প্রথমোক্তের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন, যে, বিবাহ যখন আজীবন সম্পর্কযুক্ত ও যখন স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মনোমিলন না হইলে চিরকাল পরস্পরকে কষ্ট পাইতে হয়, তখন স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণ কালে মনোজ্ঞ দেখিয়া গ্রহণ করা উচিত এবং যাহারা ঐ সুখ দুঃখের ভাগী, তাহাদেরই হস্তে নির্ব্বাচন ভার থাকা উচিত। আমাদের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা অল্পবয়স্ক ও অনভিজ্ঞ যুবক যুবতীর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ও জ্ঞানী পিত্রাদির উৎকৃষ্ট পাত্র নির্ব্বাচনের শক্তি অধিক। যে বয়সে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় বা হওয়া উচিত, সে বয়সে মানব পৃথিবীর কোন বিষয়ই জ্ঞাত হইতে পারে না। এমত অজ্ঞান ‑ স্থায় জটিল মানব চরিত্র বুঝিবার শক্তি কি প্রকারে হইবে? বিশেষতঃ এমত অনেক লোক আছে যে, তাহাদের বাহ্যিক ব্যবহার অতি মধুর বোধ হয় কিন্তু তাহাদের হৃদয় ভয়ানক হলাহল পূর্ণ এবং অনেকের হৃদয় অমৃতময় কিন্তু বাহ্যিক দৃশ্য অতি কর্কশ বোধ হয়। আবার অনেক মনুষ্য স্বীয় কার্য্য সাধন মানসে আত্ম কুটিল প্রকৃতি গোপন করিয়া এরূপ সাধুশীলতা প্রদর্শন করে, যে তাহা দেখিয়া অতি জ্ঞানী ব্যক্তিও প্রতারিত হয়েন। অনেক সময়ে প্রাচীন দিগেরও ঐ দুশ্চরিত্রদিগকে সাধু বলিয়া ভ্রম জন্মে। অতএব বাহ্যদর্শন-কুশল সরল প্রকৃতি অল্প বয়স্ক যুবক যুবতীর ঐ সকল বুঝিবার শক্তি কোথায়? তাহারা ত নিতান্ত সরল প্রকৃতি, কুটিলতা কাহাকে বলে তাহা এখনও তাহারা শিখে নাই, এ সংসার এরূপ কুটিলতা পূর্ণ যে,

অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নিয়ত একত্র থাকিয়াও নিতান্ত আত্মীয় ও নিকটস্থ প্রতিবেশির প্রকৃত হৃত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না, প্রাচীন কালেও তাঁহারা অনেক সময়ে নিতান্ত আত্মীয় কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েন। এরূপ অবস্থায় যুবক যুবতীরা যে পদে পদে বঞ্চিত হইবেন তাহাতে আর কথা কি? বিশেষতঃ রূপই তাহাদের মনোজ্ঞতার প্রধান উপকরণ। ঐ প্রবৃত্তির অধীন হইলে মানবগণ প্রায়ই কঠিন ত্বগাবৃত নারিকেল ত্যাগ করিয়া সুন্দর-দর্শন বিম্বফল গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং। বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্ন মিতরে জনাঃ॥" কিন্তু রূপে মুগ্ধ হইলে গুণ দেখিবার শক্তি কোথায় থাকে? বিশেষতঃ পাত্র ও পাত্রীর কেবল যে রূপগুণ দেখিতে হইবে এমত নহে। তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক অর্থাৎ পাত্র ও পাত্রী পরস্পর অনুরূপ বয়স্থ কি না, সমুচিত বিদ্যাসম্পন্ন কি না, সুস্থ ও সবল শরীর কি না, তাহাদের ধনসঞ্চয় বা ধনোপার্জ্জনশক্তি কিরূপ, কিরূপ কুলে তাহাদের জন্ম অর্থাৎ তাহাদের পিতা মাতা সচ্চরিত্র কি অসচ্চরিত্র ও তাহাদের কুল-সংক্রামক কোন রোগ আছে কি না, তাহাদের পরস্পরের ব্যবসা ও অবস্থাগত চরিত্রে মিলন হইতে পারে কি না ইত্যাদি অনেক বিষয় দেখা আবশ্যক। ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী কি এই সকল অনুসন্ধান করিতে পারে? না রূপে মুগ্ধা হইলে ঐ সকল অনুসন্ধান করিতে যুবতীর প্রবৃত্তি হয়। প্রণয় জন্মিলে প্রণয়পাত্রকে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট বোধ হওয়াই সঙ্গত, অথবা প্রণয় পাত্রকে মনোমত গুণসম্পন্ন বোধ হওয়াতেই তাহার সহিত প্রণয় জন্মে। সুতরাং গুণ দেখার আবশ্যক থাকে না। প্রণয়াকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে মানব দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়। এইজন্য "যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাড়ী কিবা ডোম" প্রবাদ হইয়াছে। বাস্তবিক প্রণয়াকর্ষণ জন্মিলে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় না; তখন নিজে প্রণয় পাত্রের দোষ অনুসন্ধান করা দূরে থাকুক, অন্যে দেখাইয়া দিলেও দেখিতে চায় না। কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ

মিলন না হইয়া কেবলমাত্র আকৃতিকাকর্ষণজ গুণনিরপেক্ষ প্রণয় মানবের অধিক দিন স্থায়ী হয় না। নবযৌবনের প্রারম্ভে বা প্রণয় জন্মিবার আরম্ভ কালে, উভয়ে যতদিন মত্ত থাকে ততদিন পরস্পরের প্রণয় থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যখন দোষাবলী বুঝিবার অবসর হয়, যখন অযথা মিলনের অপকারিতা বুঝিতে পারে, তখন উভয়ের কষ্টের সীমা থাকে না। যদিও কোন কোন দম্পতি চির-উন্মত্ত থাকে, তাহাতেও সমাজের সমূহ অনিষ্ট ঘটে। অতএব যুবক যুবতীর উপর দয়িত নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া কোনও ক্রমে উচিত নয়। দয়িত নির্ব্বাচনের ভার যুবক যুবতীর প্রতি থাকিলে আরও অনেক দোষ ঘটে। যে যুবক যে যুবতীর প্রতি অনুরাগী হয়, সে যুবতী যে সেই যুবকের প্রতি অনুরাগিনী হইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? অনেক সময়ে দেখা যায় কোন যুবা, যে যুবতীকে ভালবাসিয়াছে সেই যুবতী ঐ যুবককে ঘৃণা করে, এবং ঐ যুবতী যে যুবকের প্রতি অনু-রাগিনী হইয়াছে সেই যুবক তাহাকে ইচ্ছা করে না। এরূপ স্থলে যুবক যুবতীর মনোমত দয়িতলাভ কি প্রকারে হইবে? অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় চিরকালের জন্য তাহাদের মনের শান্তি নষ্ট হইয়া যায়। আবার এরূপও হইতে পারে যে, যুবক যুবতীগণ আপনাপন অবস্থা বিবেচনা না করিয়া দুর্লভ পাত্রে প্রণয় স্থাপন করে। ঐরূপ প্রণয় প্রবৃত্তি প্রায়ই চরিতার্থ হয় না; হইলেও সমূহ অনিষ্টের কারণ হয়। দরিদ্র সন্তান ধনিকন্যা, মূর্খ পুত্র বিদ্যাবতী কন্যা, কৃষক পুত্র বণিগ্বালা ও বঙ্গ যুবা ইংরাজ যুবতীর প্রতি আসক্ত হইলে পরস্পরের মিলন হওয়া দুর্ঘট হয়, হইলেও শুভ ফলপ্রদ হয় না। অতএব যুবক যুবতীর প্রতি দয়িত নির্ব্বাচনের ভার দিলে কোনও অংশে শুভফলপ্রদ হয় না। যুবক যুবতীর হিতৈষী ও বহুজ্ঞ পিতার প্রতি নির্ব্বাচনের ভার থাকিলে সকল দিকেই মঙ্গল হইবার সম্ভব। তাহা হইলে তিনি অভিজ্ঞতাবলে উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের সুখসম্পাদন করিতে পারেন অথচ যুবক যুবতীকে নৈরাশ্যজনিত কোন প্রকার মনস্তাপ পাইতে হয় না। বাস্তবিক যুবক

যুবতীর অপেক্ষা পিত্রাদির নির্ব্বাচন যে অধিক হিতকর হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। ইংলণ্ডীয় বিবাহ ভঙ্গের বাহুল্য ও ভারতীয় নরনারীর দাম্পত্যানুরাগ ইহার উৎকৃষ্ট সাক্ষী। তথাপি ভারতীয় নির্ব্বাচন প্রণালীর উৎকৃষ্ট ফল এক্ষণে দেখাইবার উপায় নাই। কেননা এক্ষণে কতকগুলি দোষ প্রবিষ্ট হওয়াতে অনেক সময়ে পিত্রাদি উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে অশক্ত হয়েন। যদি ঐ সকল দোষ সংশোধিত হয়, যদি বঙ্গীয় কৌলীন্য প্রথা, বহু বিবাহ ও কন্যা বিক্রয় প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্র বিরোধী কদর্য্য ব্যবহার গুলির সংশোধন হয়, তাহা হইলে পিত্রাদির পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন সর্ব্বদোষ শূন্য হইতে পারে। আমরা বোধ করি তাহা হইলে ভারত দম্পতি-প্রণয়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থান হয়। যুবক যুবতীর মতানুসারে বিবাহ হওয়ার পদ্ধতি যে ভাল নয় তাহা আরও একটী বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝা যায়। ভারতে উক্ত পদ্ধতি নিতান্ত অজ্ঞাত ছিল না, পূর্ব্ব কালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা ভারতে বিশেষ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঋষিগণ উহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াই এক্ষণে উক্ত প্রথা রহিত করিয়াছেন। উহাদ্বারা অনিষ্ট না হইলে কখনই উহা রহিত হইত না। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ম্বর প্রথা স্বাভাবিক সুতরাং উহা অসভ্যতা, ব্রাহ্ম বিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক সুতরাং উহা সভ্যতা। সভ্যতা যদি অসভ্যতা অপেক্ষা ভাল হয়, তবে ব্রাহ্মবিবাহও গন্ধর্ব্ব বিবাহ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ কি? এই জন্যই পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে কেবলমাত্র যুবক যুবতীর মতানুসারে বিবাহ দেওয়া হয় না। যাঁহারা মনে করেন ইয়ুরোপে যুবক যুবতীর মতানুসারেই বিবাহ হইয়া থাকে তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বাস্তবিক ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে পিতামাতার অনভিমতে কোন বিবাহ হয় না। তথায় যুবক যুবতীদিগের মত লওয়া হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহারা যে পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করে তাহা যদি পিতার অনভিমত হয়, তাহা হইলে সে বিবাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে প্রকৃত গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলা যায় না। অধিকন্তু তাহাতে অনেক অঘটন ঘটিয়া থাকে।

অনেকে প্রণয়াকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে না পারিয়া আত্মবিনাশ সাধন করে ও অনেকে চিরকালের জন্য প্রণয়নৈরাশ্যজনিত দুঃখে ভাসিতে থাকে। অতএব উক্তরূপ মত গ্রহণ করা অপেক্ষা আদৌ তাহাদের মতের অপেক্ষা না করাই ভাল। তবে যে সকল পাত্রে বিবাহ দেওয়া পিতামাতার অভিমত সেই সকলের মধ্য হইতে মনোজ্ঞ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা পুত্রকে দেওয়ায় উপকার আছে। কেননা তাহাতে নৈরাশ্য বা মন্দ নির্ব্বাচনের আশঙ্কা নাই।

বাল্য বিবাহ।

এক্ষণে কিরূপ বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত দেখা আবশ্যক। আজি কালি ইয়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ বাল্যবিবাহের নিতান্ত বিরোধী। তাঁহারা বাল্য বিবাহের সমস্তই দোষ দৃষ্টি করেন, গুণ কিছুই দেখিতে পান না। কিন্তু যখন প্রমাণ হইল গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমূহ অনিষ্টকর তখন মানবের স্বতঃ বিবাহ করিবার ইচ্ছা জন্মিবার পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা তাহা হইলে নির্ব্বাচিত পতি পত্নীর অলাভ নিবন্ধন মানবকে কষ্ট পাইতে হয় না। বিশেষতঃ ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, বিবাহ বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্যে বাল্য বিবাহ যেরূপ উৎকৃষ্ট উপায় এরূপ আর কিছুই নহে। বাল্য কালে মানবের যেরূপ অকৃত্রিম প্রণয় জন্মে অর্থাৎ বাল্যকাল জাত প্রণয় যেরূপ দৃঢ় ও স্থায়ী হয় অন্য কোন সময়ে সেরূপ হয় না। এই জন্য বালসখা হৃদয়ের অতি যতনের ধন। যাহাদিগের সহিত একত্র বাল-ক্রীড়া ও বিদ্যাভ্যাস করা যায় তাহারা অকৃত্রিম প্রণয় পাত্র হয়, কোন কালেই তাহাদের প্রণয় বিস্মৃত হইতে পারা যায় না। অতএব যে স্ত্রী পুরুষ বাল্যকাল হইতে মিলিত হয় তাহাদের প্রণয় যে দৃঢ় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে কালে হৃদয় কোমল ও নির্ম্মল থাকে, যখন স্বার্থপরতা বা ইন্দ্রিয়-বিকার মনকে কলুষিত করে না, যখন সাংসারিক জটিল ভাব সকল মিশ্রিত হইয়া হৃদয় বক্রীভূত হয় নাই, যে সময়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস

এককালে হৃদয়ে স্থান পায় নাই, সেই পবিত্র বাল্যকালে যে সহচরের সহিত নিতান্ত অকৃত্রিম ও সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই কালের হৃদয়স্থ প্রণয়াঙ্কন প্রস্তরে লৌহাঙ্কনের ন্যায় চিরস্থায়ী হয়। তাহার সহিত তুলনায় বয়োধিকের প্রণয় প্রণয়ই নহে। মানব যত বয়োধিক হইতে থাকে ততই তাহাদিগের স্বার্থপরতা, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ইন্দ্রিয়বিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে ও ততই তাহারা সাংসারিক চাতুরি শিক্ষা করিয়া কুটিল হৃদয় হয়। সুতরাং তখনকার প্রণয় প্রায়ই নিমিত্ত-সম্ভূত হইয়া থাকে। তখন কেহ রূপ ও কেহ গুণে মুগ্ধ হইয়া, কেহ অর্থলুব্ধ হইয়া ও কেহ কোন কার্য্য সাধন মানসে প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকে। বালক বালিকার ন্যায় নিঃস্বার্থ ও অনৈমিত্তিক প্রণয় তাহাদের হইবার যো নাই। তাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত হইলে বা নিমিত্তের অভাব হইলে তজ্জাত প্রণয়ও দূরীভূত হয়। কিন্তু বাল্যকালের প্রণয় যখন স্বার্থ বা নিমিত্ত মূলক নহে, তখন কোনও স্বার্থ বা নিমিত্ত সেই নিঃস্বার্থ অকৃত্রিম প্রণয়কে নষ্ট করিতে পারে না। তাহাদের সেই বাল্য মিলন জাত প্রণয় নিসর্গোৎপন্নের ন্যায় হইয়া হৃদয়ের সহিত এরূপ দৃঢ় সম্বন্ধ হইয়া যায় যে, তাহা প্রাণ থাকিতে নষ্ট হয় না। অতএব (যখন বিবাহ বন্ধন যাবজ্জীবনের জন্য দৃঢ় করা একান্ত আবশ্যক তখন বাল্যকালে বিবাহ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে উচিত। তাহা হইলে দাম্পত্য-প্রণয় আজীবন দৃঢ় থাকিবার অধিক সম্ভব। অধিক বয়সে বিবাহে যে, সেরূপ হইতে পারে না, ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহার প্রমাণ; অধিক বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই তথায় নিত্য সহস্র সহস্র বিবাহ ভঙ্গের কারণ হইতেছে। কিন্তু ভারতে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া দূরে থাকুক, তথায় পতির মৃত্যুতে সতী আত্মদেহ বিসর্জ্জন করে।) যাঁহারা বলেন পরে বিবাহ করিতে পারিবে না, এই সামাজিক নিয়ম থাকাতেই ভারতীয় স্ত্রীরা সহমৃতা হইত, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। তাঁহারা কি জানেন না যে, যে সকল স্ত্রীরা সহমৃতা হইত তাহার অধিকাংশই অধিক বয়স্কা, এমন

কি অনেকে ৮।১০ পুত্রের মাতা? এরূপ বয়স্থা স্ত্রীর ইন্দ্রিয়-বিকার এত প্রবল মনে করা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে না পারার ভয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। তাহা যদি হইত তাহা হইলে যে সকল কুলীন কন্যাদিগের ও ইয়ুরোপীয় কুমারীদিগের বিবাহ হইবার আশা ত্যাগ হইয়াছে তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজনও প্রাণত্যাগ করিত এবং আধুনিক হিন্দু বিধবা গণও উপায়ান্তর অবলম্বনে প্রাণত্যাগ করিত। কিন্তু তাহা যখন কেহ করে না, তখন উক্তরূপ কল্পনা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। অকৃত্রিম প্রণয় ও তদুপযোগী কর্ত্তব্য জ্ঞানই যে সহমরণের কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

বাল্য বিবাহে অধিক প্রণয় জন্মিবার আর এক কারণ এই যে, তখন স্ত্রী পুরুষ কোন বিশেষ সংস্কারাধীন হয় না, সুতরাং বিবাহান্তে উভয়ই এক রূপ সংস্কারবিশিষ্ট হওয়াতে অধিক প্রণয়বান হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী ও পুরুষের ভিন্নরূপ বিশ্বাস ও সংস্কার জন্মিতে পারে। তাহাতে পরে মনোভঙ্গ হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। পুরুষের ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি ও স্ত্রীর হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া যাওয়ার পর উভয়ে যদি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কখনও তাহাদের মনোমিলন হইতে পারে না। কেননা তখন কেহ কাহারও বদ্ধমূল সংস্কার ও বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারে না। বাল্য বিবাহের আর একটী উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ সময়ে মিলন কালে দম্পতীর মনে কোনও অপবিত্র ভাবের উদয় হয় না। সে সময়ে তাহারা যেন কোন স্বর্গীয় ভাবে মিলিত হইতেছে বোধ করে। অধিক বয়সে বিবাহে পবিত্রতা দূরে থাকুক, অশ্লীল ও অপবিত্র ভাব নিয়ত মনে জাগরূক থাকে। বিশেষতঃ অধিক বয়সে বিবাহে স্ত্রী জাতির অতি কদর্য্য ব্যবহার প্রকাশ পায়। কেননা স্ত্রী জাতিকে পিতৃমাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বামী গৃহে যাইতে হয়। আজন্ম সহচর, হৃদয় সর্ব্বস্ব, পরমোপকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর স্নেহরজ্জু ছেদন করিয়া ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া অপরিচিত বা ক্ষণ

পরিচিত পুরুষের সহিত অপবিত্র ভাবে যাওয়া কি যুবতীর পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ও কৃতঘ্ন ব্যবহার নয়? উহা কি রমণীর মানবোচিত কার্য্য না সভ্যতার চিহ্ন? ঈশ্বর কি রমণী হৃদয় এমন কঠিন করিয়াছেন, যে যুবতীগণ অক্ষুণ্ন মনে সমস্ত স্নেহ মমত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃদয়সর্ব্বস্ব প্রাণসম পিতা মাতাকে চিরজীবনের মত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ পরিচিতের সহিত চলিয়া যাইতে পারে? সেই ষোড়শী কিবিংশীকে ধিক্, যে এবম্বিধ পিতা মাতাদির এত অকৃত্রিম প্রণয় উপেক্ষা করিয়া এক জন পথিকের সহিত অপবিত্র ভাবে গমন করে। এই দৃশ্য কি পবিত্র? কখনই নহে। এই পশু ব্যবহার কখনও মানবোচিত নহে। বাল্য বিবাহে বালিকাকে এরূপ রাক্ষসোচিত ব্যবহার প্রকাশ করিতে হয় না। পিতা বালিকার জন্য সদৃশ বন্ধু আনয়ন করিয়া অল্প বয়সেই এরূপ ভাবে তাহার সহিত মিলাইয়া দেন যে, বালিকা পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই ঐ যুবাকে পিতৃনির্দ্দিষ্ট ও দত্ত পরমবন্ধু বলিয়া জানিতে পারে। বাল্যকাল হইতে পুনঃ পুনঃ পিতৃ ভবনে ও শ্বশুরালয়ে তাহাকে দেখিয়া, স্বামীকে চিরপরিচিতের ন্যায় মনে করে ও ক্রমে ক্রমে স্বামী ভ্রাত্রাদি বাল সহচর তুল্য হইয়া পড়ে। পবিত্র ভাবে তাহাদের পরস্পরের প্রণয় জন্মে। অতএব যদি পবিত্রতা, প্রণয়, কৃতজ্ঞতা ও লজ্জা সভ্য ব্যবহার হয়, অশ্লীলতা পরিত্যাগ যদি মানবীয় ব্যবহার হয়, তবে বাল্য বিবাহ যে সভ্যতানুমোদিত তাহাতে সন্দেহ কি? বাস্তবিক অধিক বয়সে বিবাহ স্বাভাবিক সুতরাং অসভ্যতা এবং বাল্য বিবাহ কৃত্রিম ও উপকারক সুতরাং সভ্যতা। কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত নয়। তাহাতে নানা দোষের উদ্ভব হইতে পারে। উভয়েরই অল্প বয়সে বিবাহ হইলে অপক্ক বীজে দুর্ব্বল সন্তান জন্মিতে পারে, মানবগণ অল্প বয়সে প্রণয়মগ্ন ও সন্তান ভারে জড়িত হইয়া জ্ঞানার্জনে অশক্ত ও অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হয়। পুরুষ জাতির কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দিলে এই সকল দোষ নি-

বারিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দেখা যাইতেছে যে, স্ত্রী অপেক্ষা অন্ততঃ ৫। ৬ বৎসর পরে পুরুষের সন্তান জনন শক্তি জন্মে। সুতরাং অধিক বয়স্ক পুরুষের সহিত অল্প বয়স্কা স্ত্রীর বিবাহ হওয়া স্বভাবতঃ উচিত। বিদ্যা শিক্ষা ও ধনোপার্জ্জনাদি আবশ্যক জন্যও পুরুষের কিছু বিলম্বে বিবাহ হওয়া আবশ্যক। যখন স্ত্রীজাতির ন্যায় পুরুষকে বিবাহান্তে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় না ও যখন তাহাকে শিক্ষাদিতে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, তখন পুরুষের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে বিবাহ হইলে অধিক বয়সে বিবাহ জন্য দোষ ঘটে না। বরং তাহাতে অপকৃবীর্য্যে সন্তান জন্ম দোষ ঘটে না। কেননা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, অধিক বয়স্ক পুরুষের ঔরসে অল্প বয়স্কা নারীর গর্ভে জাত সন্তান, দুর্ব্বল হয় না। এই জন্য মনুর মতে ৮ বৎসরের স্ত্রী ও ২৪ বৎসরের পুরুষ অথবা ১২ বৎসরের স্ত্রী ও ৩০ বৎসরের পুরুষের পরস্পর বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের বোধ হয় এক্ষণে দেশ ধর্মানুসারে ১০।১২ বৎসরের স্ত্রীর সহিত ২০।২২ বৎসরের পুরুষের বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা পূর্ব্ব কালের ন্যায় মানব এক্ষণে দীর্ঘজীবী নয় এবং এক্ষণে পূর্ব্বকালের ন্যায় বেদপাঠের আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে ২০ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে সিবিল সার্ভিস পর্য্যন্ত পরীক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন যে, বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে পুরুষের বিবাহকাল বৃদ্ধি করা হইল, স্ত্রীর হইল না কেন? স্ত্রী কি বিদ্যাশিক্ষা করিবে না? আমরা বলি, স্ত্রী জাতিরও বিদ্যাশিক্ষা করা আবশ্যক বটে, কিন্তু পুরুষের ন্যায় তাহাদের অধিক শিখিবার আবশ্যকতা নাই। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহে তাহাদের উপযোগী শিক্ষার বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা নাই। আমরা বিবেচনা করি, শিক্ষা বা উপার্জ্জনাদিতে নিযুক্ত নয় এমত সকল ধনী সন্তানের আরও ২। ৪ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া উচিত। কেননা তাহাদের কোনও কার্য্য না থাকায় তাহাদের যৌবন লাভের পূর্ব্বেই দুষ্ক্রিয়াশক্তি জন্মিতে বা অপাত্রে প্রণয় স্থাপন হইতে পারে। এরূপ

চেষ্টার পূর্ব্বেই তাহাদের বিবাহ দিলে ঐ দোষ নিবারিত হইবার সম্ভব।

সবর্ণ-বিবাহাদি।

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতিকে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। বাস্তবিক যত অনুসন্ধান করা যায় ততই উহার উৎকৃষ্টতা বুঝিতে পারা যায়। উপযুক্ত বরকন্যা স্থির করিবার জন্য ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতি মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট বিধান দৃষ্ট হয় কোন দেশীয় বিধানে তদ্রূপ দেখা যায় না। বরকন্যার অনুরূপ বয়স, সম্বন্ধ বা জাতীয় বিষয় বিচার করিবার নিয়ম ভারতে যেরূপ আছে অন্য কোন দেশে সেরূপ নাই। ইংলণ্ডাদি দেশে অধিক বয়স্কা স্ত্রীর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের এবং জ্ঞাতি ও নিতান্ত আত্মীয় কুটুম্বের পুত্রকন্যার পরস্পর বিবাহ হইবার রীতি আছে। এবং তথায় স্ত্রী পুরুষের জাতি বিষয়ে আদৌ বিচার করা হয় না। কিন্তু ঐ সকল অত্যন্ত অপকৃষ্ট, সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ ও নিতান্ত ক্ষতিকর। কেননা যখন দেখা যাইতেছে যে, স্বভাবতঃ যে বয়সে স্ত্রী যুবতী হয় সে বয়সে পুরুষ বালক থাকে, তখন অধিক বয়স্কা স্ত্রীর সহিত অল্প বয়স্ক পুরুষের অথবা পরস্পর সমবর্ষীয়ের বিবাহ যে স্বভাববিরুদ্ধ ও ক্ষতিকর তাহাতে সন্দেহ কি? আমাদের দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা উহার কষ্ট বিলক্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন। জ্ঞাতি ও পিতৃমাতৃ বন্ধুর পুত্রকন্যাদিগের পরস্পর বিবাহে অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা দোষ, বিবাদ ও নানা অসুবিধা জন্মিতে পারে। তদ্ভিন্ন সমান রক্তের স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন-জাত সন্তান যে অনেক দোষযুক্ত হয় তাহা ইয়ুরোপীয়েরাও স্বীকার করিয়াছেন। যে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় তাহারা যদি স্বজাতি অর্থাৎ সমব্যবসায়ী ও সমান অবস্থাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে পরস্পরের কার্য্যের সুবিধা ও মনের মিলন হইবার অধিক সম্ভব। নতুবা উভয়ের প্রকৃতি ও অভ্যাস ভিন্ন প্রকারের হইলে মনের তাদৃশ মিলন হয় না ও কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই সকল কারণে ভারতে অসবর্ণ বিবাহ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব বিবাহ নিষেধ

হইয়াছে এবং বর অপেক্ষা কন্যা কনিষ্ঠ হইবার বিধান হইয়াছে। সবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধীয় আর আর কথা জাতিভেদ প্রকরণে বিবেচ্য।

ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতির আর একটী অতি উৎকৃষ্ট গুণ এই যে, ঐ প্রণালী অনুসারে বিবাহে বর কন্যার মনে ইন্দ্রিয়বিকার শূন্য অতি পবিত্র, স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। সরলা বালিকাকে হৃদয় সর্ব্বস্ব, আজন্ম সহায়, পরম প্রণয়াস্পদ, পিতামাতাদি পরিত্যাগ করিয়া যে অপরিচিতের সহিত চিরকাল বাস করিতে হইবে, তাহার সহিত মিলন করিয়া দিবার জন্য ভারতীয় বিবাহ পদ্ধতি অতি উৎকৃষ্ট উপায়। উহা নিতান্ত হৃদয়গ্রাহী ও প্রকৃত নব-হৃদয় সংযোজনের উপযুক্ত। ভারতে বর কন্যা ও সর্ব্বসাধারণে বিবাহকে একটী অবশ্য কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ ও বিবাহ দিনকে একটী শুভদিন মনে করেন। বিবাহব্যাপারে নানাবিধ গীতবাদ্য, আত্মীয় ও বহুবিধ লোক সমাগম, ভূরি ভোজন, দরিদ্রাদিকে অর্থ দান, উপগত পিত্রাদির শ্রাদ্ধ, গৃহাদির পারিপাট্য ও সজ্জা, বরকন্যা ও সহযাত্রীদিগের বেশভূষা ও নানাবিধ আমোদ, আত্মীয়তা ও সৌহার্দ্দ মিশ্রিত থাকায় উহা একটী মহোৎসবের ন্যায় হয় ও বিবাহের সংস্কার নাম সার্থক হয়। উহাতে নরনারীর মন এরূপ মিলিত করে যে, বিবাহ দৃঢ়ীকরণ জন্য সাক্ষী ও রেজিষ্টারির প্রয়োজন হয় না। এরূপ পবিত্র ও মনোমিলনকর বিবাহ পদ্ধতি পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। সাক্ষী ও রেজেষ্টরী ভিন্ন প্রায় কোন দেশেরই বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ঐ সকল দেশে বিবাহ সামান্য বিষয় ব্যাপারের ন্যায় চুক্তিবিশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রণয়ের চুক্তি, ভক্তির চুক্তি ও শ্রদ্ধার চুক্তি কি নিতান্ত হাস্যাস্পদ নয়? উহাতে কি মানবীয় উচ্চতার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায়? না প্রণয়ের কিছুমাত্র পবিত্রতা ও মুগ্ধকারিতা থাকে? ভারতীয় বিবাহ ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ এবং ভারতে স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গ। ভারতীয় পতিপত্নীর ন্যায় যুগলমূর্ত্তি পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী মহাশয়েরা এমত উৎকৃষ্ট বিবাহ পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুরোপীয় প্রথার

অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, সভ্যতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই ও মানবের দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বহুবিবাহ, পণ-গ্রহণ ও অযথা কৌলীন্যানুরাগ প্রচলিত হইয়া দেশের মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। পিতা মাতা অনেক সময়ে অর্থলোভে মুগ্ধ হইয়া ও কৌলীন্যপ্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া অতি মূর্খ ও নরাধমকে কন্যারত্ন সমর্পণ করেন। অতি উৎকৃষ্ট কৌলীন্যপ্রথা ব্যবহার দোষে অতি জঘন্য হইয়া গিয়াছে। মহৎ লোকের পুত্রের মহৎ হওয়াই অধিক সম্ভব বলিয়া মহৎ লোকের সন্তানের সহিত বিবাহ দেওয়া ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া মহৎ বংশে কুলাঙ্গার জন্মিলে সেই কুলাঙ্গারকে কন্যা প্রদান করিতে হইবে, তাহার অর্থ কি? সর্ব্বাগ্রে পাত্রের গুণ দেখাই আবশ্যক, ঐ গুণবান পাত্র সৎবংশ সম্ভূত হইলে তাহার গুণাধিক্য হইতে পারে; কিন্তু নির্গুণ পাত্র সৎবংশ সম্ভূত হইলে কি হইবে? তবে সে তদনুরূপ নির্গুণ নীচবংশীয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে। প্রাচীন সম্প্রদায় ভ্রমান্ধ হইয়া ঐ সকল বিষয় বিবেচনা না করায়, দেশে অনেক অনর্থ ঘটিতেছে। আধুনিক নব্যযুবারা যদি বৃথা বাগাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া এই সকল অহিত নিবারণের চেষ্টা করেন তাহা হইলে ঐ সকল দোষ দূরিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া কল্যাণকর অন্তঃপুর-প্রথা, বাল্য ও সবর্ণ বিবাহ রহিত, এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা ও বিধবা বিবাহাদি প্রচলনে নিতান্ত যত্নবান। যাহা অহিতকর তাহার প্রচলনে ও যাহা হিতকর তাহা নিবারণের চেষ্টায় তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বিধবা বিবাহ।

আজি কালি বিধবাগণের বিবাহ দিবার জন্য বঙ্গীয় যুবকগণ নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগান্তে পুরুষ পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে, পতি বিয়োগে স্ত্রী পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে না দেখিয়া আধুনিক নব্যসম্প্রদায় ভারতীয় পুরুষ সম্প্রদায়কে নিতান্ত নিষ্ঠুর

ও স্বার্থপর বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখেন তাহা হইলে বিধবা বিবাহের অপকারিতা ও তন্নিষেধের কারণ বুঝিতে পারিবেন। বিধবা বিবাহের প্রধান দোষ এই যে, উহা প্রচলিত থাকিলে, গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদৌ দৃঢ়তা থাকে না। গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রীজাতির বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে গৃহের নির্দ্দিষ্টতা থাকেনা। স্ত্রীজাতি বাল্যকালে পিতৃভবনে থাকে, পরে স্বামী ভবনে আসিয়া স্থির হয় বলিয়া, স্বামীভবনের সুশৃঙ্খলা সম্পাদনে তাহাদের যত্ন হয়, পিতৃগৃহের কোনও কার্য্যে তাহাদের তত মনোনিবিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ত্রী যদি জানে যে স্বামীর মৃত্যু অন্তে তাহাকে অন্য স্থানে যাইতে হইবে, তাহা হইলে সে গৃহকার্য্যে দৃঢ়রূপে মনোযোগী হইবে কেন? স্থায়ী কোনও কার্য্যেই তাহার মনোযোগ হইতে পারে না। আবার স্বামিও যদি জানে, যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী অন্যত্র গমন করিবে ও তৎসঙ্গে তাহার অল্পবয়স্ক পুত্রেরাও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে তাহারও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্তি হয় না। ইংলণ্ড তাহার প্রমাণ। তথায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে বলিয়া তথাকার প্রায় কোনও লোকেরই স্থায়ী স্বকীয় বাসগৃহ নাই। সকল লোকেই চিরকাল ভিন্ন ভিন্ন সরাই প্রভৃতিতে বাস করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। এই জন্য তথায় দরিদ্রের এত দুরবস্থা এবং গার্হস্থ্য প্রণালীর এত বিশৃঙ্খলা। ভারতে যে অতি দরিদ্র তাহারও নিজের গৃহ ও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান আছে, এজন্য পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং দরিদ্র বিপদকালে তাহাদের সহায়তা প্রাপ্ত হয়। গৃহ ও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান থাকায় কুসীদ-ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতেও সে আপদ কালে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইংলণ্ডে মধ্যবিধলোককেও ঋণ দিতে লোকে আশঙ্কা করে। কেননা তাহার প্রকাশ্য কোনও বিষয় বা নিজের গৃহ নাই। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে ভারতেও যে ঐ দুর্দশা ঘটিত তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে আর একটী প্রবল যুক্তি প্রদর্শিত

হইতে পারে। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, সকল দেশেই কতকগুলি করিয়া স্ত্রীর বিবাহ বন্ধ থাকে, অর্থাৎ দেশ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ এমত কতকগুলি নিয়ম আছে যে, তদবলম্বনে চলিলে সকল স্ত্রীর বিবাহ হইতে পারে না। সকল স্ত্রীর চির-কাল স্বামী সংযুক্ত থাকিতে পারিবার অনুকূল ব্যবস্থা প্রায় কোন দেশেই দৃষ্ট হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সকল নারীর চিরকাল স্বামীসহবাস ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। ইংলণ্ডে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তথায় কত কুমারী চিরকাল অবিবাহিত থাকে! ভারতে বহুবিবাহ প্রচলিত ও বিধবা বিবাহ নিষেধ আছে, তথাপি কন্যার বিবাহের জন্য কোন্ ব্যক্তি চিন্তিত না হয়েন? পশ্চিম দেশের লোকেরা কন্যা দায় হইতে উদ্ধার হইবার জন্য কত কন্যার প্রাণ নষ্ট করে। এরূপ অবস্থায়, অর্থাৎ যখন কতকগুলি স্ত্রীকে স্বামী সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে, তখন কুমারীর বিবাহ বন্দ না রাখিয়া বিধবা বিবাহ বন্দ রাখাই উচিত তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেননা তাহা হইলে সকলের প্রতি ন্যায় ও পক্ষপাত শূন্য ব্যবহার করা হয়, এবং গার্হস্থ্য প্রণালীও সুনিয়মে চলে। বিশেষতঃ পুত্র-বতী বিধবার বিবাহ আরও অনিষ্টকর। কেননা পুত্রবতী বিধবার বিবাহ হইলে পুনর্বিবাহিতা বিধবার পুত্রকে হয় মাতৃত্যাগ করিতে হইবে, অথবা পিতৃ গৃহ, পিতামহ, পিতামহী ও খুল্লতাত প্রভৃতি পিতৃ পরিজন দিগকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মাতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বিমাতা হইতে যে কি কষ্ট তাহা এদেশীয় অনেকে জানেন কিন্তু বিপিতার কষ্টের আস্বাদ এদেশ বাসীরা জানেন না। তাহা যে আরও কষ্টকরতাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুত্রবতী বিধবার বিবাহ হইলে পুত্রকে ঐ নিদারুণ কষ্টে জর্জরীভূত হইতে হয়। বিধবা বিবাহে এই সকল ও অন্যবিধ অসুবিধা আছে বলিয়াই বিধবা বিবাহ নিষেধ হইয়াছে। নচেৎ পূর্ব্বকালে যখন বিধবা বিবাহ ভারতে প্রচলিত ছিল, তখন উহা রহিত হইবার কারণ কি? ভারতীয় ঋষিগণ এত নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর ছিলেন না, যে,

কেবল আপনাদের সুখের জন্য বিধবা দিগকে কষ্ট দিয়াছেন। পুরুষের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা দেখিয়া অনেকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন বটে। কিন্তু বাস্তবিক পুরুষের পুনর্ব্বিবাহে ঐ সকল দোষ লক্ষিত হয় না বলিয়া উহার নিষেধ হয় নাই। পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ সত্ত্বেও যখন কন্যার পাত্রের অসদ্ভাব, তখন পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ বন্ধ হইলে আরও পাত্রের অসদ্ভাব হইবার সম্ভব। তাহা হইলে হয় ত উপযুক্ত পাত্রাভাবে সকল কন্যার বিবাহ হইবেনা। বোধ হয় এই কারণেও পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ নিষেধ হয় নাই। কিন্তু তথাপি অধিক বয়সে ও উপযুক্ত পুত্রাদি বর্ত্তমানে পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ করা অনুচিত। আমরা আর একটী কারণে বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকিতে অনুমোদন করি। এক্ষণে দিন দিন যেরূপ লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, সেরূপ নিয়মে লোক বৃদ্ধি হইলে দেশের সমূহ কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। মালথস্ যাহা প্রমাণ করিয়াছেন তাহাতে যথা নিয়মে লোক বৃদ্ধি হইলে সকল লোকের খাদ্য সংকুলন হয় না। তাঁহার মতে ঐ কারণেই এক্ষণে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইতেছে। এরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রচলন দ্বারা আরও প্রজা বৃদ্ধি করিয়া লোকের কষ্ট বৃদ্ধি করা কোনও মতে উচিত নয়। এক্ষণে স্ত্রীজাতির পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া দূরে থাকুক পুরুষের পুনর্ব্বিবাহ রহিত করা আবশ্যক হইবে। আজি কালি ঐ কারণে দুরবস্থাপন্নদিগের বিবাহ রহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। অতএব যাঁহারা বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বিধবা বিবাহের চেষ্টা করেন, তাঁহারা কি কুমারীদিগের ও অবিবাহিত পুরুষদিগের দুঃখে দুঃখিত হইবেন না? দুর্ভিক্ষ ও মহামারী পীড়িতদিগের ভয়ানক কষ্টে কি তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হইবে না? অথবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের শিথিলতা নিবন্ধন ও দরিদ্র গৃহে জন্ম হেতু মানবের দারিদ্র্য দুঃখে ব্যথিত হইবেন না? তাঁহারা কি জানিতেছেন না, যে, এক বিধবাদিগের দুঃখ মোচন করিতে গেলে ঐ সমস্ত প্রকার দুঃখের বৃদ্ধি হইবে! অতএব বিধবা বিবাহ কোন প্রকারে চলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদিগের

দুঃখে ব্যথিতহৃদয় ব্যক্তিদিগকে এই বলিয়া প্রবুদ্ধ হইতে হইবে, যে, এ পৃথিবীতে সকলের সকল প্রকার দুঃখ নিবারিত হইবার নহে। বিধবাদিগের অপেক্ষাও পৃথিবীতে অনেক দুঃখী আছে। কত ব্যক্তি চিরজীবন দারিদ্র্য ও রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছে, বিধবাদিগের অগ্রে তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তাহা যেমন মানবের অসাধ্য, বিধবা দুঃখ অর্থাৎ স্ত্রীজাতির চির স্বামীসহবাসাভাব-জনিত দুঃখ নিবারণ করাও সেই রূপ অসাধ্য। ঈশ্বর পৃথিবী সুখপূর্ণ করেন নাই। তিনি পৃথিবীর যে অবস্থা করিয়াছেন তাহাতে মানব সর্ব্বদুঃখ নিবারক ব্যবস্থা করিতে পারে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

জাতিভেদ।

আজিকালি পাশ্চাত্য সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ ভারতীয় জাতিভেদ প্রথার অতিশয় নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জাতিভেদ প্রথার উপকারিতার বিষয় কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া, কেবল মাত্র যে স্থূল দর্শন দ্বারা ঐ রূপ নিন্দা করিয়া থাকেন তাহা আমরা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিলে মানবগণ স্ব স্ব অবস্থায় ও পৈতৃক কার্য্যে সন্তুষ্ট চিত্তে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাতে মনের শান্তি ও কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সম্পাদিত হয়, ধর্ম্মোন্নতি ও সমাজ শৃঙ্খলা সাধিত হয় এবং বল, বীর্য্য, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি ও বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি হয়। ভারতে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া ভারত যেরূপ সত্বর উন্নত হইয়াছিল, ভারতে যেরূপ বীরত্ব, জ্ঞান ও শিল্পাদির উন্নতি হইয়াছিল পৃথিবীর আর কোনও দেশে সেরূপ হয় নাই। কার্য্য বিভাগ জাতিভেদের প্রধান কারণ। অসভ্যকালে কার্য্য বিভাগ হয় না; তখন সকল মনুষ্যকেই স্ব স্ব আবশ্যক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া

লইতে হয়, তাহাতে কোনও কার্য্যেই মানবের পটুতা জন্মেনা এবং অনেক কার্য্য অসম্পন্ন থাকে। এই জন্য কার্য্য সৌকর্য্যার্থে মানবগণ পরস্পর কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে। আদিম কালে যে মানবের যেরূপ শক্তি, অবস্থা ও রুচি ছিল সে তদনুরূপ কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল। বলপূর্ব্বক কেহ কাহাকে কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় নাই। যে ব্যক্তি যে কার্য্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার পুত্রের সেই কার্য্য করার সুবিধা ও প্রবৃত্তি হইবার অধিকতর সম্ভব হওয়াতে, পুত্রেরা প্রায়ই পিত্রবলম্বিত কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। কার্য্য বিভাগ হইলে অর্থাৎ চিরজীবন এক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে কার্য্যে যেরূপ মানবের পটুতা জন্মে, উহা বংশানুক্রমিক হইলে তদপেক্ষাও অধিক পটুতা জন্মিবার সম্ভব। কেননা পুত্র অতি শৈশবকাল হইতে পিতার চেষ্টিত সকল অবগত হইতে থাকে, পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইবার সুবিধা থাকায় বাল্য কাল হইতে কার্য্য শিক্ষা করিতে পারে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পিতৃগুণ ও নিপুণতা পুত্রে সংক্রামিত হওয়ায় স্বাভাবিক কর্য্যদক্ষতা প্রাপ্ত হয়, কার্য্য স্থির থাকায় কার্য্যান্বেষণজন্য সময় নাশ ও অসুবিধা ঘটে না এবং অভ্যাসের বিপরীত কার্য্য করণজন্য কষ্টানুভব না হওয়ায় কার্য্যে মানবের দৃঢ় মনঃসংযোগ হয়। এই জন্য ঢাকায় যেরূপ বস্ত্র ও কাশ্মীরে যেরূপ শাল প্রস্তুত হয় এরূপ আর কোথায়ও হয় না; এই জন্য কৃষকপুত্র যেরূপ কৃষিকার্য্য ও বাহকপুত্র যেরূপ বহনকার্য্যে পটু হয় অন্যে সেরূপ হয় না এবং এই জন্য ব্রাহ্মণ যেরূপ জ্ঞানী ও ক্ষত্রিয় যেরূপ বীর হয় এরূপ আর কেহ হইতে পারে না। বংশানুরূপ কার্য্য করিবার নিয়ম না থাকিলে, কখনই উক্ত প্রকার বিচক্ষণতা জন্মিত না। তাহা হইলে কখনও ভারত এত প্রাচীন কালে এত সভ্য হইতে পারিত না, কখনই ভারতে এমত জ্ঞানালোচনা, এমত বীরত্ব ও এমত শিল্পনৈপুণ্য প্রচার হইত না। তাহা হইলে মানবগণ শিক্ষালাভের সুবিধা না পাইয়াও কোন্ কার্য্য করিবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এবং ঈপ্সিত কার্য্য প্রাপ্ত

না হওয়ার অনভ্যস্ত ও রুচি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়াতে ভাল-রূপ কার্য্য করিতে পারিত না। সুতরাং কাহারও কোনও কার্য্যে উত্তম-রূপ নিপুণতা জন্মিত না ও অনভ্যস্ত কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া মানব মহা ক্লেশ অনুভব করিত। কেন না পিতা আপনার অবস্থার অনুরূপ অবস্থায় শিশুপুত্রকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। সুতরাং যাহার পিতার অবস্থা ভাল সে বাল্যকাল হইতে উত্তম অব-স্থায় থাকে এবং যাহার পিতার অবস্থা মন্দ সে বাল্যকাল হইতে মন্দ অবস্থায় থাকে। বাল্যকাল হইতে যে ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকে তাহা তাহার অভ্যাস হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে তাহার কষ্ট হয় না। অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে মানবের অত্যন্ত কষ্ট হয়। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে রৌদ্র বাতাদিতে ভ্রমণ করে নাই, কষ্টকর কোন কার্য্য করে নাই এবং অপকৃষ্ট স্থানে বাস ও অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে নাই, তাহাকে যদি নিয়ত রৌদ্র বাতাদিতে ভ্রমণ, শ্রমকর কার্য্য, অপকৃষ্ট স্থানে বাস ও অপকৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার কষ্টের সীমা থাকে না। কিন্তু যাহারা বাল্যকাল হইতে উক্তপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত আছে তাহারা উক্তরূপ বাতাদি হইতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। অভ্যাসের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি, যে, তৎপ্রভাবে নিম্ন অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের উচ্চ ব্যবহারও কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়। যাহারা স্বনাম বা পুত্রনামধন্য অর্থাৎ যাঁহারা স্বশক্তি বা পুত্রশক্তি প্রভাবে নিম্ন অবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্য ব্যবহার দেখিলেই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐরূপ ব্যক্তিরা বাল্যাভ্যাসের বিপরীত উন্নতাবস্থায় থাকিতে লজ্জিত ও অসুখী বোধ করেন, এমন কি অনেকে উৎকৃষ্ট আহার ও উৎকৃষ্ট পরিধেয় ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন। অতএব যখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, উন্নতাবস্থা হইতে নিম্নাবস্থায় পতিত হইলে মানবের যেরূপ কষ্ট হয়, নিম্নাবস্থা হইতে উচ্চাবস্থায় উত্থিত হইলে সেরূপ সুখ হয় না এবং যখন যে ব্যক্তি যে অবস্থায় অবস্থিত সে সে অবস্থায় থাকিলে কষ্ট পায় না, তখন

যে নিয়ম অবলম্বন করিলে মানবের নিয়ত অবস্থা বিপর্য্যয় না ঘটে, সেই নিয়ম যে উৎকৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানব যদি বংশানুক্রমিক কার্য্যে রত থাকে, তাহা হইলে কাহাকেও অবস্থা বিপর্য্যয় জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। সকলেই স্ব স্ব অভ্যাস মত কার্য্য সম্পাদন করিয়া সচ্ছন্দে অবস্থিতি করে। যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেরূপ কার্য্য করিলে নিয়ত অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং তাহা মানবের সমূহ দুঃখের কারণ। কেন না কৃষকপুত্র যদি ব্রাহ্মণের কার্য্য করে তবে ব্রাহ্মণপুত্রকেও কৃষকের কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হইবে, বাহকপুত্র যদি কুম্ভকারের কার্য্য করে তবে কুম্ভকারপুত্র-কেও বাহকের কার্য্য করিতে হইবে, বিষ্ঠাবাহী যদি তন্তুবায় হয় তবে তন্তুবায়পুত্রকেও বিষ্ঠাবহন কার্য্য করিতে হইবে। কেন না পৃথিবীতে যতবিধ ব্যবসায় আছে তৎসমস্তই আবশ্যক, কোনও একটী কার্য্যের লোপ বা ন্যূনাধিক্য হইলে মানবের কার্য্য চলে না। সুতরাং কৃষকপুত্রেরা যদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে কৃষক বৃত্তির অল্পতা ও ব্রাহ্মণবৃত্তির আধিক্য হয় ও ঐ ন্যূনাধিক্য দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মণপুত্রদিগকে স্ববৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ব্যবসায়ীকে কৃষি বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা হইলে নিয়ত মানবের অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য দুঃখ ঘটে। তাহা হইলে যাহাদের রৌদ্র বাতাদি সহ্য করিবার শক্তি নাই তাহাদিগকে রৌদ্র বাতা-দিতে ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইতে হয়, যাহাদিগের দুর্গন্ধ সহ্য করি-বার শক্তি নাই তাহাদিগকে বিষ্ঠাবহন রূপ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, কষ্টকর ও পীড়াজনক কার্য্য করিতে হয় ও যাহাদের বহন কার্য্য ও হল-চালনোপযোগী শরীরের দৃঢ়তা নাই তাহাদিগকে ঐ সকল অসহ্য কষ্টকর কার্য্য করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহাতে রোগ, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য এবং কার্য্যে অনিচ্ছা ও অপটুতা জন্মে। অতএব বংশানুগত বৃত্তি ব্যবস্থা অত্যন্ত হিতকর। এই জন্যই ভারতীয় ঋষিগণ জাতিভেদ প্রথার এত দৃঢ়তা করিয়াছেন। উহা স্বভাবানুমোদিত, কৃত্রিম ও হিত-

কর এইজন্য উহা সভ্যতার অনুমোদিতও বটে। কিন্তু ইয়ুরোপীয় সভ্যতানুরাগী ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে মানবমধ্যে কেহ চিরকাল উৎকৃষ্ট কার্য্য করিবে ও কেহ চিরকাল অপকৃষ্ট কার্য্য করিবে, সর্ব্বস্বধন জ্ঞান লাভ করিবার অধিকার অধিকাংশ মানবের থাকিবে না এবং নিম্ন শ্রেণীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শক্তিসম্পন্ন হইলেও কেহ উচ্চ কার্য্যের চেষ্টা করিবেনা, অথচ উচ্চবংশীয় নিতান্ত অনুপযুক্ত সন্তানেরা ঐ উচ্চ কার্য্য করিবে, এ নিয়ম কখনও উত্তম হইতে পারেনা। আমরা বলি জগতের কোনও কার্য্য উৎকৃষ্ট বা কোনও কার্য্য অপকৃষ্ট নহে। যখন সকল কার্য্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তখন সমস্ত কার্য্যকেই উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। ঈশ্বর যেমন কার্য্য নানা প্রকার করিয়াছেন, সেইরূপ তদুপযোগী মনুষ্যও নানারূপ করিয়াছেন। যে যেমন মনুষ্য তাহার তদনুরূপ কার্য্যই উৎকৃষ্ট। কেবল জ্ঞানই মানবের কার্য্য নহে। কৃষি, শিল্প, বীরত্ব, জ্ঞান সমস্তই মানবের আবশ্যক। কিন্তু যখন মানব একাকী সমস্ত কার্য্য করিতে না পারাতেই পরস্পর কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছে, তখন সকলেই কৃষি, শিল্প, বীরত্ব, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্তেরই চর্চ্চা কি প্রকারে করিবে? ব্রাহ্মণ জ্ঞান চর্চ্চা করিতেছে, ক্ষত্রিয় দেশ রক্ষা করিতেছে, কৃষক শস্য বপন করিতেছে ও তন্তুবায় বস্ত্র বয়ন করিতেছে। কৃষক যেমন একাকী তণ্ডুল ভোজন করেনা, তন্তুবায় যেমন একাকী বস্ত্র পরিধান করেনা, ক্ষত্রিয় যেমন একাকী রক্ষিত হয় না, ব্রাহ্মণও সেইরূপ একাকী জ্ঞান লাভ করেনা। কৃষক যেমন শস্যোৎপাদনের যত্ন একাকী করে ও তাহার ফল শস্য সকলকে প্রদান করে, ব্রাহ্মণও সেইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জনের যত্ন নিজে করে, ও তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান সকলকেই বিতরণ করে। সকল মনুষ্যই অন্ন বস্ত্রাদির ন্যায় জ্ঞানও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জ্ঞান দিয়া তদ্বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে তণ্ডুল লয়, এবং কৃষক তণ্ডুল দিয়া তদ্বিনিময়ে ব্রাহ্মণের নিকট হইতে জ্ঞান লয়। ব্রাহ্মণ জ্ঞানোপার্জ্জনে যেরূপ পটু ও সুখী, কৃষক শস্য উৎপাদন করিতেও সেইরূপ পটু ও সুখী। ব্রাহ্মণ শস্য উৎপাদন করিতে

অপারক বলিয়া যেমন দুঃখ প্রকাশ করেনা, কৃষকও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেনা বলিয়া সেইরূপ দুঃখ পায়না। যদিও স্বীকার করা যায়, যে, কার্য্য বিশেষে সুখ দুঃখ ভেদ আছে, কিন্তু যখন সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট তখন ঐ ভেদ অবশ্যই থাকিবে। মনে কর হরি ব্রাহ্মণ ও রাম কৃষক। যদি হরির পুত্রকে কৃষক ও রামের পুত্রকে ব্রাহ্মণ করিয়া দিয়া সাম্যরক্ষার চেষ্টা করা হয়, তাহাতে উদ্দেশ্য সফল হয় না। কেননা হরি সুখ পাইয়াছে বলিয়া তাহার পুত্রকে দুঃখ দিলে কখনই পরিশোধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ শক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্ভবও অল্প সম্ভব। কেননা পুত্র প্রায়ই পিতৃ গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে যে সকল চেষ্টার আবশ্যক তাহা নিম্ন শ্রেণীর লোকের প্রায়ই সম্ভব হইয়া উঠে না। সুতরাং জাতিভেদ প্রথা দ্বারা অতি অল্পলোকের উন্নতির বাধা প্রদান করা হয়। মানব জাতির সুখের জন্য ঐ সামান্য ক্ষতি প্রকৃত ক্ষতিকর নহে, প্রত্যুতঃ মহোপকারক। ফলতঃ নীচকুলে প্রকৃত শক্তি মানের উদ্ভব হইলে, জাতিভেদ প্রথা তাহার উন্নতির বাধা দিতে পারে না, ঐশী-শক্তি বলে সে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করে। কেননা দেখা যাইতেছে যে, এই জাতিভেদ প্রধান ভারতবর্ষেই শূদ্র কবস ঋষি ও মহানন্দ সম্রাট হইয়া ছিলেন, সূত লোমহর্ষণ পুরাণবক্তা হইয়াছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এইরূপ নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি ও উচ্চ শ্রেণীর অবনতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক জাতিভেদ প্রথা প্রকৃত ক্ষমতাশালীর ক্ষমতা প্রকাশে বাধা দিতে বা নির্গুণের অধঃপতন নিবারণ করিতে পারেনা। যাহাতে বৃথা মানব জাতির অবস্থা পরিবর্ত্তন জন্য দুঃখ না হয় তাহাই ইহার কার্য্য। অতএব জাতিভেদ প্রথা আমাদের অত্যন্ত কল্যাণকর।

আজি কালি কার্য্যভেদ প্রথার কিঞ্চিৎ শিথিলতা হওয়াতে সকলেই আপন আপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব অনুরাগী হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচর্চ্চা, ক্ষত্রিয় ব্যায়াম, বৈশ্য বাণিজ্য, কর্ম্মকার লৌহগঠন, স্বর্ণকার স্বর্ণালঙ্কার, কুম্ভকার প্রতিমা নির্ম্মাণ, তন্তুবায় বস্ত্র

বয়ন ও কৃষক কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সকলেই একমনে দাসত্বের আশয়ে তদুপযোগী বিদ্যাশিক্ষায় মন দিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে, ধর্ম্ম, বীরত্ব, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সমাজ রক্ষণ কার্য্য সকল নষ্ট হইয়া বাবুগিরি ও চাকুরির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখনও ভারতে জাতিভেদ প্রথা বিলক্ষণ প্রবল রহিয়াছে, কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে মাত্র, তাহাতেই যখন এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, তখন একেবারে উক্ত প্রথা রহিত হইলে দেশের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বিদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের আধিক্যে আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের যতদূর ক্ষতি হইতে হয় তাহা হইয়াছে। তাহার উপর সকলের ঐ সকলে ঘৃণা জন্মিলে দেশে উহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না। যদি সকলেই আপন আপন কার্য্যে রত থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই ইয়ুরোপীয় শিল্পাদির সঙ্গে সঙ্গে, ভারতীয় শিল্পাদিরও উন্নতি হইত। যে ভারত কারুকার্য্যে জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেই ভারত আজি সর্ব্ব বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। জাতিভেদের শিথিলতা ইহার মূল কারণ তাহাতে আর সন্দেহ কি!

অনেকে এরূপ বলিতে পারেন যে যদিও বংশানুগত কার্য্য বিভাগ কল্যাণকর স্বীকার করা যায়, কিন্তু বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা সম্বন্ধে জাতিভেদের প্রয়োজন কি? আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। সবর্ণ বিবাহে দম্পতীর পরস্পর যেরূপ মনোমিলন ও কার্য্য সুবিধা হইবার সম্ভব, অসবর্ণ বিবাহে সেরূপ হইবার সম্ভব অল্প। কেন না যত পরস্পরের অবস্থার মিলন হয় ততই পরস্পরের মিত্রতা জন্মে এবং যত অবস্থার ভেদ হয় ততই মনের অনৈক্য জন্মে। এক জাতীয় ব্যক্তি সমূহের মনোগত ও অবস্থাগত ভাব প্রায় একরূপই হয় অর্থাৎ তাহাদের ব্যবসা একবিধ হওয়ায় তাহাদের আশা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য, আয়োজন, অবস্থা, ভোজন ও আচার ব্যবহার প্রায় একরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাদের মনোমিলন হইবার অধিক সম্ভাবনা। তাহারা পরস্পর বিবাহিত হইলে কার্য্য বিষয়েও পরস্পরের সাহায্য হইতে পারে;

অর্থাৎ কুম্ভকার-কন্যা মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া কুম্ভকার স্বামীর সহায়তা করিতে পারে ও তন্তুবায়-কন্যা সূত্রসংস্থান করিয়া দিয়া তন্তুবায় স্বামীর সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু কুম্ভকার-কন্যার সহিত তন্তুবায়ের ও তন্তুবায়-কন্যার সহিত কুম্ভকারের বিবাহ হইলে, তাহারা স্বামীর কার্য্যের সেরূপ সহায়তা করিতে পারে না। বিবাহ সম্বন্ধজাত কুটুম্বেরাও ভিন্নজাতি হইলে জামাতার কার্য্যসহায়তা করিতে পারে না। স্বজাতীয় যদি আত্মীয় হয়, তাহা হইলে সকলেই মিলিত হইয়া পরস্পর স্বজাতির উন্নতি চেষ্টা করিতে পারে, নচেৎ এক ব্যবসায়ী সকলে পরস্পর ঈর্ষান্বিত হইবার সম্ভব। সবর্ণ বিবাহের আর একটী গুণ এই যে, পিতা ও মাতা যদি এক জাতীয় হয় অর্থাৎ পিতা ও মাতা একবিধ গুণবিশিষ্ট হইলে তজ্জাত সন্তান পৈতৃক কার্য্যে অধিকতর নৈপুণ্য লাভ করিবার সম্ভব। কেননা তাহাতে পিতা ও মাতার একবিধ শক্তি সংক্রমিত হইয়া দ্বিগুণিত হয়। এই সকল কারণে সবর্ণ বিবাহ মানবের অত্যন্ত কল্যাণকর।

সবর্ণ ভোজন-বিধির উপকারিতা আছে কি না তাহা উহার মূলানুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বকালে কোন দেশে জাতিভেদ ছিল না; পরে যখন কার্য্যভেদ হইয়া জাতিভেদের সৃষ্টি হইল, তখন কেবলমাত্র কার্য্য বংশানুক্রমিক হইবার ব্যবস্থা হইল। সে সময়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বা ভোজন নিষেধ হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি মাত্র ছিল। ঐ চারি জাতির কেবল কার্য্য স্বতন্ত্র ছিল কিন্তু পরস্পর সকলেই সকলের অন্নভোজন করিত ও পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিত। পরে সবর্ণ বিবাহের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ হইয়াছে। এবং আমাদের বোধ হয় অসবর্ণ অন্ন ভোজন নিষেধের মূল কারণ সামাজিক শাসন। কেননা সমাজ মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্ম করিলে পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে তাহাকে সমাজচ্যুত করার নিয়ম আছে, অর্থাৎ কুকর্ম্মশালীকে কেহ কন্যাদান করে না ও তাহার সহিত কেহ ভোজন করে না। এখনও এদেশে ঐ কারণে

অনেক দলাদলী হইয়া থাকে। এক্ষণে এদেশে যত জাতি দৃষ্ট হয় প্রায় তৎসমস্তই বর্ণসঙ্কর। মূল জাতীয় ব্যক্তি বিশেষের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারই বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপাদনের কারণ। সুতরাং যে ব্যক্তি ঐ অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল তাহার সহিত ভোজ্যান্নতা বন্ধ হওয়াতেই পরস্পর জাতি সকলের ভোজ্যান্নতা নিষেধ হইয়াছে। কুকর্ম্মদমন যখন ভোজ্যান্নতা নিষেধের কারণ, তখন উক্ত প্রথাকে মন্দ কি প্রকারে বলা যায়? আর এক কথা, মনুষ্যেরা উৎসব সময়ে আত্মীয় বন্ধুদিগকে ভোজন করাইয়া থাকে, আত্মীয় সকল সমজাতীয় বিধায় ভোজের ব্যাপার স্বজাতি মধ্যেই আবদ্ধ হয়; সুতরাং সচরাচর স্বজাতীয়েরা একত্রে ভোজন করিয়া থাকে। অপরের সেরূপ অভ্যাস না থাকায় আবশ্যক সময়েও এক জাতির অন্ন অপর জাতির গ্রহণে শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মে না। ব্রাহ্মণ চিরকাল শ্রেষ্ঠ ও মূল জাতি, এ জন্য ব্রাহ্মণের অন্ন সকলেই গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য সকলে সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্য কাহারও অন্ন ভোজন করেন না। এই কারণে কালে অন্নভোজন শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক হওয়াতে অসবর্ণ অন্নভোজনের এত দৃঢ়তা হইয়াছে। অধিক কি, এক্ষণে এক জাতীয় সকলের অন্ন সকলে গ্রহণ করে না। আজিকালি জাতিভেদ প্রথার এরূপ ব্যভিচার হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পরস্পরে পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করা দূরে থাকুক একস্থানে জাতিবিশেষ থাকিলে, তথাকার জল পর্য্যন্তও উচ্চ জাতীয়েরা গ্রহণ করেন না। এক্ষণে জাতিভেদ প্রথার দোষাবলী সংশোধনের আবশ্যক। পূর্ব্বকালে ভারতে মধ্যে মধ্যে সমাজ সংস্কার হইত, তদ্দ্বারা সমাজের দোষ সকল সংশোধিত হইত। পরাধীন হইয়া অবধি ভারতে সেরূপ সংস্কারক অতি অল্প জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। আধুনিক নব্যসম্প্রদায় যদি সমাজের মূলোৎপাটনের চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত হিতকর সংশোধনের চেষ্টা করেন তাহা হইলে দেশের সমূহ মঙ্গল হইতে পারে।

উপসংহার।

আমরা মানবতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যে সমস্ত আলোচনা করিলাম তদ্বারা কি অবগত হইলাম? যাহা অবগত হইলাম তাহাতে কি আমাদের তৃপ্তি জন্মিয়াছে, না তৎসমস্তকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে? কখনই না। কেননা মানবের সত্য নির্ণয় করিবার শক্তি নিতান্ত অল্প। মানবের যে সামান্য শক্তি আছে, তদ্দ্বারা মানব আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে না। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ হইবার শক্তি এই বিশ্ব মধ্যে কাহারও নাই। কেননা আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব একই কথা। পূর্ণ ঈশ্বর ব্যতীত বিশ্ব মধ্যে সমস্ত পদার্থই অপূর্ণ। অপূর্ণ শক্তির আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জন্মিতে পারিলে পূর্ণ ও অপূর্ণ শক্তির প্রভেদ থাকে না। এই জন্য আর্য্যসুধীগণ কহিয়াছেন, যে, আত্মাতে ও ব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান জন্মিলে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় ও ঐরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মপদ বাচ্য হয়েন। কিন্তু মানব কি সেরূপ হইতে পারে? কখনই না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে এত দিন অবশ্য মানব ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইতে পারিত। মানব জাতি ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য এ কাল পর্য্যন্ত কত যত্ন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহা হইতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছে? আমরা দেখিতেছি, ঐ চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিত্বই মানবের প্রতীতির বিষয় হইতেছে। নাস্তিকতা ঈশ্বরানভিজ্ঞতারই নামান্তর। মানব যখন নানা চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিল না, তখন বিবেচনা করিল ঈশ্বর নাই, থাকিলে অবশ্যই তিনি মানবের জ্ঞানের বিষয় হইতেন। এক জন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, মানব ঈশ্বর বুঝিবে কি, তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই কোটী কোট্যংশ পদার্থের মর্ম্ম বুঝিবার শক্তি মানবের

নাই। যাঁহার কার্য্য বুঝিবার শক্তি নাই, মানব তাঁহাকে কি প্রকারে বুঝিবে? এইজন্য একাল পর্য্যন্ত কেহই ঈশ্বরজ্ঞ হইতে পারে নাই; কোন জ্ঞানেই মানবের সম্পূর্ণ তৃপ্তি জন্মে নাই, এবং পৃথিবীর কাহারও নির্ণীত তত্ত্বে মানবের সম্যক্ বিশ্বাস জন্মে নাই। চিরকালই দেখা যাইতেছে যে, কোনও সত্য আবিষ্কৃত হইলে কেহ তাহাকে সত্য ও কেহ তাহাকে মিথ্যা বলিয়া থাকে। সকলকে এককালে কোন সত্যকে সত্য বলিয়া সম্পূর্ণ আদর করিতে দেখা যায় না। এই জন্য পৃথিবীতে নিয়ত নূতন ধর্ম্ম ও নূতন দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। কোন ধর্ম্ম বা দর্শন শাস্ত্রের প্রতি সমগ্র মানবের প্রীতি বা বিশ্বাস জন্মে নাই। এই জন্যই বলিতেছি আমাদের মানবতত্ত্বেরও ঐ দশা হইবে। ইহাতে অনেকে বলিতে পারেন তবে মানবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস কেন? মানব যে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারে না, এবং মানবের আবিষ্কৃত সত্য সকল যে সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহাই জানাইবার জন্য আমাদের এই মানবতত্ত্ব আলোচনার প্রয়াস। আজি কালি আমাদের দেশস্থ নব্য ও প্রাচীন সম্প্রদায়ের মানবগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস হেতু দেশে যে সকল ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহাই দেখাইবার জন্য আমাদের এই প্রয়াস। ঈশ্বর নিরূপণ বা ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশে মানবতত্ত্বের আবির্ভাব হয় নাই।

এক্ষণকার যুবক সম্প্রদায়ের সাধারণ মত এই যে, তাঁহারা যে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহাই সম্পূর্ণ সত্য ও প্রাচীনদিগের মত নিতান্ত ভ্রান্ত। এই জন্য তাঁহারা প্রাচীন রীতি নীতি, প্রাচীন আচার ব্যবহার ও প্রাচীন ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া সমস্তই আপনাদের মনোমত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা একবারও বিবেচনা করেন না যে, তাঁহারা কতদিন পৃথিবীতে আসিয়াছেন ও প্রাচীনেরাই বা কতদিন আসিয়াছেন; যদি তাঁহারা প্রাচীনদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইতে পারেন, তবে বালকেরাও তাঁহাদের অপেক্ষা জ্ঞানী হইতে পারে; তাঁহারা যদি প্রাচীনদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারেন, তবে বালকেরাও তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিতে পারে। কেননা, প্রাচীনেরা যেরূপ

যুবকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী, তাঁহারাও সেইরূপ বালকদিগের স্বাধীনতার বিরোধী। বালকদিগের যথেচ্ছ ব্যবহারকে যদি তাঁহারা অমঙ্গলকর মনে করেন, তবে তাঁহাদের যথেচ্ছাচারকে বৃদ্ধেরা কেন অমঙ্গলকর মনে করিবেন না? জানার নাম যখন জ্ঞান, তখন বহুজ্ঞ প্রাচীনেরা যে যুবকদিগের অপেক্ষা অভিজ্ঞ হইবেন এবং প্রাচীনদিগের কার্য্য যে যুবকদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? তবে প্রাচীন যদি নিতান্ত মূর্খ ও যুবা বিলক্ষণ পণ্ডিত হয়েন, ও যুবকগণ বিচারিত মনে কার্য্য চিন্তা করেন, প্রাচীনেরা তাহা না করেন, তাহা হইলে যুবাদিগের কার্য্য প্রাচীনদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। বাস্তবিক ঐ অভিমানেই যুবকগণ প্রাচীন মত ও প্রাচীনদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কয়জন যুবা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ হইয়া কার্য্যে রত হয়েন, এবং কয়জনেরই বা তদ্রূপ শক্তি আছে? এক্ষণে নবযুবক মাত্রেই জ্ঞানাভিমানী। দুই একখানি ইংরাজি বা বাঙ্গালা শিক্ষা পুস্তক পড়িয়া তাঁহারা ঈশ্বরের ও বিশ্বব্যাপারের সূক্ষ্মতম সমস্ত বিষয়ই অবগত হয়েন। যে সকল তত্ত্ব প্রাচীন মহা পণ্ডিতগণ নিবিষ্ট চিত্তে বহু কাল চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা দুই পৃষ্ঠার জ্ঞানে ভ্রান্ত স্থির করেন। তাঁহারা জ্ঞানাতীত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন, সকল মনুষ্যকে সমান করিবার চেষ্টা করেন এবং অসীম ব্রহ্মাণ্ডকে স্বীয় করতলস্থ দেখেন। কিন্তু হে নব যুবকগণ! তোমরা কোন্ বলে এত বলীয়ান্ হইয়াছ, তোমাদের এমত কি বিদ্যা জন্মিয়াছে, যে তাহার বলে মহা প্রাজ্ঞশালী প্রাচীন ঋষিগণকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা কর! তোমাদের ইষ্টদেবতা ইংরাজ ও মুল বিদ্যা ইংরাজি ২।৪ খানি ভাষা শিক্ষা পুস্তক। কিন্তু তোমরা কি জাননা যে, প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট তোমাদের শিক্ষাগুরু বৃটনজাতি নিতান্ত শিশু! তোমরা কি জাননা যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি পক্ব কেশ ও নব্য বৃটন অজাতশ্মশ্রু বালক! যখন ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল তখন

তোমাদের বৃটন্ জাতি কালগর্ভে বিলীন ছিল। বৃটন এখন সভ্যতার কি শিখিয়াছে? তোমরা সেই অজাতশ্মশ্রু বালক বৃটনের কথায় প্রাচীন-দিগের অমূল্য রত্ন পরিত্যাগ করিতে বসিয়াছ? "কাচ মূল্যেন বিক্রীতোহস্ত চিন্তামণির্ম্ময়া"? তোমরা কি মনে করিয়াছ "ভারতীয় সভ্যতার নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা দণ্ডায়মান হইতে পারে"? যদি এইরূপ ভাবিয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে। কেননা বৃটনের এখনও সে দিনের অনেক বাকী, যে দিন বৃটন ভারতীয় সভ্যতার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে। হে ভারত সন্তানগণ! তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ যে তোমরা কাহার সন্তান! তোমরা কি ভাব না যে, সিংহশিশু হইয়া শৃগালের নিকট বীরত্ব শিক্ষা করিতে যাইতেছ? যে আর্য্য জাতি অতি প্রাচীন কাল হইতে ঈশ্বর চিন্তায় ও ঈশ্বর ধ্যানে চিরজীবন অতিবাহন করিয়াছেন, যে আর্য্য জাতি বেদ বেদান্ত ও দর্শনাদি দ্বারা আস্তিকতা, নাস্তিকতা, দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ, সাকার ও নিরাকার বাদ, প্রভৃতি ঈশ্বরের যাবতীয় ভাবের চূড়ান্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের জন্য, পরকালের জন্য, ধর্ম্মের জন্য ঐহিক সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের এমত পথই নাই যাহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহাদের সন্তান হইয়া তোমরা যাহারা চিরজীবন ঐহিক সুখ সাধনের জন্য লালায়িত ও মত্ত তাহাদের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে যাও! ইহাতে কি তোমাদের সাগর পরিত্যাগ করিয়া গোস্পদে পিপাসা নিবারণের চেষ্টা হইতেছে না? সত্য বটে ইংরাজ জাতি আজি কালি অতি উন্নত ও ভারত সন্তানগণ নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন কিন্তু প্রাচীন ভারতের সহিত তুলনায় এখনও তাঁহারা অনেক নিকৃষ্ট রহিয়াছেন। ইংরাজগণ বহির্জ্জগতের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের এখনও কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। ভারত সন্তানগণ বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারেন বটে কিন্তু অন্তর্জ্জগৎ শিক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র, ভারত পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য ভূমিতে

যাওয়া তাঁহাদের নিতান্ত মূর্খতা। এক্ষণে নব যুবকেরা স্বজাতি গৌরব কিছু মাত্র বুঝিতে না পারিয়া সর্ব্ববিষয়ে ইয়ুরোপীয় শিক্ষার অধীন হইয়াছেন। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা ইউরোপীয় দিগের নিকট হইতে কেবল দোষভাগ শিক্ষা করিতেছেন, গুণ কিছুই শিক্ষা করিবার যত্ন করিতেছেন না। ইউরোপীয় দিগের ঐহিক উন্নতির উপায় ভূত ঐক্য, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, সাহস, বীরত্ব, পরিশ্রম, সময়জ্ঞতা প্রভৃতি গুণাবলী শিক্ষা করিবার প্রয়াস তাঁহারা একবারও করেন না, কেবল সুরাপান, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষাবলী এবং সাম্য, অন্যায় উদারতা প্রভৃতি যাহা ইউ-রোপীয়েরা মুখে মাত্র উদ্ঘোষণ করেন কার্য্যে বিপরীতানুষ্ঠান করেন, তাহারই অনুষ্ঠানে আধুনিক বঙ্গীয় যুবকগণ নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন। শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি প্রকৃত হিত-কর কার্য্যের অনুষ্ঠানে একবারও অনুরাগ প্রকাশ করেন না, দাসত্ব ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতা লাভের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহারই অনুষ্ঠানে মহা যত্নবান। যত ভাল করিয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা হইবে ততই বড় চাকরি হইবে, যত সাহেবদিগের সহিত মিলিত হইতে পারা যাইবে, ততই সাহেবদের অনুগ্রহ লাভ হইবে ও মহাপ্রসাদ স্বরূপ উত্তম দাসত্ব মিলিবে, এই আশয়ে তাঁহারা ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, ইংরাজি বেশ পরিধান, ইংলণ্ডীয় ভোজ্য ভোজন ও ইংলণ্ডীয় সমস্ত আচার, ব্যবহার অনু-করণে নিরত যত্নবান। বাঙ্গালা পড়িয়া, লিখিয়া বা বঙ্গ-ভাষায় কথোপকথন করিয়া যে সময় নষ্ট করা যায় তাহা যদি ইংরাজী পড়িয়া বা লিখিয়া ও ইংরাজীতে কথোপকথনে ব্যয় করা যায়, তাহা হইলে ইংরাজী ভাষায় অধিক ব্যুৎপত্তি লাভ হইবে বিবেচনায় তাঁহারা বঙ্গভাষায় পত্র লেখা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। অধিক কি আজি কালি বঙ্গীয় যুবকগণ ইংরাজিতে চিন্তা করিবারও প্রয়াস করিয়া থাকেন। কিন্তু হে যুবকগণ! তোমরা কি ভাবি-য়াছ যে, কেবল দাসত্ব করিলে তোমাদের উন্নতি হইবে? কেবল

দাসত্ব হইতেই তোমাদের সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ দূরিত হইবে? যদি তাহাই স্থির নিশ্চয় করিয়া থাক, তবে ইহাও কি ভাব না যে, দাসত্ব পদ কতগুলি ও উহার প্রার্থী সংখ্যা কত? আজি কালি দেশের এমনই দুরবস্থা হইয়াছে যে, যাঁহারা মনোমত দাসত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়া মহাসুখে বিচরণ করেন ও যাঁহারা উক্ত প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হয়েন তাঁহারা এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া যান। উপযুক্ত কার্য্য প্রাপ্ত না হইয়া ঐ প্রসাদ-বঞ্চিত যুবকগণ কেহ কুকর্ম্মশালী ও কেহ কেহ দেশহিতৈষী হয়েন। দেশহিতৈষীগণের মধ্যে কেহ অভিনয় করিয়া, কেহ নাটক বা গ্রন্থ বিশেষের অর্থ পুস্তক লিখিয়া, কেহ সভা ও বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতানুষ্ঠান করেন। বাস্তবিক গ্রন্থকর্ত্তা ও সংবাদ পত্র প্রণেতাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঐ শ্রেণীর লোক থাকাতেই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বা উৎকৃষ্ট সংবাদ পত্র এদেশে প্রকাশ হয় না। যে দেশে গুণবান ও শক্তিশালী ব্যক্তিগণ দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বন করেন ও অক্ষম নির্গুণেরা গ্রন্থকর্ত্তা, সম্বাদপত্র প্রণেতা ও দেশহিতৈষী হয়েন সে দেশের প্রকৃত মঙ্গল কি প্রকারে হইবে? যাঁহাদের উপযুক্ত বিদ্যা নাই, চিন্তা শক্তি নাই, এবং আশা ভঙ্গ হইয়া যাঁহারা ভগ্নহৃদয় হইয়াছেন, তাঁহাদের গবেষণা শক্তি কি প্রকারে হইবে? সুতরাং নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের মুখাপেক্ষী হয়েন। এইজন্য আমাদের আত্ম পরিচয়ও সাহেবদিগের নিকট শিখিতে হইতেছে। বাস্তবিক যদি ইয়ুরোপীয়েরা শিখাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আমরা পিতৃগৌরবও কিছু মাত্র অবগত হইতে পারিতাম না এবং তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অসভ্য এ বিশ্বাস আমাদের কিছুতেই অপনোদন হইত না। আমরা ইয়ুরোপীয়দিগের গবেষণাফলেই ভারতকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যদেশ বলিয়া জানিয়াছি; তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াই আমরা কালিদাসকে শ্রেষ্ঠ কবি, ঋগ্বেদকে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ, সংস্কৃতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ভাষা এবং গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসা ও শিল্পাদি বিষয়ে ভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছি। নিজ যত্নে বঙ্গীয় যুবকগণ কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা কেবল ইয়ুরোপীয়দিগের ধুয়া গাইতে পটু। মহাত্মা টড্ বহুতর অনুসন্ধান দ্বারা রাজস্থানের ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া ক্ষত্রিয় জাতির অদ্ভুত বীরত্ব ও সতীত্বের যশ জগতে প্রচার করিলেন, বঙ্গীয় যুবকগণ ঐ রাজস্থানের ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া অজস্র নাটক লিখিতে বসিলেন। মোক্ষমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নানা প্রকার গবেষণা ও কল্পনার সাহায্যে ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইউরোপীয়দিগের জ্ঞাতিত্ব প্রতিপাদন করিলেন, বঙ্গবাসীগণ সেই ধুয়া লইয়া আর্য্যশব্দের ঢক্কা ধ্বনিতে বঙ্গগগন বিদীর্ণ করিলেন। ইংরাজ বলিলেন ভূত মিথ্যা, অমনি বাঙ্গালী "ভূত নাই" ভূত নাই" বলিয়া গগন কম্পিত করিলেন। আবার যেমন ইংরাজ বিলাতি ভূতের সৃষ্টি করিলেন, অমনি তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে "ভূত ভূত" করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বলিলেন যোগ প্রণালী নিতান্ত অবিশ্বাস্য ও অশ্রদ্ধেয়, বাঙ্গালী তাহাই বিশ্বাস করিলেন, আবার যেমন অলকট্ প্রভৃতি সাহেবগণ যোগমাহাত্ম্য প্রচারে যত্নশীল হইলেন অমনি বঙ্গবাসীগণ আস্ফালন করিয়া ভারতীয় যোগীগণের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ ইয়ুরোপীয়েরা যখন যে বিষয় প্রচার করেন তখনই বঙ্গবাসীগণ সেই ধুয়া গাইতে থাকেন; কেহই কখনও ইয়ুরোপীয়দিগের কোন বিষয়ের প্রতিবাদ বা কোন নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিবার যত্ন করেন না। সকলেই একমনে দাসত্ব লাভের জন্য লালায়িত। বঙ্গবাসীগণ দাসত্বের জন্য যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উহার জন্য বঙ্গবাসী সাগর পারে গমন করিতেছে, জাতিভেদ পরিত্যাগ করিতেছে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয় ও বন্ধুগণের আশা ত্যাগ করিতেছে, সমাজের ও জাতীয়তার মস্তকে পদাঘাত করিতেছে, অধিক কি সর্ব্বমূলাধার স্বীয় জীবনের প্রতিও হতাদর হইয়াছে। দাসত্বের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষার জন্য

বঙ্গীয়গণ এরূপ রাত্রি জাগরণ করেন যে, তাহাতে স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষা হইবে কি না তাহা একবারও চিন্তা করেন না। হে বঙ্গবাসী! ইহা দেখিয়া কে বলিবে তোমায় দৃঢ়তা নাই ও কে তোমাকে ঘরো বাঙ্গালী বলিয়া কলঙ্ক দেয়? তবে তোমার অধ্যবসায় কেবল দাসত্ব লাভের জন্য। যদি তুমি অন্য বিষয়ে এই রূপ যত্ন কর, তাহা হইলে কি তাহাতে ফললাভ করিতে পার না? অবশ্যই পার। তাহা হইলে দাসত্ব কার্য্যে যেরূপ ফললাভ করিতেছ, তাহা হইতেও ভালরূপ ফল লাভ করিতে পার। কেননা বঙ্গবাসীকে উচ্চ পদ প্রদান করিতে রাজজাতি নিতান্ত অনিচ্ছুক। তুমি নিতান্ত উপযুক্ত হইলেও তাঁহারা তোমাকে উচ্চপদ সকল প্রদান করিবেন না। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে সেরূপ বাধা নাই। তুমি যত ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারিবে ততই ঐ সকল কার্য্যে তোমার উন্নতি হইবে। বিশেষতঃ ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য কাহারও উপাসনার প্রয়োজন হয় না, আপন ভাষা, আপন ধর্ম্ম, আপন আচার ব্যবহার, আপন জাতীয়তা ও আপন সমাজ পরিত্যাগ করিতে হয় না এবং উহার অনুষ্ঠানে দাসত্ব-স্বভাব-সুলভ সঙ্কুচিত্ততার পরিবর্ত্তে তেজস্বিতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও মানব নাম ধারণ সফল হয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় ঐ সকল বিষয়ে বঙ্গবাসীর কিছুমাত্র যত্ন নাই।

এক্ষণে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, বঙ্গবাসীর এরূপ দাসত্ব-প্রিয়তার কারণ কি? কি জন্য সমস্ত বঙ্গবাসী ঐ এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে? কেন বঙ্গবাসীরা শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে মনোযোগী হয় না? আমরা বোধ করি পাশ্চাত্য সভ্যতার অযথা অনুকরণই ইহার মূল কারণ। অনেক দিন হইতে বঙ্গের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া গিয়াছে, ক্রমাগত ৭।৮ শত বৎসর বিদেশীয়দিগের অধীন থাকিয়া বাঙ্গালীর তেজস্বিতা প্রভৃতি উচ্চ গুণ সকল একবারে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। যবন জাতির প্রবল অত্যাচার সময়ে যখন ইয়ুরোপীয়গণ এদেশে আসিলেন তখন

তাঁহাদিগের শান্তমূর্ত্তি ও কার্য্য-শক্তি দেখিয়া বঙ্গবাসীগণ তাঁহাদিগের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। পরে তাহাদের অধীনে কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখী ও ধন সম্পন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রতি আরও শ্রদ্ধাবান হয়েন। তখন ইয়ুরোপীয়গণও বঙ্গবাসীর সহিত বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। এইজন্য সে সময়ে যাঁহারা ইয়ুরোপীয়দিগের অধীনে কার্য্য করিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ সুখী ও ধনশালী হইতেন। তদবধি দাসত্বই আয়ের প্রধান উপায় বলিয়া বঙ্গীয়গণের বিশ্বাস হইল। বিশেষতঃ ঐ দাসত্বলাভের জন্য বিশেষ বিদ্যারও আবশ্যক ছিল না। ইংরাজি ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেই লোকে ঐ কার্য্য প্রাপ্ত হইত। এত অল্প আয়াসে এত অপরিমিত ধনোপার্জ্জন হয় দেখিয়া সকলেই ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে ও ইংরাজদিগের অধীনে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইলেন। ইয়ুরোপীয় দিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নাই, সুতরাং তাঁহারা ভারতীয়গণকে জাতি নির্ব্বিশেষে কার্য্য করিতে দিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে ভারতীয় সকল জাতিই তাঁহাদের দাসত্ব আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, তন্তুবায় সকলেই আপন আপন পৈতৃক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব প্রার্থী হইল। ক্রমে বিদ্যা শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচারিত হইল তাহাও ঐ কার্য্যের সহায় হইয়া উঠিল, অর্থাৎ যিনি বিদ্যা শিখিবেন তিনি ঐ একই নিয়মে কএকখানি ইংরাজি সাহিত্য, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস ও কিছু গণিত শিক্ষা করিয়া দাসত্বের উপযোগী পরীক্ষা দিয়া দাসত্ব আরম্ভ করিতে লাগিলেন। দাসত্ব লাভই বিদ্যা শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল অর্থাৎ দাসত্ব প্রাপ্তি হইলেই শিক্ষার সফলতা সম্পাদিত হয়, এই সাধারণ বিশ্বাস বঙ্গবাসীর মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল। জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেই শিল্প বাণিজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া দাসত্ব চেষ্টায় রত হইল। কিন্তু যদি জাতি বা কার্য্যভেদ প্রথার এরূপ শিথিলতা না হইত, যদি এক প্রকার বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম না হইয়া অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইত,

তাহা হইলে সকলেই দাসত্ব প্রত্যাশী ও দাসত্বের উপযুক্ত বিদ্যা-শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইত না। তাহা হইলে কেহ দাসত্ব, কেহ শিল্প, কেহ বাণিজ্য ও কেহ প্রকৃত জ্ঞান লাভের উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা করিতে যত্নবান হইত এবং তাহা হইলে, ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প বাণিজ্যাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও ঐ সমস্তের উন্নতি হইত। তাহা হইলে পাশ্চাত্যবিদ্যার অনুকরণে চিত্রকর চিত্র-বিদ্যার উন্নতি করিত, তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিত, কর্ম্মকার বিলাতি অস্ত্রাদির ন্যায় অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিত, সূত্রধরগণ পরিপাটী রূপে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিত এবং বণিকগণ বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে চেষ্টা করিত। তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতিস্তত্ত্ব ও পদার্থ-বিজ্ঞানে সমধিক ব্যুৎপন্ন এবং মন্ত্রণা, ব্যবহার ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিতেন, বৈদ্যেরা চিকিৎসা শাস্ত্র, শারীর বিদ্যা, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান ও প্রাণীতত্ত্বে পণ্ডিত হইতেন এবং বঙ্গের ক্ষত্রিয় স্থানীয় কায়স্থগণ বলবীর্য্য ও রাজকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে পারিতেন। তাহা হইলেই বঙ্গের প্রকৃত হিত সাধিত হইত। বঙ্গীয় শিল্পাদি ব্যবসায়ীগণ যদি জানিত যে দাসত্ব তাহাদের কার্য্য নহে, যদি জানিত যে শিল্পাদির উন্নতি করিতে পারিলে সুখী হইতে পারা যায়, এবং যদি ঐ সকল শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয় থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই লোকে ঐ সকল কার্য্য শিক্ষা করিয়া ঐ সকলের উন্নতি চেষ্টা করিত; সকলে বাবু হইয়া অধঃপাতে যাইত না। এক্ষণে দাসত্বের এরূপ দুর্দশা হইয়াছে, তথাপি লোকের মন উহা হইতে বিচলিত হয় নাই। তাহারও কারণ ঐ জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা। কেননা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের নিম্ন অবস্থায় থাকা চিরকাল অভ্যাস আছে, সামান্য দশটাকা বেতনের চাকরিতে যে তাহাদের কষ্ট হইবে না তাহাতে আর বিচিত্র কি? উহাতে তাহাদের অবস্থার উন্নতি না হউক তাহারা যে কোনরূপ চাকরি পাইলে, ভদ্রোচিত বেশ ভূষা পরিধান করিতে পারিবে ও ভদ্র-

লোকদিগের সহিত নিয়ত একত্র সমান ভাবে অবস্থিতি করিয়া ভদ্র বলিয়া পরিগণিত ও বাবু নামে অভিহিত হইতে পারিবে তাঁহাই তাহারা যথেষ্ট বলিয়া মানিয়া লয়। এদিকে উচ্চ জাতীয়েরা কখনও কোনও কষ্টকর কার্য্য করেন নাই, তাঁহাদিগকে নিম্নশ্রেণীর কোন কার্য্য করিতে হইলে সমাজে অবমানিত হইতে হয়, এবং অভ্যাস না থাকায় সে সকল কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের নাই, সুতরাং তাঁহারাও কোনও প্রকারে ঐ সামান্য দাসত্ব অবলম্বনে বাহ্যিক মানরক্ষা ও শারীরিক কষ্টের দায় হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা সহস্র অভাবজনিত ও মনোদুঃখ নিবন্ধন কষ্ট প্রাপ্ত হউন, সামাজিক নিন্দা ও শারীরিক কষ্টের নিকট তাহা অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। কেননা মানব অন্য অনেক কষ্ট অনায়াসে সহ্য করিতে পারে কিন্তু শারীরিক কষ্ট ও সামাজিক পদাভাব জনিত দুঃখ কোন মতেই সহ্য করিতে পারেনা। এই জন্য উচ্চ জাতীয়েরা প্রাণান্তেও নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহেন না। যদিও কেহ কেহ অভিমান পরিত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাহাতে তাঁহার উন্নতি হয় না। কেননা তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্যে পটুতা নাই, যে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে ঐ বিষয়ের কোন উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, পিতৃপুরুষেরা কখনও সে কার্য্য করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট হইতেও সে বিষয়ের পটুতা লাভের উপযোগী কোন শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই। পটুতার অভাবে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা জন্মে ও পরিশেষে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া মহাদুঃখে পতিত হয়েন। দৈবাৎ দুই এক জন ভিন্ন প্রায় কেহই অনভ্যস্ত কার্য্যে ফললাভ করিতে পারেন নাই। এই জন্য "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল কারণে আজি কালি বঙ্গসমাজ দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আজি কালি, কি ইতর কি ভদ্র কাহারও মনে সুখ নাই। সকলেই জীবনকে দুর্ব্বহ ভার বিবেচনা করিয়া জগৎপাতার নিন্দা করেন। দুঃখ ভারে বুদ্ধি বিপর্য্যয়

ঘটাতে সকলেই প্রকৃত হিত-দর্শন-শক্তি-হীন হইয়াছেন। বঙ্গবাসীরা এরূপ অন্ধ হইয়াছেন যে অন্যে প্রকৃত হিতের পথ দেখাইয়া দিলেও, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান না। সম্প্রতি রাজপুরুষগণ নির্দিষ্ট কএকটি পদ সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা ভিন্ন পাইবেন না বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছেন, বঙ্গবাসীগণ একস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। পাছে জাতিভেদ প্রথার কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, এই ভয়েই আধুনিক বঙ্গবাসীগণ উহার এত প্রতিবাদ করিতেছেন। যে জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা হেতু বঙ্গে এত কষ্ট ও এত অহিত হইয়াছে, বঙ্গবাসীরা এখনও তাহার অপকারিতা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইয়ুরোপীয় দিগের নিকট সাম্য ও উন্নতি দুইটী শব্দ শিক্ষা করিয়াছেন, কেবল তাহাই বলিয়া তাঁহারা নিয়ত চীৎকার করিতেছেন। উহার প্রকৃত অর্থ কি তাহা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করেন না। সাম্য-প্রচারকারী ইয়ুরোপীয়গণ সেই সাম্যের কিরূপ ব্যবহার করেন তাহাও একবার দেখেন না? তাঁহারা কি জানেন না যে, কোন উচ্চ বংশীয় সাহেব কোনও নীচ-বংশীয় সাহেবের সহিত একত্র ভোজন বা উপবেশন করেন না এবং সাহেব মাত্রেই ফিরিঙ্গি ও বাঙ্গালী দিগকে কিরূপ ঘৃণা করেন? তাঁহারা কি জানেন না যে, বাঙ্গালীর সহিত এক গাড়ীতে যাইতেও সাহেবেরা ঘৃণা বোধ করেন। দুই মাসের জন্য রমেশচন্দ্র মিত্র চিফজষ্টিস্ হইয়াছিলেন, ঐ দুই মাস সাহেবদিগকে বাঙ্গালীর অধীনে কার্য্য করিতে হইবে ভাবিয়া সাহেব মণ্ডলী কিরূপ চীৎকার করিয়াছিলেন তাহা কি তাঁহারা শুনেন নাই? সৌরাষ্ট্রে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর জজ হইলে সকল সাহেব এক যোগ হইয়া তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়া দিল, তাহাও কি তাঁহারা অবগত নহেন? এবং সম্প্রতি দেশীয়দিগের দ্বারা ইয়ুরোপীয় দিগের বিচার কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া যে বিধি হইবার কথা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে বিলাত পর্য্যন্ত সাহেবেরা কি করিতেছেন তাহাও কি তাঁহারা কিছুই শুনিতে পাইতেছেন না? এই কি সাম্যতত্ত্ব শিক্ষাগুরু ইয়ুরোপীয়দিগের সাম্যের

পরিচয় ? নির্ব্বোধ বাঙ্গালী ইহাতেও কি তোমরা সাম্যবাদের সারবত্তা বুঝিতে পার নাই ?

বঙ্গবাসীগণ ঐ সাম্যমন্ত্রে মোহিত হইয়া জাতিভেদ রহিতের ন্যায় স্ত্রীশিক্ষা ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা বিধানে মহা যত্নশীল হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবিয়াছেন স্ত্রীজাতি ও সর্ব্বসাধারণে শিক্ষা পাইলেই দেশ মহোন্নতি লাভ করিবে। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন না যে, যে অগ্নি, জল আমাদের মহা হিতকারী, ও যে অন্ন ভোজন আমাদের জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়, তাহারাই অযথা প্রযুক্ত হইলে মানবের মহা অনিষ্ট সাধন করে ; শিক্ষাও ঐ রূপ অযথা রূপে প্রযুক্ত হইলে মহা অনিষ্টকর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এক্ষণে প্রকৃত শিক্ষাকে শিক্ষা বলা হয় না, দাসত্বের উপযোগী শিক্ষাই শিক্ষা পদ বাচ্য হইয়াছে। এরূপ শিক্ষা লাভে মানবের উপকার হইবার সম্ভব কোথায় ? সকলেই কি দাসত্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিবে ? স্ত্রীজাতিও কি অন্যের দাসীত্ব স্বীকার করিবে ? হে বঙ্গবাসী—একথা মনে করিতেও কি তোমাদের হৃদয় বিক্ষোভিত হয় না ? শিক্ষা সকলেরই আবশ্যক বটে, কিন্তু যেমন সকল ব্যক্তি সকল কার্য্য করেনা সেইরূপ সকলের সকল প্রকার শিক্ষা আবশ্যক নাই। যেব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিবে তাহার সেইরূপ শিক্ষা করা উচিত। নচেৎ শিক্ষা দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হয়। শিক্ষার জন্য আমাদের কার্য্য নহে, কার্য্যের জন্যই শিক্ষা। সুতরাং যাহার যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে তাহার তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করাই উচিত। নচেৎ যে, যে কার্য্য করিবে না তাহার তদনুরূপ শিক্ষা লাভ হইলে, শিক্ষানুরূপ কার্য্যের চেষ্টা করিতে হয়, তাহাতে মহান্ অনর্থ ঘটে। এক্ষণে ঐ কারণেই শিক্ষিত মাত্রেই দাসত্বানুরাগী। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সমস্তই বিলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রীজাতি ও সমস্ত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা ঐ শিক্ষার অধীন হইলে আর এদেশের জাতীয় ধর্ম্ম প্রভৃতির চিহ্নমাত্র থাকিবে না। স্ত্রীজাতি ঐরূপ শিক্ষিত হয় নাই বলিয়াই অদ্যাপি আমাদের জাতীয় চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহি-

য়াছে। নচেৎ এতদিনে ভারত ফিরিঙ্গী পরিপূর্ণ হইত, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা বিলুপ্ত হইত, হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীচ্যুত হইত এবং প্রাচীন ঋষিদিগের নাম বিস্মৃতির অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইত। হে বঙ্গসন্তানগণ! আমেরিকা যেরূপ পশ্চিম ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত ও ইয়ুরোপীয় পূর্ণ হইয়াছে; ভারতকে কি সেইরূপ পূর্ব্ব ইণ্ডিয়া ও ফিরিঙ্গি পূর্ণ করিতে তোমাদিগের ইচ্ছা হইয়াছে? বাস্তবিক এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত হইলে নিশ্চয়ই ঐরূপ অবস্থা ঘটিবে। এই জন্য বলি, যাবৎ ভারতে জাতীয়ত্ব, ধর্ম্ম ও সাধারণ মতের স্থিরতা না হয় তাবৎ নারীর বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। "দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্য গোয়াল ভাল।" যে শিক্ষায় উপকার অপেক্ষা অপকারের ভাগ অধিক সে শিক্ষা না দেওয়াই উচিত। যদি ঐরূপ দোষস্পর্শ না হইয়া রমণীগণ গার্হস্থ্য প্রণালী ও সন্তান পালনাদি করিবার উপযোগী বিদ্যাভ্যাস করিতে পারেন তাহা ভাল বটে, কিন্তু সেরূপ শিক্ষা এক্ষণে হইবার উপায় আছে এমত আমাদের বোধ হয় না। কেননা, যেরূপ পিতা ও স্বামীর সুবিবেচনায় উক্ত রূপ শিক্ষা হইতে পারে, সেরূপ যোগ্য পিতা ও স্বামী এক্ষণে আছেন আমাদের বোধ হয় না। আজি কালি সকলেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভ্রান্ত হইয়াছেন।

আজি কালি ভারত সন্তানগণ আর একটী ভারি গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে, যে ভারতীয় হিন্দুধর্ম্ম নিতান্ত ভ্রান্ত ও ইয়ুরোপীয় ধর্ম্ম সত্য। ঐ বিশ্বাসানুসারে পূর্ব্বে অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন ও এক্ষণে তদনুরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভারতীয়গণের এরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের বিষয় কিছুই অবগত না হইয়া কেবল মাত্র খ্রীষ্ট উপাসকদিগের মুখে হিন্দুধর্ম্মের দোষোদ্ঘোষণ ও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রশংসা শুনিয়া মত স্থাপন করেন। তাঁহারা জানেন না যে হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। আমরা উহার সম্পূর্ণ আলোচনা এই গ্রন্থে করিতাম,

কিন্তু পুস্তক বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত হইলাম। উহার একটী মাত্র প্রকৃতির আলোচনা করিয়াই আমরা উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছি।

পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় আছে, তৎসমস্তেরই মত এই যে, তাহাদের ধর্ম্ম অনুসারে না চলিলে মনুষ্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহাদের ধর্ম্ম মতই ঈশ্বরের প্রকৃত মত, অন্য ধর্ম্ম সমস্তই ভ্রান্ত। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরই মতে ঈশ্বর কেবল সেই জাতিরই প্রিয়, তিনি কেবল সেই জাতিরই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও পরিত্রাণের উপায় করিয়াছেন, অন্য কাহারও জন্য কোনও উপায় করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, খৃষ্ট ভিন্ন মানবের পরিত্রাণের উপায় নাই; কিন্তু যখন ঈশ্বর সকল দেশে খৃষ্টকে প্রেরণ করেন নাই এবং পৃথিবীর আদিম কালে খৃষ্ট আবির্ভূত হয়েন নাই, তখন পৃথিবীর আদিম লোকদিগের ও, খৃষ্ট-জন্ম-স্থানেতর দেশ বাসীদিগের পরিত্রাণের উপায় কি? ঈশ্বর কি কেবল কএকজন মাত্র মানবকে পরিত্রাণ করিবেন? অবশিষ্ট সমস্ত লোকই তাঁহার বিরাগ ভাজন হইবে? তিনি কি সকলের ঈশ্বর নহেন, কএক জন মাত্রের ঈশ্বর? অতএব খৃষ্টানদিগের এই ক্ষুদ্র মত অতি অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মধর্ম্মেরও ঐ মত অর্থাৎ ঐ ধর্ম্মানুরাগীদিগের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে মানবের নিস্তার নাই। ঐরূপ মুসলমানদিগের মতে মহম্মদের শরণ ভিন্ন মানবের পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীস্থ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরাই ঈশ্বরকে কেবল তাহাদেরই মনে করে। এই সকল মত কি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ঘৃণাকর নহে? ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা কি ঈশ্বরের মহিমার কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিয়াছেন? কখনই না। কিন্তু দেখ, হিন্দুধর্ম্মের মত এ বিষয়ে কত প্রসস্ত! তাঁহারা বলিয়া থাকেন নদী সকল যেমন যে পথেই কেন গমন করুক না, পরিশেষে সমস্তই সাগরে মিলিত হয়, মানবগণও সেইরূপ যে ভাবে ও যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর উপাসনা করুক না, তৎসমস্তই ঈশ্বরে অর্পিত হয়।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" মহিম্নস্তব।

তাঁহার নিকট দেশ কাল, অবস্থা বা জাতিভেদ নাই। কি কিরাত, কি যবন, কি খস, কি পুলিন্দ সকলকেই ঈশ্বর উদ্ধার করেন।

"কিরাতহূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেন্যেচপাপাযদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুদ্ধন্তিতস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

তবে কার্য্য সুবিধার জন্য আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন যে, সকলেরই আপন পৈতৃক ধর্ম্মে থাকা উচিত, পরধর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত নয়। ইহার মূল কারণ এই যে, যে দেশে যেরূপ কার্য্য হিতকর, সেই দেশবাসী পণ্ডিতগণ সেইরূপ কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং তদনুসারে কার্য্যকরা সকলেরই উচিত। ইংলণ্ডে মাংস ভক্ষণ যেরূপ আবশ্যক আমাদের দেশে সেরূপ নয় বরং নিয়ত মাংস ভক্ষণ আমাদের অপকারক। মদ্য আমাদের যত অপকারক ইংলণ্ডীয়দের তত নহে। এইরূপ দেশের প্রকৃতি অনুসারে, যে কার্য্য ইংলণ্ডে অকর্ত্তব্য তাহা এখানে কর্ত্তব্য এবং যাহা এখানে অকর্ত্তব্য তাহা ইংলণ্ডে কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহাদের কর্ত্তব্য আমরা করিলে ও আমাদের কর্ত্তব্য তাহারা করিলে অনেক সময়ে অপকার হইবার সম্ভব। এইজন্য এবং পুনঃ পুনঃ রুচি অনুসারে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে ধর্ম্মের দৃঢ়তা থাকে না বলিয়া আর্য্যঋষিগণ বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" বাস্তবিক আর্য্যঋষিরা বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কোন ব্যক্তির, কোন দেশের, কোন জাতির বা কোন কালের অনুগত নহেন, সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বকালের সকল ব্যক্তিই ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র। কি সাকারবাদী, কি নিরাকারবাদী, কি দ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী, কি আস্তিক, কি নাস্তিক সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দর্শন করেন ও সকলকেই সমানরূপ উদ্ধার করেন। তিনি এক্ষণে যেমন জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল সভ্যদিগকে ভাল বাসেন ও উদ্ধার করেন, অতি পূর্ব্ব বন্যকালে যখন মানব ঈশ্বরের ভাবমাত্র পরিগ্রহ করিতে পারে নাই তখনও তাহাদিগকে সেইরূপ ভাল বাসিতেন ও উদ্ধার করিতেন। তাহা না

হইলে তাঁহার ঈশ্বর নাম ব্যর্থ হয়। তিনি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তাঁহার উপাসনার নিয়ম করিয়াছেন অথচ তাহা মনুষ্যকে জানাইয়া দিবার কোনও উপায় করেন নাই, একথা নিতান্ত অসম্ভব। আর্য্য-ঋষিগণ ঈশ্বরের এই উদার ভাব অবগত হইয়াই বলিয়াছেন, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই সত্য ও ঈশ্বরাভিপ্রেত; যে ধর্ম্ম আলোচনা করা যায় তাহাতেই মুক্তি হইবে। "তুমি বিষ্ণায় নম বল বা বিষ্ণবে নম বল," সকলই তাঁহার কর্ণে সমান প্রবিষ্ট হইবে। বিজ্ঞবর কেশবচন্দ্র সেন আর্য্যঋষিগণের এই বাক্য লইয়াই নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার নববিধান—নববিধান নহে, উহা অতি প্রাচীন বিধান। ভারতের সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে ওতঃপ্রোত ভাবে ঐ বিধান প্রচারিত রহিয়াছে এবং সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় ঐ ভাবে পরিপূর্ণ। কেশব বাবু অন্য দেশে ঐ বিধানকে নূতন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু ভারতে তদ্রূপ বলিলে তাঁহাকে নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। অতএব হে ভারতসন্তানগণ! বুঝিয়া দেখ হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। প্রকৃত ঈশ্বরতত্ত্ব কেবল আর্য্যঋষিরা বুঝিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্ম কেবল এই গুণে উৎকৃষ্ট নহে। উহা যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মের নাম সনাতনধর্ম্ম, উহা বৌদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদীয় প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের ন্যায় কাহারও নামানুসারে অভিহিত হয় না। কেননা ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র যেমন একই ব্যক্তির হৃদয়জাত সম্পত্তি, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। হিন্দুধর্ম্ম অসংখ্য ঋষি ও জ্ঞানীর মস্তিষ্ক হইতে সঞ্জাত হইয়াছে। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপ খৃষ্ট ভিন্ন অন্য কাহারও বাক্য গ্রহণ করেন না, মুসলমানগণ যেরূপ মহম্মদ ভিন্ন অন্য কাহারও শিষ্যত্ব স্বীকার করেন না, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে; ইহা ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম্ম নহে। যে কোন ঋষি যে কোন [illegible] আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই হিন্দুধর্ম্ম সাদরে [illegible] ইহাতে নাই এমত মত পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মে নাই। [illegible] সাকার-নিরাকারবাদ, হিংসা অহিংসা, স্বার্থপরতা [illegible]

অজ্ঞান, গার্হস্থ্য সন্ন্যাস, কামনা নিষ্কামতা, ইহকাল পরকাল, যাহা কিছু মনুষ্যের অবস্থা বিশেষে আবশ্যক ও হিতকর তৎসমস্তেরই বিধান হিন্দুধর্ম্ম মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে এরূপ উদার ও অবশ্যম্ভাবী অবস্থোচিত ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য এই ধর্ম্ম অতি প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ হইয়া এতকাল অক্ষুণ্ণভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর অর্দ্ধেকেরও অধিক লোকের ধর্ম্মনাশ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কিছুই করিতে পারে নাই; মুসলমানগণ সমধিক বল প্রয়োগ ও বিবিধ অত্যাচার করিয়াও ইহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই; খৃষ্ট উপাসকগণ সহস্র সহস্র প্রচারক প্রেরণ করিয়া ও নানাবিধ প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াও ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারেন নাই এবং ব্রাহ্মগণ বড় বড় সমাজ করিয়া ও পথে পথে নৃত্য ও গীত করিয়া ইহার অঙ্গস্পর্শও করিতে পারেন নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও সাধ্য নাই যে, হিন্দুধর্ম্মের কেশস্পর্শ করিতে পারে। অবোধ নব্য ভারতসন্তানগণ আপনাদের ধর্ম্মের মর্ম্ম কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, অন্যধর্ম্মের বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া কিছুদিন ধর্ম্মান্তরের পক্ষপাতী হয়েন বটে, কিন্তু যখন হিন্দুধর্ম্মরূপ মহাসাগরের মধ্যগত মহার্ঘ রত্ন সকল দেখিতে পান তখন অন্য ধর্ম্মরূপ গোষ্পদে তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা থাকেনা। হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য প্রাচীন ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর নাই। উহার ভিত্তি এরূপ সুদৃঢ় ও উহার গঠন উপকরণ এরূপ সারবান যে, কিছুতেই উহা ধ্বংস হইবার নহে। আমরা সগর্ব্বে বলিতে পারি, পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হইবে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের কখনও বিনাশ হইবে না। উহার সনাতন নাম নিরর্থক নহে। অতএব হে বঙ্গীয় যুবকগণ! বৃথা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ও মানবনামের অযোগ্য করিও না। তোমরা এমনই অসার হইয়াছ যে, বৃদ্ধকালে বালচাপল্য প্রদর্শন করিতে তোমাদের কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। তোমরা জপ, তপ, যোগ, ধ্যান প্রভৃতি গম্ভীর উচ্চ ভাবসকল পরিত্যাগ করিয়া বালকের ন্যায় খোলের বাদ্যের সহিত

পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছ! বৃদ্ধের কি নৃত্য সাজে? নৃত্য বালকেরই শোভা পায়। যাহাদিগের গাম্ভীর্য্য হয় নাই, যাহারা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সংযম শিক্ষা করে নাই সেই অর্ব্বাচীন বালকেরাই দুঃখ হইলে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে ও আনন্দ হইলে বাহু তুলিয়া নৃত্য করে। তোমাদের কি বালকত্ব প্রদর্শন করিতে লজ্জা বোধ হয় না? ইয়ুরোপীয়গণ এখনও প্রকৃত সভ্য হইতে পারেন নাই, এখনও তাঁহাদের প্রকৃত গাম্ভীর্য্য জন্মে নাই, এখনও তাঁহাদের বালকত্ব পরিহার হয় নাই, এই জন্য তাঁহারা স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া আনন্দে নৃত্য (Ball) করেন। ভারতীয়গণের কি প্রাচীন বয়সে নৃত্য শোভা পায়! যাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ নিমিলিত নেত্রে পরাৎপর ব্রহ্মের ভাব হৃদয়স্থ করিয়া বিমলানন্দে হৃদয় নাচাইতেন, তাহারা হৃদয়-নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া তামসিক নৃত্যে মত্ত হয়েন, ইহা কি সামান্য হাস্যাস্পদ!

যাঁহারা পৌত্তলিকতা অপবাদে হিন্দুধর্ম্মের দোষোদ্‌ঘোষণ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা ঈশ্বরারাধনার মর্ম্ম কিছু মাত্র অবগত হয়েন নাই; কেননা হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, যদি বাস্তবিক অপৌত্তলিক ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকে তবে সে হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই পৌত্তলিক। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সমস্ত ধর্ম্মই পৌত্তলিক। অধিক কি ব্রাহ্মধর্ম্মও পৌত্তলিকতা দোষশূন্য নহে,মানবীয় ভাব ঈশ্বরে আরোপিত করার নাম পৌত্তলিকতা। কিন্তু মানবীয় ধর্ম্ম ঈশ্বরে আরোপিত না হইলে ঈশ্বরের উপাসনা করা যায় না, তাঁহার নিয়মানুসারে চলিবার আবশ্যক বোধ হয় না, পাপ পুণ্যের প্রভেদ জ্ঞান হয় না, অধিক কি ঈশ্বরের ভাবও হৃদয়ে ধারণা করিতে পারা যায় না এই জন্যই ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মের অবিকৃত ভাব অবগত হইয়া যখন বুঝিলেন যে, সে ভাব অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন তাঁহারা সাধকগণের হিতের জন্য ঈশ্বরের মানবীয় ভাব কল্পনা করিলেন। জমদগ্নি বলিয়াছেন,—

চিন্ময়স্যা দ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যা শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা।

রূপস্থানাং দেবতানাং পুং স্ত্র্যংশাদিককল্পনা।

বাস্তবিক পৌত্তলিকতা প্রচার না হইলে এত ধর্ম্মভাব প্রচারিত হইত না। ভারত যে ধর্ম্মভাবে এত ব্যাপ্ত ছিল, পৌত্তলিকতাই তাহার প্রধান কারণ। ভারতীয়গণের হৃদয় ঈশ্বর ভাবে এমত পরিপূর্ণ হইয়াছে, যে তাহারা সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরের নামে করিয়া থাকে। তাহারা যে কোন কার্য্য করে তাহার পূর্ব্বে ঈশ্বর স্মরণ করিয়া থাকে। ভোজন, শয়ন, গমন, চিন্তন, প্রভৃতি যে সকল কার্য্য নিয়ত আবশ্যক তাহাও ঈশ্বর স্মরণ না করিয়া সম্পন্ন করে না। সামান্য পত্র লিখিবার সময়েও তাহারা অগ্রে ঈশ্বরের নাম লিখিয়া থাকে। অধিক কি, তাহারা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করে তাহার ফল পর্য্যন্তও ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকে। পৌত্তলিকতার আর এক চমৎকার গুণ এই যে, ঈশ্বরারাধনার বিমলানন্দ পৌত্তলিক উপাসকগণ যেরূপ প্রাপ্ত হয়েন, নিরাকার উপাসকগণ তাহার শতাংশও প্রাপ্ত হয়েন না। হিন্দুগণ ঈশ্বরকে সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া যখন ভক্তি গদ্‌গদ্ চিত্তে প্রণাম করে, যখন ঈশ্বরের ভোজনাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া অমৃত সেবন তুল্য তৃপ্তি লাভ করে, যখন সম্মুখস্থ দেবতার নিকট আপনার সমস্ত দুঃখ বিজ্ঞাপন করিয়া অভয় প্রার্থনা করে, তখন হিন্দু সাধকের মনে কি আনন্দ, আশা ও অভয় জন্মে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। হে বঙ্গ যুবক! একবার বাল্য কালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, যদি অল্প বয়সেই অবিশ্বাস আসিয়া তোমাদের সেই সুখ নষ্ট না করিয়া থাকে, তবে স্মরণ করিয়া দেখ যে সম্মুখস্থ দেবপ্রতিমা তোমাদিগকে কিরূপ অভয় প্রদান করিতেন। সে সুখের তুল্য সুখ কি পৃথিবীতে আর আছে? কখনই না। এইজন্য বলি বঙ্গীয় যুবকগণ! পৌত্তলিকতা ঘৃণা করিও না। যে দিন পৌত্তলিকতা পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবে সেই দিন হইতে মানবের মন হইতে ঈশ্বর ভাব এককালে দূরীভূত হইবে। অতএব যদি ঈশ্বর উপাসনায় সুখ ও উপকার আছে বিবেচনা থাকে, যদি ধর্ম্মভাবের পবিত্রতা ও আবশ্যকতা থাকে, তবে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিও না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ ও হিন্দু রীতি নীতি

সকলের মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল মাত্র ইয়ুরোপীয়-দের উপদেশ শ্রবণ ও ইয়ুরোপীয়দিগের গ্রন্থ পড়িয়া মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাতেই তোমাদের হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। যদি তোমরা আংশিক দর্শনে ভ্রান্ত না হইয়া সমীচীন দর্শন চেষ্টা করিতে, তাহা হইলে কখনই তোমাদের এরূপ ভাব হইত না। আংশিক দর্শনে যে কত ভ্রম জন্মিতে পারে, তাহা তোমাদের নিজের অবস্থার সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবে। দেখ কিছুদিন পূর্ব্বে তোমরা ফলিত জ্যোতিষ্ শাস্ত্রকে উন্মত্ত প্রলাপ মনে করিতে, প্রেততত্ত্ববিশ্বাসীদিগকে নিতান্ত ভ্রান্ত জ্ঞান করিতে, ও যোগসাধন প্রণালীকে সম্পূর্ণ কুসংস্কারাত্মক বিবেচনা করিতে, কিন্তু এক্ষণে ঐ সকলকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে তোমাদের মন ধাবিত হই-য়াছে। এমন কি, তোমাদের মধ্যে অনেকে ঐ সকলের একান্ত পক্ষ-পাতী হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহা কিছু তোমাদের জ্ঞানাতীত ছিল তাহাকেই তোমরা অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলিয়া হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতে, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের সে সাহসের অল্পতা হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার নাই? সমীচীন দর্শন না করিয়া সিদ্ধান্ত করাই উহার কারণ। কেন না যখন লৌহ-বর্ত্ম আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিত যে কোন প্রাণীর সাহায্য ব্যতিরেকে কেবল জল ও অগ্নির বলে সহস্র সহস্র আরোহী ও সহস্র সহস্র মণ দ্রব্য লইয়া ঘোটক অপেক্ষা চতুর্গুণ বেগে রথ চালিতে হইবে? যখন তাড়িতের আবিষ্কার হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, সামান্য পদার্থ লৌহতার সংযোগে সহস্রা-ধিক ক্রোশের সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে লইয়া যাইবে? যখন আলোক-চিত্র-যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই, তখন কে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, কেবল যন্ত্রবলে অবিকল চিত্র সকল অঙ্কিত হইতে পারে? কিন্তু যখন মানব ঐ সকল প্রত্যক্ষ দেখিল তখন তাহাকে পদার্থের অসীম শক্তি স্বীকার করিতে হইল, অর্থাৎ পদার্থ সংযোগে যে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে এ বিশ্বাস তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধ হইল। তদনুসারে

তাহারা স্থির করিল যে, যে পদার্থের যে শক্তি, সেই পদার্থ যত অধিক প্রযুক্ত হইবে ততই তাহার ক্রিয়াধিক্য হইবে ও যত অল্প প্রযুক্ত হইবে ততই ক্রিয়ার অল্পতা হইবে। এই জন্য, পাঁচ রতি কুইনাইনে জ্বর না ছাড়িলে দশরতি কুইনাইন দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু হোমিওপ্যাথি মতের আবির্ভাব হইয়া, ঐ মতের বিপরীত প্রমাণিত হইল। হোমিওপ্যাথগণ দেখাইয়া দিলেন, যে ঔষধের মাত্রা অল্প হইলে গুণাধিক্য হয়। হে পদার্থবিৎ! তুমি প্রথমে কি উহা বিশ্বাস্য ও সম্ভব মনে করিয়াছিলে? কখনই না। কিন্তু এক্ষণে কার্য্য দেখিয়া তোমাকে তাহা বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। সুতরাং পদার্থতত্ত্ব বুঝিয়াছ বলিয়া তোমার যে অভিমান হইয়াছিল তাহা দূর হইল। তুমি জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছু মান না, কিন্তু তুমি হোসেনখাঁর বাজি দেখিলে, ডেবন পোর্ট ব্রাদারের আশ্চর্য্য ক্রীড়া সকল দর্শন করিলে, আমেরিকার প্রেততত্ত্ববাদীদিগের অদ্ভুত কার্য্য সকল দেখিলে বা শুনিলে, অলকট সাহেবের যোগবল নিরীক্ষণ করিলে, গণক বিশেষের ভবিষ্যৎ গণনার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তোমাকে বুঝিতে হইল পদার্থাতিরিক্ত অন্য কিছু আছে। তাহা সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার শক্তি তোমার নাই। তুমি যাহা দেখ ও যাহা শুন তাহাই বিশ্বাস কর, সুতরাং তোমাকে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিতে হইল। এই বিশ্বের রহস্য ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। তোমার এত কালের প্রোষিত মত মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনষ্ট হইল। কিন্তু এরূপ পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তন করা কি নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ও বালচাপল্য নহে? সেই জন্য বলিতেছি যুবকগণ! সমীচীন দর্শন না করিয়া প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারী হইও না। একাল পর্য্যন্ত মহা পণ্ডিতগণ নিয়ত চিন্তা করিয়া যে সকল কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন তাহা এত ভ্রান্ত নহে যে, চক্ষু নিক্ষেপ মাত্রেই তুমি তাহার ভ্রান্তি দেখিতে পাও।

যদি ভারতবাসীর স্বজাতি গৌরব ও আত্মপ্রত্যয় থাকিত তাহা হইলে কখন তাঁহাদের এরূপ মতিচ্ছন্ন ঘটিত না। আত্মপ্রত্যয় শূন্য হইয়া তাঁহারা এরূপ অসার ও অপদার্থ হইয়াছেন যে, জাতীয় অতি উৎকৃষ্ট

প্রথাকেও অপকৃষ্ট ও ইয়ুরোপীয়দিগের অতি অপকৃষ্ট প্রথাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন। অধিক কি আর্য্যদিগের জাতি সাধারণ দানশীলতা, আতিথেয়তা, উপচিকীর্ষা, নিষ্কামতা, পিতৃমাতৃ ভক্তি ও দাম্পত্য প্রেম প্রভৃতি অসাধারণ গুণ সকল তাঁহাদের নিকট অপকৃষ্ট ও ইয়ুরোপীয় দিগের স্বার্থপরতা প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন। ইহা কি সামান্য আক্ষেপের বিষয় যে, যে জাতি পরকাল, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের জন্য আপনাদের প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করে, যে জাতি সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখে, যে জাতি মুখের অন্ন দিয়া অতিথি সেবা করে, যে জাতি কার্য্য মাত্রে দরিদ্রকে দান ও ভোজন প্রদান এবং প্রত্যহ অগণিত ভিক্ষুককে ভিক্ষা প্রদান করে, যে জাতির একজন সঙ্গতি সম্পন্ন হইলে অতি দূরস্থ আত্মীয়বর্গও উদাশ্রয়ে প্রতিপালিত হয়, এবং যে জাতি পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুর জন্য না করিতে পারে এমত কার্য্যই নাই, অধিক কি যে জাতি যুদ্ধকালেও অস্ত্রহীন শত্রুর প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করে না, সেই জাতি—যে জাতির অর্থই এক মাত্র ভদ্রতা ও উন্নতির পরিচায়ক, যে জাতি ঐহিক উন্নতিকেই প্রকৃত উন্নতি বলে, অর্থ ভিন্ন যে জাতির ব্যবহারজীবীগণ পরামর্শ মাত্র ও চিকিৎসকগণ ব্যবস্থা মাত্র প্রদান করে না, যে জাতীয় মানবগণ কার্য্য ক্ষতি হইবে বলিয়া, অভ্যাগতের সহিত আলাপ করে না, সেই জাতীয় লোকের নিকট হইতে নীতি শিক্ষার চেষ্টা করে। এ সকল কি আত্মতত্ত্ব ও জাতীয় গৌরব অনভিজ্ঞতার কারণ নহে? যদি ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিতেন যে তাঁহারা ইয়ুরোপীয়দিগের নির্দ্দেশ মত অসভ্য কি অর্দ্ধ সভ্য নহেন, যদি তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি ইয়ুরোপীয়দিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা হইলে কি তাঁহারা এরূপ ইয়ুরোপীয়দিগের অনুকরণপ্রিয় হইতেন? না তাহা হইলে আজি ভারতের এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইত? বাস্তবিক আভিজাত্য, আত্মগৌরব ও আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানবের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে মানবের উন্নতিকর কার্য্যে প্রবৃত্তিই হয় না। আমি সক্ষম, আমার

পিতৃপুরুষেরা বিপুল কীর্ত্তি করিয়াছেন, আমি যখন তাঁহাদের সন্তান তখন অবশ্যই সঙ্কল্পিত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এই বিশ্বাস থাকিলে মানব যেরূপ উদ্যমশীল হইতে পারে, আমি নিতান্ত অক্ষম, আমাদ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া নিতান্ত অসম্ভব এরূপ বিশ্বাস হইলে কি সেরূপ হইতে পারে? কখনই না। ঐ আত্ম প্রত্যয় ও আত্মগৌরব বলে মহারাণা প্রতাপসিংহ রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াও প্রবল পরাক্রান্ত আকবর বাদসাহের সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিয়া আপনার সমস্ত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন এবং ঐ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরব না থাকাতেই বঙ্গাধিপতি লাক্ষণ্য সেন নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। অতএব হে বঙ্গযুবকগণ! আত্ম-তত্ত্ব ও স্বজাতিগৌরব অবগত হইয়া আত্মগৌরব ও জাতীয় উন্নতি লাভের যত্ন কর। নচেৎ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাহেবদিগের অনুকরণ করিলে কিছুই হইবে না। যত দিন আত্মতত্ত্ব ও জাতীয় গৌরব অবগত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান-নিরত না হইবে, ততদিন সহস্র সহস্র সভা স্থাপন কর, লক্ষ লক্ষ পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ কর, অবিশ্রান্ত গৃহে গৃহে পথে পথে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কর, কিছুতেই তোমাদের অভীপ্সিত উন্নতি হস্তগত হইবে না। কিন্তু তাহা বলিয়া বৃথা মিথ্যা আত্মাভিমান করা উচিত নয়। বৃথা আত্মাভিমানী হইলে বিপরীত ফললাভ হয়। বঙ্গীয়গণ যদি আত্মাভিমান মাত্রের অধীন হইয়া, ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ না করিতেন, যদি ইয়ুরোপীয় প্রথা অনুসারে সত্য পরীক্ষার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে কি বঙ্গীয়গণের দুর্দ্দশার কিছুমাত্র অপনয়ন হইত? না তাহা [illegible] আমাদের পূর্ব্বকীর্ত্তি কলাপের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইত? [illegible] ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত না হইত তাহা হইলে [illegible] ভারতের উন্নতির আশা থাকিত না। এক্ষণে ইয়ুরোপীয় আলোক লইয়াই আমরা সমস্ত দর্শন করিতেছি। সুতরাং ইয়ুরো-পীয় সভ্যতার আলোক আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। বৃথা আত্মা-

ভিমানী হইয়া উহা গ্রহণে অসমর্থ হইলে, নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা হইতে পারে। তবে অতি সাবধানে ঐ আলোক আমাদের ব্যবহার করা আবশ্যক। এরূপ ভাবে ঐ আলোক গ্রহণ করিতে হইবে, যেন তাহাতে আমাদের চক্ষু ধঁাধিয়া না যায় ও দৃষ্টিশক্তি খর্ব্ব না হয়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, যত কেন নিকৃষ্ট হউক না, গুণভাগ সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা করা উচিত; এমন কি তাঁহারা কুকুর ও কুক্কুট প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের নিকট হইতেও গুণ শিক্ষা করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর উন্নত ও সভ্য জাতির নিকট আমরা গুণ শিক্ষা করিব তাহাতে আর কথা কি? অতএব ভারতবাসীগণ! ইয়ুরোপীয় সভ্যতার আলোক দ্বারা বিশেষ নিপুণতার সহিত ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট গুণভাগ শিক্ষা ও ভারতসমাজ-প্রবিষ্ট দোষাবলী সংশোধন করিবার চেষ্টা কর। দেখিও যেন বাহ্যিক চাকচিক্যে মোহিত হইয়া কাচ লইয়া হীরক ত্যাগ করিওনা। ইয়ুরোপীয়গণ যে দেশে শিক্ষার যে বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথা হইতে তাহাই গ্রহণ করিয়া আপনাদের পুষ্টিতা সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু দেখ, তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় রীতিনীতির পরিবর্ত্তে কোনও দেশের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মাদি গ্রহণ করেন নাই। বাস্তবিক সেরূপ করিলে কখনই তাঁহাদের উন্নতি হইতনা। কেননা আত্মতা ও জাতীয়তাই উন্নতির মূল। ধর্ম্ম, ভাষা ও জাতীয় রীতিনীতির একতাই জাতীয়তার কারণ। আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশীয়গণের প্রকৃতি উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতীয়গণ ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে গুণাবলী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আত্মগৌরবের মূল স্বরূপ ধর্ম্ম, ভাষা, পরিচ্ছদ ও জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই আমাদের প্রকৃত উন্নতি হইতেছে না। সকলেরই জানা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই, কেবল যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করা সম্ভব নহে, বিধান বিশেষের সুতরাং স্বদেশীয় বিধানেরই অধীন হইয়া কার্য্য করা আবশ্যক। তবে প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি-

গণ যুক্তি ও জ্ঞানানুসারে প্রচলিত বিধান সকলের দোষ সংশোধন করিতে পারেন। কিন্তু ঐ সংশোধন কার্য্য এরূপ সতর্কতার সহিত ও এরূপ সুকৌশলে সম্পন্ন করিতে হইবে, যেন তাহাতে কোন অপকার বা সমাজস্থ ব্যক্তিগণ তদনুসারে চলিতে অসম্মত না হয়। পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ ঐ কারণে নববিধান সকলকে বেদের অর্থ বা দেবতা-প্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিতেন। তাহাতেই পূর্ব্বকালে বিরুদ্ধমত গ্রহণে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু এক্ষণে কেহ প্রকৃত কোন সমাজ হিতকর বিধান প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা প্রচলিত হওয়া দূরে থাকুক, যিনি উহার প্রচলন চেষ্টা করেন, তিনি সমাজচ্যুত হয়েন। কেননা যিনি সমাজসংস্করণ কার্য্যে ব্রতী হয়েন তাঁহাকে সমাজস্থ লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই খৃষ্টান বা নাস্তিক বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছে। বিধর্ম্মী বা নাস্তিকের যুক্তি অনুসারে কোন্ ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ধর্ম্ম-বিশ্বাস-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে সম্মত হইতে পারে? অতএব হে ভারতীয়গণ! যদি ধর্ম্ম বা সমাজ সংস্করণে তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম সকল পরিত্যাগ করিওনা; দৃঢ়রূপে উহার উপাসক থাকিয়া সংস্কার সাধনে চেষ্টা কর, তাহা হইলেই সফলকাম হইতে পারিবে। নচেৎ নিজ ভাবে নিজে মত্ত হইলে কোন কার্য্য হইবে না। তাহাতে বড় হয়ত একটী সামান্য সম্প্রদায় সৃষ্টি হইবে মাত্র। কিন্তু তদ্বারা উপকার দূরে থাকুক স্বজাতি-বৈরিতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহান্ অনিষ্ট সাধিত হইবে। ঐ কারণে এদেশে নানাধর্ম্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়া ভারতবাসীর অনৈক্যের কারণ হইয়াছে। ধর্ম্ম, ভাষা ও রীতি নীতির একতাই মানবমনের ঐক্যের প্রধান কারণ। যাহাতে ঐ সকলের একতা থাকে তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই মানব নাম সার্থক হয়; আমাদের গ্রন্থ ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সুতরাং এইখানেই আমরা গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম। গ্রন্থান্তরে আর সকল বিষয় আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

সম্পূর্ণ।